মূল্য ঃ পাঁচ টাকা

শিক্ষা ও সাহিত্য

Teachers' Journal

VOL. LXXXV NO.3 MARCH, 2006



নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

THE ALL BENGAL TEACHERS ASSOCIATION · UNION IS STRENGTH

শিক্ষা ও সাহিত্য
Teachers' Journal

চৈত্র, ১৪১২ — মার্চ, ২০০৬

৮৫তম বর্ষ ঃ তৃতীয় সংখ্যা

"A system of education should have relevance to the needs of the country. Thus Indian Education should be integrated to the needs and aspirations of national life and to placing it on a sound national, scientific and democratic basis to accelerate the establishment of social justice in the country.--------

Education cannot be considered in isolation or planned in the people and to the growth and to the devolopment of political consciousness among the people in the present socilistic context to transform it into a Secular Democratic Republic. Education must counteract all the divisive forces e.g. casteism, parochialism and provincialism, economic and social inequalities between man and man and the content of education must be reoriented accordingly."

Collected from

'PAPER PRESENTED AS PRESIDENT, A.B.T.A. TO THE SEMINAR ON EDUCATION ORGANISED BY WBCUTA'

Selected Writings And Speeched of Satyapriya Ray, P-267

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

সমিতি কার্যালয় ঃ সত্যপ্রিয় ভবন, পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা-১৩ ফোন ঃ ২২১৫-৯১৫৮
২২১৫-৮৮৫৬
ফ্যাক্স ঃ ২২১৫-৭৯৩২

সম্পাদক
শ্রীবিকাশ মণ্ডল

যুগ্ম-সম্পাদক
শ্রীমতী অপর্ণা সান্যাল (ব্যানার্জী)

শিক্ষা ও সাহিত্য

সূচিপত্র

Teachers' Journal
CONTENTS

প্রচ্ছদচিত্র : শিক্ষক ও শিক্ষা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা সত্যপ্রিয় রায়

সম্পাদকীয়

দেশের সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করুন

সমিতির প্রাণপুরুষ সত্যপ্রিয় রায় ১৯০৭ সালের ১লা মার্চ ময়মনসিংহ জেলার সিঙ্গাই-এ জন্মগ্রহণ করেন। সেই হিসেবে এই বছর ১লা মার্চ তিনি শতবর্ষের বৃত্তে প্রবেশ করলেন। ঐদিন আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি ; আগামী দিনগুলিতেও তাঁকে নানাভাবে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে শ্রদ্ধা জানাব, স্মরণ করব। সেই আয়োজনে আমরা আপনাদের পাশে পেতে চাই, চাই সত্যপ্রিয় রায়ের ওপর বহুবিধ লেখা যা 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-র শ্রদ্ধা নিবেদনের ডালিকে নানা উপাচারে পরিপূর্ণ করে তুলবে।

গত ১লা মার্চ যখন আমরা সমিতির অবিসংবাদী নেতা সত্যপ্রিয় রায়কে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ঠিক সেইদিনই সমস্ত প্রোটোকল ভেঙে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের 'উলঙ্গ রাজা' জর্জ ডব্লিউ বুশকে করজোড়ে গদগদ চিত্তে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। যেন বললেন, আসুন প্রভু, আপনাকে সন্তুষ্ট করতে আপনার 'ইচ্ছেমত ইচ্ছে পূরণ' করার সমস্ত আয়োজন আমরা সম্পূর্ণ করে রেখেছি, আপনি শুধু অনুগ্রহ করে একবার এই অধম দেশে পদার্পণ করে ভক্তদের জীবন ধন্য করুন।

'সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ।' আমাদের দেশের স্বাধীন বৈদেশিক নীতি থাকা সত্ত্বেও পূর্বতন এন ডি এ সরকারের মত বর্তমান ইউ পি এ সরকার দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন করে চলেছে, যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারাবিশ্বে তাদের আধিপত্য কায়েম করার জঘন্য প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা অজুহাতে একের পর এক দেশে সামরিক আগ্রাসন নামিয়ে আনছে সেই মানবতার শত্রুকে আবাহন করছে আমাদের দেশ, যারা একদিন জোটনিরপেক্ষ দেশগুলিকে নেতৃত্ব দিয়েছে। আফগানিস্তান ও ইরাক হানার পর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইরান, সিরিয়া ও গণতান্ত্রিক কোরিয়ায় সামরিক অভিযানের উদ্যোগ নিচ্ছে। ইরান আই এ ই এ-র পরিদর্শক দলকে তাদের আণবিক বিজ্ঞানাগার পরিদর্শনের অনুমতি দিয়েছে এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছে। এতদ্‌সত্ত্বেও ইরানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে তারা নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিভঙ্গের পথ নিয়েছে। ফলে ইরানকে নিরাপত্তা পরিষদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। আই এ ই এ-র অধিবেশনে যখন ইরানের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব পেশ ও পরবর্তীকালে গ্রহণ করা হয় তখন রাশিয়া ও চীন ভোটদানে বিরত থাকলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপে, ভারত প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। ইউ পি এ সরকার তাদের এই সিদ্ধান্তকে 'ভারসাম্য রক্ষার চমৎকার বিচক্ষণতা' বলে ব্যাখ্যা দিয়েছে। ৬ই মার্চ আই এ ই এ-র অধিবেশনে ইরান প্রসঙ্গকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানোর প্রস্তাব পেশ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়। তাই ভারতের ওপর আরো চাপ সৃষ্টির জন্য এবং ভারত সরকারকে খুশি করার লক্ষ্যেই ১লা মার্চ মার্কিন রাষ্ট্রপতির শুভাগমন ঘটে। ২রা মার্চ সবার আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করে আমেরিকা নজরদারির শর্তে পরমাণু সমঝোতায় সই করেছে। রাজধানী নয়াদিল্লী সহ দেশের প্রতিটি প্রান্তে আমেরিকা ও বুশ বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিলে সামিল হয়েছে লক্ষ লক্ষ দেশপ্রেমিক মানুষ। তাদের এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দাবিকে উপেক্ষা করে ইউ পি এ সরকার যেভাবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ভারতকে মার্কিন অনুগত বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছে, 'স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার' বানানোর চেষ্টা করছে তাতে করে ভারতের মত জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সম্মান ধূলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে। আমেরিকা চাইছে ইরাক-ইরানসহ বিশ্বের নানাদেশে আগ্রাসী হামলার সময় ভারতকে সাথী হিসেবে পেতে। অথচ আমেরিকার এই আগ্রাসী মনোভাবের বিরুদ্ধে খোদ সেই দেশেরই ৬০% মানুষ রায় দিয়েছেন। ইরাকের ৮২% মানুষ বুশের নেতৃত্বে মার্কিনী আগ্রাসন ও দখলদারির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। সিরিয়া, ইরান ও প্যালেস্তাইনের জনগণ আমেরিকার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণ-প্রতিরোধের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে ল্যাটিন আমেরিকার ভেনেজুয়েলা, উরুগুয়ে, বলিভিয়া,

আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চিলি প্রভৃতি দেশ। এদের সাহসী অবস্থানকে সেলাম জানিয়ে ইউ পি এ সরকারের উচিত দেশের সম্মান ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা। তাদের অনুধাবন করা উচিত যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ধীরে ধীরে ভারতের স্ব-নির্ভরতা ও স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাকে গ্রাস করতে চাইছে। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সারাবিশ্বের মানুষ আজ সমস্বরে প্রতিবাদ ধ্বনিত করছে। ভারত সরকার যাতে এইপথে চলতে বাধ্য হয় সেজন্য কোটি কোটি দেশপ্রেমিক মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে, প্রতিবাদ ধ্বনিত করতে হবে—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়,
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায়।"

আগামী ১৭ই এপ্রিল থেকে পশ্চিমবঙ্গে চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচন শুরু হচ্ছে। সবাইকে বিস্মিত করে নির্বাচন কমিশন এই রাজ্যে ৫ দফায় ১৭ই এপ্রিল থেকে ৮ই মে নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঠিক করেছে। অথচ মার্চ, এপ্রিল, মে মাসে এই রাজ্যে লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী জীবনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় বসবে। এই দীর্ঘ নির্বাচন প্রক্রিয়া সেইসব ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের উদ্বেগের মধ্যে ফেলেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই তাদের পরীক্ষার কর্মসূচির পরিবর্তন হবে বলে জানিয়েছে। ফলত উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য এইসব ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বাইরের রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দরজা এ বছরের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। নির্বাচন কমিশন বিষয়গুলি বিবেচনা করলে ভাল হোত।

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিশ্বব্যাপী নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও লিঙ্গবৈষম্যের নিরিখে সমতার দাবী আজ সারা বিশ্ব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুরুষদের আধিপত্যবাদের কারণে এখনও বিপুলসংখ্যক মহিলা পুরুষের সমমর্যাদা পাচ্ছেন না। বর্তমানে বিশ্বায়নের আগ্রাসনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মহিলারাই। দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা সহ সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ, বর্ণবিদ্বেষ ও নানাবিধ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে মহিলারা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছেন। ভোগবাদী বিশ্বায়নী ব্যবস্থায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে নারীদের। বিভিন্ন উপায়ে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে উস্কে দেওয়া হচ্ছে এবং গোটা সমাজদেহকেই কলুষিত করা হচ্ছে। এরফলে নারীরা শুধু আক্রান্তই হচ্ছে তাই নয়, তাদের সামাজিক অবস্থান অত্যন্ত হীন ও অবমাননাকর অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে। অন্যদিকে মৌলবাদ নারীদের উপর মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে চাপিয়ে দিচ্ছে। সামরিক আগ্রাসনের ফলে নারীদের নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশি বিঘ্নিত হচ্ছে। কন্যাভ্রূণ হত্যার ঘটনা সমাজে ক্রমবর্ধমান। এ সবের বিরুদ্ধে জাগ্রত জনমত গঠনের নিরন্তর প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে সব অংশের নারী-পুরুষকে সঙ্গে নিয়েই। এই মুহূর্তে নিপীড়িত মানুষের সামনে আশার আলো দেখাচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলি। সম্প্রতি চিলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বামপন্থী নেত্রী মিশেল বাসেলেটের জয় সেই আশার দৃঢ়ীকরণ ঘটেছে।

বারাণসীর সঙ্কোটমোচন মন্দিরে ও বারাণসী রেলস্টেশনে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বিপদগ্রস্ত করে ঘোলাজলে মাছ ধরবার চেষ্টা শুরু করেছে। আগামীদিনে ৫টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ফায়দা লোটাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। 'জাতীয় সংহতি যাত্রা' নামের আড়ালে জাতীয় সংহতি বিপন্ন করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের এই ঘৃণ্য কৌশলকে প্রতিহত করতে হবে।

প্রতিহত করতে হবে এই রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী খুন-জখমের ঘৃণ্য প্রচেষ্টাকে। স্মরণে রাখতে হবে ষাটের দশকের শেষের ও সত্তরের দশকের কালো দিনগুলিকে। দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে বামফ্রন্ট সরকারের প্রচেষ্টায় রাজ্যে যে শান্তি ও সুস্থির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে ; কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যের যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে তাকে অব্যাহত রাখতে আসন্ন চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারকে সপ্তমবার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আর এই কাজে সব অংশের মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমাদের সদস্যবন্ধুদেরও এগিয়ে যেতে হবে, সবার সঙ্গে নিবিড় মানবিক যোগাযোগ গড়ে তুলতে হবে, বোঝাতে হবে কেন আমরা সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার চাইছি। দেশের সার্বিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার কেন এত জরুরী, মানুষকে সেকথা বোঝাতে হবে। এই প্রচেষ্টায় সাফল্যের বিষয়ে আমরা দৃঢ়প্রত্যয়ী। শুধু মনে রাখতে হবে উদ্যম ও পরিশ্রমের বিকল্প নেই।

—১০ই মার্চ, ২০০৬

সমিতির ডাক

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সাধারণ সম্পাদক

১লা মার্চ মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লিউ বুশ ভারত সফরে এলেন। সাম্রাজ্যবাদী জর্জ বুশের ভারত সফরের প্রতিবাদে সারা দেশের শান্তি ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ গর্জে উঠলেন। প্রতিবাদে মুখর হলো ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনগুলি ; মুখর হলো রাজনৈতিক দলগুলি যাদের প্রগতিশীলতা ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার ঐতিহ্য রয়েছে। বিশাল বিশাল মিছিল হলো বামপন্থী আন্দোলনের দুর্গ পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায়। মিছিলে শ্লোগান উঠল ঃ 'মানবতার শত্রু বুশ ভারত ছাড়ো', 'পৃথিবী মানুষের জন্য, দানবের জন্য নয়' ইত্যাদি। বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির ডাকে কলকাতার জওহরলাল নেহরু রোডে মার্কিন প্রচার দপ্তরের সামনে ১লা মার্চের বুশ বিরোধী সমাবেশে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্যবন্ধুরাও সমবেত হয়েছেন ও মিছিলে যোগ দিয়েছেন 'বুশ, ফিরে যাও' লেখা ফেস্টুন হাতে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে সমিতির শিক্ষা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। আমরা সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করি। তাই আমরা ভারতে বুশের আগমনকে অবাঞ্ছিত বলেই মনে করি। মার্কিন পণ্যের জন্য ভারতের বাজারকে খুলে দিতে বলেছেন বুশ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতি ও সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে সমিতি সচেতন থাকবে এবং আগামী দিনেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে সামিল হবে। কারণ আমরা জানি সাম্রাজ্যবাদ হলো শোষণভিত্তিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার শেষ পর্যায়। সমাজতন্ত্রই মানব জাতির ভবিষ্যত।

মাধ্যমিক পরীক্ষার লিখিত অংশটা শেষ হয়েছে নির্বিঘ্নে। এবার ৭ই মার্চ থেকে শুরু হয়েছে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র এই প্রথম সরবরাহ করেছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এ এক বাড়তি দায়িত্ব। কারণ প্রতিটি বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট মূল বা প্রধান পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে সংসদের প্রশ্নপত্র পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব শিক্ষকদেরই বহন করতে হচ্ছে। এর ওপর আছে একাদশ শ্রেণির খাতা দেখা। একই সঙ্গে চলছে বিদ্যালয়গুলির বার্ষিক পরীক্ষা। সে পরীক্ষারও খাতা দেখা আছে। আছে প্রায় ৮ লক্ষ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের খাতা দেখা। ১৭ই মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। সে পরীক্ষাও সুষ্ঠভাবে নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করতে হবে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের। তারও খাতা দেখা আছে। আছে এই সব ক'টি পরীক্ষার ফল প্রস্তুত করে নির্দিষ্ট সময়ে তা প্রকাশ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সব মিলিয়ে এই সময়টা প্রচণ্ড কাজের চাপ রয়েছে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের ওপর। প্রাণাধিক প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ক্লেশ স্বীকার করতে কখনো পিছপা হননি পশ্চিমবাংলার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুরা। এটাই এ রাজ্যের বৈশিষ্ট্য। জীবন বিপন্ন করেও তাঁরা এ দায়িত্ব বহন করেন। কারণ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই শিক্ষক সমাজের অস্তিত্ব বজায় আছে। তাই ওদের কল্যাণের জন্যই শিক্ষক-শিক্ষিকারা ত্যাগ স্বীকার করেন, কষ্ট সহ্য করেন।

পশ্চিমবঙ্গে চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ১৭ই এপ্রিল থেকে পাঁচটি পর্যায়ে ঃ ১৭, ২২, ২৭শে এপ্রিল এবং ৩ ও ৮ই মে। এই সময়ে কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বহু গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে এ রাজ্যে। এই পরীক্ষাগুলি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের দিক্‌নির্দেশকও বটে। শুধু বিদ্যালয় স্তরের পরীক্ষাগুলি নয়, স্নাতক স্তরের পরীক্ষাগুলিও এই সময় অনুষ্ঠিত হয়, অনুষ্ঠিত হয় জয়েন্ট এনট্রান্স-এর মতো পরীক্ষা। ভোট সূচিতে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ই পিছোবে স্নাতক পরীক্ষা। মে মাসের ১৫ তারিখের আগে স্নাতক স্তরের পরীক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। এর ফলে অন্য রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা উচ্চ শিক্ষাগ্রহণে ইচ্ছুক সে সব ছাত্র-ছাত্রী বঞ্চিত হবে। জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষাও পিছিয়েছে। মে মাসে হবে। দেরিতে এই পরীক্ষা হওয়ার কারণে এইসব ছাত্র-ছাত্রী সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলিতে বসার সুযোগ হারাতে পারে। ৯৭হাজারের বেশি ছাত্র-ছাত্রী এবারে জয়েন্ট এনট্রান্স পরীক্ষায় বসছে।

রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবে আমরা আমাদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কথা সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছি।

মে মাসে গ্রীষ্মাবকাশ চলবে। তৎসত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে মে মাসে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষাগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সে জন্য আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হবে।

চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রাম। ১৯৬৬ সালে সমিতি আহ্বান জানিয়েছিল তৎকালীন জনবিরোধী শিক্ষাবিরোধী রাজ্য সরকারকে নির্বাচনের মাধ্যমে অপসারিত করার জন্য। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত অনেক সংগ্রাম আন্দোলন করতে হয়েছে আমাদের একটি জনমুখী ও শিক্ষাদরদী সরকার এ রাজ্যে গঠন করার জন্য। বহু শহিদের আত্মবলিদানে ১৯৭৭ সালে এ রাজ্যে শিক্ষাদরদী ও জনদরদী বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর থেকে ত্রয়োদশ নির্বাচন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উপর্যুপরি ছ'বার বামফ্রন্টের পক্ষে তাঁদের অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করে বিশ্বে সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শত প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকার শ্রমজীবী, কৃষিজীবী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, কর্মচারী মানুষের স্বার্থে কাজ করে চলেছে দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে। বামফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে নিহত হয়েছেন সাড়ে চার হাজারের বেশি বামপন্থী কর্মী, সমর্থক, নেতা ও দরদী বন্ধু। বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে সংক্ষেপে বলা যায় শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার অসামান্য অবদান রেখেছে। পশ্চিমবঙ্গ দেশের একমাত্র রাজ্য যেখানে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩.৭ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়। যেখানে জাতীয় গড় ২.৮ শতাংশ। শিক্ষা বাজেটের ৮৬ শতাংশ ব্যয়িত হয় বিদ্যালয় শিক্ষাখাতে। প্রাথমিক স্তরে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র সহ বিদ্যালয় সংখ্যা ৬৮,১৩৮। মাধ্যমিক স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র সহ বিদ্যালয় সংখ্যা ১২,৩৮৬। ১৯91 সালে সাক্ষরতার হার ছিল ৫৭.৭ শতাংশ। ২০০১ সালে তা হয়েছে ৬৮.৬০ শতাংশ। বর্তমানে ৭২ শতাংশ। ১৯৭৬ সালে বিদ্যালয়-ছুটের হার ছিল ৭০ শতাংশ, ২০০২ সালে তা কমে হয়েছে ৩৬.৪১ শতাংশ। ২৯ বছরে প্রাথমিক বিদ্যালয় বেড়েছে ৩০শতাংশের বেশি। তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে ভর্তির হার প্রায় ৯০ শতাংশ। বিদ্যালয়ের আওতার বাইরে থাকা শিশুর সংখ্যা কমেছে দ্রুত হারে। আগে এই সংখ্যা ছিল যেখানে ৩৫ লক্ষ ২হাজার, সেখানে বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮লক্ষ ৯৬ হাজার। স্কুলছুটদের সংখ্যা হ্রাস এবং বিদ্যালয় নথিভুক্তির সংখ্যাও বেড়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। বর্তমানে প্রাথমিক স্তর ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই নথিভুক্তির হার যথাক্রমে ৯৮ শতাংশ এবং ৭৪.৬ শতাংশ। মিড-ডে- মিল-এর ব্যবস্থা এবং সর্বশিক্ষা অভিযানের সাফল্যের জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে।

এ রাজ্যে সময়ের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক পাঠক্রমে নতুন নতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। শিক্ষার মানকে উন্নত করতে সফল হয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। শহরকেন্দ্রিক মেধা পরিচিতির পরিবর্তে জেলাকেন্দ্রিক মেধা পরিচিতি প্রমাণ করে যে সারা রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার সমদৃষ্টি প্রদান করেছে। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকতার কাজে যোগ দিতে পাচ্ছে সম্মানের সঙ্গে। প্রতিবছর এস এস সি-র মাধ্যমে গড়ে দশ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হচ্ছেন। এইভাবে এ বছর ২২হাজার শিক্ষক নিযুক্ত হতে চলেছেন এ রাজ্যে। সারা দেশে এর নজির নেই। শত আর্থিক সংকট ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও প্রায় ২লক্ষাধিক প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে নিয়মিত পেনসন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি প্রদান করে চলেছে বামফ্রন্ট সরকার। পে-কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের সম্মান দক্ষিণা বৃদ্ধি করে শিক্ষকতাকে অন্যান্য চাকুরীর সমতুল সামাজিক অবস্থানে উন্নত করেছে এই সরকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ এবং শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকুরির ১০০ শতাংশ সুনিশ্চিতকরণ এ সরকারের উল্লেখযোগ্য অবদান।

শিক্ষাক্ষেত্রে এই সাফল্যের কথা তুলে ধরতে হবে অঞ্চলে অঞ্চলে নির্বাচনী কনভেনশন করে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী মানুষকে আহ্বান করতে হবে এই কনভেনশনগুলিতে। বাড়ি বাড়ি মানুষের কাছে প্রচার করতে হবে এই সাফল্যের কথা। চলমান প্রচারের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। পরীক্ষার্থীদের কোনরকম অসুবিধা না ঘটিয়ে নির্বাচনী প্রচার করতে হবে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার গড়ার লক্ষ্যে। নির্বাচন কমিশনের আরোপ করা বিধিনিষেধ ভঙ্গ না করে প্রচারের কাজ চালাতে হবে।১০ই এপ্রিলের মধ্যে জেলা ও অঞ্চলের নির্বাচনী কনভেনশনগুলি শেষ করতে হবে। ১৬ই মার্চ কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে আটটি বাম শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের

আহ্বানে। স্থান ঃ সত্যপ্রিয় ভবন, রবিকক্ষ। আগামী ৩১শে মার্চের মধ্যে আটটি বাম শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠনের সঙ্গে যৌথভাবে কনভেনশন করার কর্মসূচিও শেষ করতে হবে। শিক্ষার প্রসার ও মান উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে, রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাকে আরও গতিশীল করতে, শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ, বেসরকারীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রতিহত করতে এবং সাম্রাজ্যবাদের সর্বাত্মক আক্রমণ রুখতে এ রাজ্যে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার গঠন করতে হবে।

৫-১৯ শে মে, ২০০৬ সদস্যপদ নবীকরণ ও নতুন সদস্য সংগ্রহ পক্ষ পালন করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। অঞ্চলে অঞ্চলে টীম করে মহকুমা, জেলা নেতাদের এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে যেতে হবে। এস এস সি'র মাধ্যমে আগত নবীন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সদস্য করতে হবে। ধৈর্যের সঙ্গে তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সমিতি কী, সমিতির লক্ষ্য কী, সমিতির সদস্য কেন হতে হবে — এ কথাগুলি বুঝিয়ে বলতে হবে। কেবল পূর্ণ সময়ের জন্য নিযুক্ত ও অনুমোদিত শিক্ষক, শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরাই সমিতির সদস্য হতে পারবেন। অবসরপ্রাপ্তদের সমিতির সদস্য করার জন্য আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এই সময় 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকার ব্যক্তিগত গ্রাহক হবার জন্যও সদস্যদের কাছে আবেদন করতে হবে। এছাড়া ইউনিট থেকে রাজ্য প্রতিটি স্তরের কমিটি (সদস্যরা-সমিতির গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে) যাতে অবশ্যই পত্রিকার গ্রাহক হন সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর দিতে হবে। যাতে পক্ষকালের মধ্যে অন্তত ৮০ শতাংশ সদস্য সংগ্রহ করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রদত্ত কর্মসূচি সফল করতে সকল সদস্যবন্ধুদের আহ্বান জানিয়ে এ মাসের 'সমিতির ডাক' শেষ করছি।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি জিন্দাবাদ

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-ছাত্র-অভিভাবক ঐক্য জিন্দাবাদ

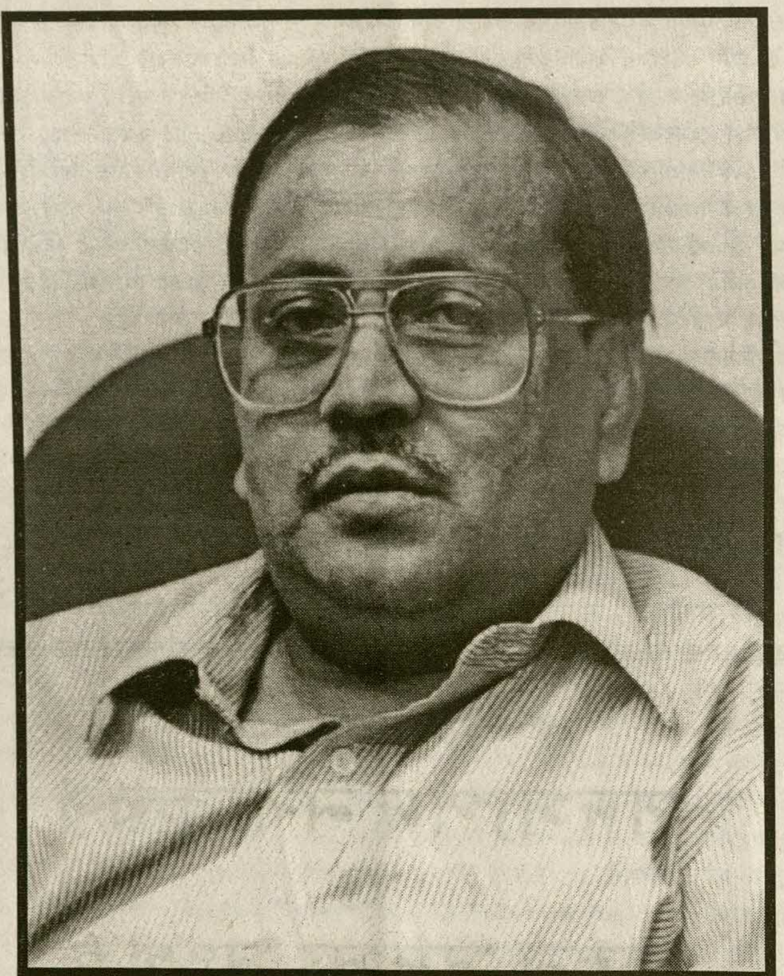
১০.০৩.২০০৬

৫—১৯শে মে, ২০০৬

সদস্যপদ নবীকরণ
ও
নতুন সদস্য সংগ্রহ
পক্ষ পালন
সফল করুন

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

কমরেড অনিল বিশ্বাসের জীবনাবসান



ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)'র পলিটব্যুরো সদস্য এবং পার্টির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক, বামফ্রন্টের অন্যতম কাণ্ডারী কমরেড অনিল বিশ্বাস ২৬শে মার্চ, ২০০৬, বিকাল ৫-২৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৮ই মার্চ রাতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে গত আটদিন ধরে তাঁর চিকিৎসা চলছিল।

'কমরেড অনিল বিশ্বাস আর নেই' — এই মর্মান্তিক সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাদেশ বিষণ্ণতায় নিমজ্জিত হয়। শোকস্তব্ধ হয়ে যায় সারা রাজ্য।

প্রয়াত কমরেড বিশ্বাস ১৯৪৪ সালের ১লা মার্চ নদীয়া জেলার করিমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৬৪ সাল থেকেই তিনি ছাত্র ফেডারেশনের নদীয়া জেলার নেতৃস্থানীয় কর্মী। ১৯৬৪ সালেই কৃষ্ণনগর গভর্ণমেন্ট কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স সহ স্নাতক হন। ১৯৬৫ সালে সি পি আই (এম)-এর সদস্যপদ লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে কংগ্রেস সরকারের পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। তিনি ১১ মাস কারারুদ্ধ থাকেন।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সহ-সভাপতি ছিলেন তিনি। 'ছাত্র সংগ্রাম' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসাবে তিনি ছাত্র আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করেন।

১৯৬৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

১৯৬৯ সালে সি পি আই (এম)-এর সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেন। এরপরে তিনি 'গণশক্তি' পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে যোগ দেন।

সত্তর দশকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হিংসাত্মক অভিযান ও আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের মধ্যে থেকে পার্টির কাজ চালিয়ে যান। ১৯৭৮ সালে সি পি আই (এম)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য হন। ১৯৮২ সালে সি পি আই (এম)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন।

১৯৮৩ সালে 'গণশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৮৫ সালে তিনি সি পি আই (এম)-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হন।

১৯৯৮ সালের ১৬ই নভেম্বর তিনি সি পি আই (এম)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই বছরই তিনি সি পি আই (এম)-এর পলিটব্যুরোর সদস্য হন।

পরপর তিনবার তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট সদস্য নির্বাচিত হন। ২০০১ সাল থেকে সি পি আই (এম), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ত্রৈমাসিক তাত্ত্বিক পত্রিকা 'মার্কসবাদী পথ'-এর সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

চীন, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন, গণতান্ত্রিক কোরিয়া, জাপান, বাংলাদেশ, সাইপ্রাস, ইউ কে, ইউ এস এ প্রভৃতি দেশ সফর করেন তিনি।

বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক প্রয়াত কমরেড অনিল বিশ্বাসের বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হলো— এক দশকঃ দুই বিশ্ব, **Democracy & Marxism (Ed), Marxism & Nation Building,** কমিউনিস্ট পার্টি ও তার মতাদর্শ প্রভৃতি।

তিনি সি পি আই (এম)-এর পার্টি ইতিহাস কমিশনের সদস্য ছিলেন। কমরেড অনিল বিশ্বাস আমাদের শিখিয়ে গেছেন বামপন্থী রাজনীতি করতে গেলে চাই গভীরভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নিয়মিত অনুশীলন এবং খুঁটিয়ে পড়ার অভ্যাস। তিনি 'গ্রন্থকীট' নামেও পরিচিত ছিলেন। অজস্র গ্রন্থ সংগ্রহ করেছিলেন। দ্বিতীয় যে শিক্ষাটি পাই তা হলো, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে মানুষের সঙ্গে নিরন্তর যোগ রেখে বামপন্থী চিন্তাধারার প্রসার ঘটাতে হবে বামপন্থী কর্মীদের। পড়াশোনা করা, নিজেকে তথ্যসমৃদ্ধ করার জন্য সদা সচেষ্ট থাকতেন তিনি। আন্তর্জাতিক বিষয়ে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে বিশদ পড়াশোনা করতেন তিনি। সম্প্রতি খুব বেশি করে পড়ছিলেন মধ্যপ্রাচ্য ও ইরানের ইতিহাস ও রাজনীতি। সাম্রাজ্যবাদ যে মাঝে মাঝে মনে করার ব্যাপার নয়, প্রতি মুহূর্তের ব্যাপার, তা জনগণকে বোঝাবার ওপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সমাজতন্ত্রই যে মানবজাতির ভবিষ্যৎ, লেখায়, কথায় ও কর্মে বুঝিয়েছেন আমাদের। কমরেড অনিল বিশ্বাস বার বার সচেতন করে দিয়ে বলেছিলেন, চতুর্দশ বিধানসভা গঠনের জন্য ও সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য এবারের লড়াই কঠিন কিন্তু সবচেয়ে ভাল ফলের রাজনৈতিক সম্ভাবনা রয়েছে বামফ্রন্টের। প্রত্যেক বাড়িতে গিয়ে নিবিড়তম প্রচার আর শিথিলতা না রেখে মজবুত নির্বাচনী সংগঠন, দুই-ই প্রয়োজন এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে।

কায়মনোবাক্যে নির্বাচনী সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন প্রয়াত কমরেড অনিল বিশ্বাস। তাঁর শেষ আহ্বান ছিলঃ রাজ্যের অগ্রগতি ও সংগ্রামকে অব্যাহত রাখতে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অশ্রুভরা বেদনা নিয়ে শোককে দুর্দমনীয় শপথে পরিণত করে পশ্চিমবঙ্গে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হবে আমাদের।

ভারতবর্ষের বুকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের অগ্রণী সৈনিক কমরেড অনিল বিশ্বাসের আকস্মিক জীবনাবসানে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি শোকস্তব্ধ। সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর স্ত্রী, কন্যা, জামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই।

কমরেড অনিল বিশ্বাস অমর রহে।

কমরেড সত্যপ্রিয় রায় স্মরণে

গোলোকপতি রায়

সহকারী সাধারণ সম্পাদক, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

কমরেড সত্যপ্রিয় রায়ের জীবনাবসান ঘটেছে ১৯৭৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি শনিবার। তাঁর অগণিত গুণমুগ্ধ বন্ধু, তাঁর প্রিয় পার্টির নেতৃবৃন্দ, মুখ্যমন্ত্রী সহ তাঁর মন্ত্রিসভার সহকর্মীবৃন্দ, তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির হাজার হাজার সদস্য সর্বস্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী বন্ধুগণ, ছাত্র, যুব, শ্রমিক, কর্মচারী নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। জেলায় জেলায় তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা তাঁর অতি নিকটের সাথীরা বেদনায় অশ্রু রোধ করতে পারিনি। আমাদের শোক অশ্রুর মধ্যে তাঁকে বিদায় দিয়েছি যথোচিত মর্যাদা সহকারে।

তাঁর জীবনাবসানে শোক প্রস্তাব আমি রচনা করতে বসিনি। একটি প্রবল ধীশক্তিসম্পন্ন মানুষকে দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর ধরে যেভাবে আমি দেখেছি এবং ধীরে ধীরে এই মানুষটি সংগ্রামের মধ্যদিয়ে নিজ অভিজ্ঞতায় নির্যাতিত, নিপীড়িত মানুষের সংগ্রামের অংশীদার হয়েছেন তার কিঞ্চিত পরিচয় দেওয়াই আমার এই প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯২১ সালে। কিন্তু সেই সময়ে যাঁরা এর নেতৃত্বে ছিলেন তাঁদের প্রধান কাজ ছিল আবেদন-নিবেদনের মধ্যদিয়ে কিছু সুবিধা আদায় করা এবং কিছু পাঠ্যপুস্তক রচনা ও বিক্রয় করা। ১৯৪৩ সালে আমি সর্বপ্রথম শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করি। আমরা যাঁরা অতি অল্প বয়স হতেই রাজনীতি আরম্ভ করি, শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করার পূর্বেই স্বাভাবিকভাবেই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রতি আকৃষ্ট হই। কিন্তু সেই সময়ের নেতৃত্বকে কোন মতেই সংগ্রামমুখী করা গেল না। এইভাবে কিছুদিন চলার পরে ১৯৪৮ সালের মধ্যভাগে শিক্ষকদের চাপে পড়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বর্তমান ভারতসভা ভবনে শিক্ষকদের এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনেই কমরেড সত্যপ্রিয় রায়কে আমি প্রথম দেখি। এই সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হলো যে, আগামী ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সাল সারা পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকেরা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করবেন। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন চেতলা বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিনের সভায় এই প্রস্তাবকে বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরলেন কমরেড সত্যপ্রিয় রায়। তাঁর সেদিনের ভাষণের মধ্যদিয়ে আমরা উপলব্ধি করলাম যে, পুরোনো নেতৃত্বের বদলে শিক্ষকসমাজকে সঠিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা এই মানুষটির আছে। ১লা সেপ্টেম্বরের সে ধর্মঘটকে বাধা দেওয়ার জন্যে সেই সময়ের কংগ্রেসী সরকার অগ্রসর হলেন। পুরোনো নেতৃত্বের অনেকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন কিন্তু সেদিন কমরেড সত্যপ্রিয় রায়ের ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে সারা পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষকসমাজ এই ধর্মঘটকে সফল করে তুললেন।

এরপর আরম্ভ হলো প্রস্তুতিপর্ব, প্রগতি-বিরোধী শিক্ষক-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম। কমরেড রায়ের নেতৃত্বে গড়ে উঠলো "ডেমোক্র্যাটিক টিচার্স ফ্রন্ট"। এই ফ্রন্টের মাধ্যমেই তিনি নবগঠিত 'মধ্যশিক্ষা পর্ষদে' শিক্ষকদের জন্যে সংরক্ষিত বেশ কয়েকটি আসনে গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল প্রার্থীদের জয়যুক্ত করলেন। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময়ে বাংলাদেশ দ্বিধাবিভক্ত হয়েছিল। সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকেও পূর্ববঙ্গ শিক্ষক সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতিতে ভাগ করা হলো। কিছুদিন এই পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি কমরেড রায়ের নেতৃত্বে চলেছিলো। কিন্তু শিক্ষকসমাজের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত কমরেড রায় বুঝতে পারলেন যে, মূল সংগঠন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিকে অধিকার করতে না পারলে মাধ্যমিক শিক্ষকসমাজকে সংগঠিত করা সম্ভব হবে না। তাই আরম্ভ হলো তাঁর নেতৃত্বে সমিতির ভিতরে আদর্শের সংগ্রাম। সদলে কমরেড রায় সমিতির

নূতন সংবিধান রচনা ও গ্রহণের জন্যে পুরোনো নেতৃত্বের উপরে চাপ সৃষ্টি করতে আরম্ভ করলেন। পর পর সমিতির দুইটি সম্মেলনে প্রচণ্ড সংগ্রামের পর সমিতির নূতন সংবিধান গৃহীত হলো। এরপর ১৯৫২ সালে সমিতির শিলিগুড়ি সম্মেলনে কমরেড সত্যপ্রিয় রায় পুরাতন সংবিধান অনুসারে সমিতির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। এইবার তিনি প্রকৃত নেতার মতো সমিতির হাল ধরলেন। তাঁর নেতৃত্বে মাধ্যমিক শিক্ষকেরা ঐ বৎসরই বেতন ও ভাতা বৃদ্ধির দাবিতে বিধানসভা অভিযান করলেন। সেদিনের বিরোধী দলের নেতা কমরেড জ্যোতি বসু ও অন্যান্য বামপন্থী নেতৃগণ এই মিছিলের সামনে শিক্ষকদের দাবির সমর্থনে বক্তৃতা দিলেন। এরপর অনুষ্ঠিত হলো হুগলী জেলার চুঁচুড়া শহরে ১৯৫৩ সালে সমিতির বার্ষিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে প্রস্তাব গৃহীত হলো যে, মাধ্যমিক শিক্ষকদের দাবি সরকার না মানলে ১৯৫৪ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি হতে সারা পশ্চিমবাংলার মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি করবেন। এই সম্মেলনে সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হলেন মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত। তিনি এই সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। পুরাতন নেতৃত্বের অনেকে সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলেও তিনি কোনোদিন সমিতির বাইরে যাননি। সমিতির কার্যকরী কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলেন কমরেড সত্যপ্রিয় রায়। কমরেড রায় তাঁর এই কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন যে, শিক্ষকসমাজ নিজেদের জাতির স্রষ্টা বলে মনে করলেও তাঁদের জাতীয় মর্যাদা নাই। সমাজে শিক্ষকেরা অবহেলিত, নিদারুণ দুর্দশার মধ্যে তাঁদের জীবন অতিবাহিত করতে হয়। তিনি এটাও অনুভব করেছিলেন যে, শিক্ষা ও শিক্ষক অভিন্ন। এক-কে বাদ দিয়ে অন্যের উন্নতি করা যায় না। তাই তিনি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের মর্যাদা বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতির আন্দোলন একসঙ্গে আরম্ভ করলেন। ১৯৫৩ হতে ১৯৫৪ এই এক বৎসর কাল কমরেড সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে কমরেড অনিলা দেবী এবং আমরা যাঁরা তাঁর সাথী ছিলাম, সকলে একত্রে সমস্ত পশ্চিমবাংলায় চুঁচুড়া সম্মেলনের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার কাজে আত্মনিয়োগ করলাম। সেই সময়ে দেখেছি, এই অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটি কীভাবে সারা পশ্চিমবাংলার বিদ্যালয়ে এই সংগ্রাম সংগঠিত করেছিলেন। আরম্ভ হলো তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ১৯৫৪ সালের ঐতিহাসিক কর্মবিরতি সংগ্রাম। হাজারে হাজারে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা বিদ্যালয়ে কর্মবিরতি করে রাস্তায় বের হলেন। দু'দিন কর্মবিরতি চলার পর ১২ই ফেব্রুয়ারি হতে শুরু হলো এর সঙ্গে অবস্থান ধর্মঘট। বিধানসভার ভিতরে ও বাইরে বামপন্থী দলসমূহ শিক্ষকদের এই সংগ্রামকে সমর্থন জানালেন, যদিও এই আন্দোলনের নেতৃত্ব সমিতির হাতেই ছিল। সে সময়ে কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। হঠাৎ ১৫ই ফেব্রুয়ারি রাত্রের শেষভাগে সরকারের পুলিস অবস্থান ধর্মঘটরত কমরেড সত্যপ্রিয় রায় ও কমরেড অনিলা দেবী সহ আমাদের প্রায় তিনশত পঞ্চাশজন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করলেন। এর প্রতিবাদে সমস্ত বামপন্থী দল আইন অমান্য করলেন; চললো পুলিসের লাঠি ও গুলি। এর ফলে শিক্ষকসহ কয়েকজন নিহত হলেন। কিন্তু আন্দোলন থামলো না। অবশেষে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় সমিতির কতকগুলি দাবি মেনে নিলেন এবং সমিতির কার্যকরী সমিতির সিদ্ধান্ত অনুসারে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলো। এই শিক্ষক আন্দোলন হতে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষও সংগ্রামের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। এরপর হতে সমিতির সমস্ত সংগ্রামে ছিলেন তিনিই পুরোধা। ১৯৫৪ সালে তিনি বিধান পরিষদে নির্বাচিত হলেন। শুরু হলো তাঁর নূতন সংগ্রাম বিধান পরিষদের ভিতরে ও বাইরে।

এই সংগ্রামী মানুষটির প্রতি সংগ্রামের ইতিহাস এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে দেওয়া সম্ভব নয়, আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। আমি এবার প্রধানত যেটা দেখাতে চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তাঁর সাধারণ মানুষের সংগ্রামের প্রতি নূতন উপলব্ধি এবং সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা এবং সহকর্মীদের সেইদিকে আকর্ষণ করা। শিক্ষক সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যদিয়ে তিনি বুঝেছিলেন শিক্ষাকে যেমন দরিদ্রের কুটীর হতে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত সর্বত্র সম্প্রসারিত করতে হবে তেমনি বুঝেছিলেন ছোট ছোট সংগ্রামগুলিকে একত্র করতে না পারলে সংগ্রামের সাফল্য সম্ভব নয়। আজকে আর লুকিয়ে লাভ নেই যে, সংগ্রামী প্রগতিশীল নেতা হিসাবে সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে না। তাই ধীরে

ধীরে তিনি প্রথমদিকে যুক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে পার্টি বিভক্ত হওয়ার পর মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির দিকেই তিনি আকৃষ্ট হন। আমরা কম্যুনিস্টরা প্রথম হতে যাঁরা তার সঙ্গে সংগ্রামে ছিলাম তাঁকে বারে বারে পার্টির সদস্যপদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করি। তিনি হাসি মুখে বলতেন, "আমি তো ভায়া তোমাদের নীতিতে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী। কিন্তু এই বয়সে আমার মত একজন মানুষ যে ব্যক্তিমনোভাব সম্পূর্ণ বর্জন করতে পারিনি — Communist Party is a disciplined Party. আমার বয়স হয়েছে, আমি কি এই নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে কাজ করতে পারবো ?" ১৯৫৭-৫৮ সালে তাঁর কিছু পুরাতন বন্ধু যাঁরা চিরকালই কম্যুনিস্ট-বিরোধী, নানা কারণে আজ আমি তাঁদের নাম উল্লেখ করতে চাইনে। এই সমস্ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ব্যক্তিরা তাঁকে কম্যুনিস্ট-বিরোধী ফ্রন্টের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৫৯ সালের আসানসোলে সমিতির সম্মেলনে এই কম্যুনিস্ট-বিরোধীরা বিশেষ গোলমাল করার চেষ্টা করেন, এমন কি সমিতির নেতা হিসাবে তাঁকেও নাস্তানাবুদ করার চেষ্টা করেন। তখন তিনি দেখলেন যে, এইসব সুবিধাবাদী ও তাঁর চিরকালের সংগ্রামের সাথী কম্যুনিস্টদের মধ্যে কত তফাৎ। তাঁর স্বচ্ছদৃষ্টি সেদিন তাঁকে সঠিক পথ বেছে নিতে সাহায্য করেছিল। এই সুবিধাভোগীদের জীবনে আর কখনও তিনি আমল দেননি।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমানা সংঘর্ষের সময়ে পার্টি অফিসগুলির মতো আমাদের সমিতির অফিসও আক্রান্ত হয়। তখন সমগ্র দেশে একটা ভ্রান্ত জাতীয়তাবোধের বন্যা প্রবাহিত হচ্ছিল। অনেক সুবিধাভোগী তখন কম্যুনিস্টদের ছেড়ে কম্যুনিস্ট বিরোধিতার জোয়ারে গা ভাসিয়েছেন। কিন্তু এই মানুষটিকে দেখেছি বজ্রকঠোর মনোভাব নিয়ে যে নীতির প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠা সেই নীতিই মেনে চলেছেন। সেদিন আমাদের অফিস যখন আক্রান্ত হয়েছিল তখন আমরা তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী সেখানে উপস্থিত ছিলাম। একদল সমাজবিরোধী তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নিয়ে অফিসে প্রবেশ করে কমরেড রায় সহ আমাদের প্রত্যেককে চীনাপন্থী বলে অভিহিত করেন এবং তাঁর পদত্যাগপত্র দাবি করেন।

অত্যন্ত কাছে দাঁড়িয়েছিলাম তাই আজও তাঁর সেই দৃপ্ত উত্তরটি আমার মনে আছে। তিনি বললেন, "আমি শিক্ষকসমাজের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এখানে এসেছি। তাঁরা একযোগে আমার পদত্যাগ দাবি করলে এখনই এই স্থান হতে চলে যাবো। কিন্তু আমার মৃতদেহ এখানে পড়ে থাকবে তবু আপনাদের কাছে আমি পদত্যাগ করবো না।" এরপর হতে এই সংগ্রামী সমিতিকে ভাঙার জন্য কংগ্রেস দল, সরকার এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিচক্র একত্র হয়েছিল। কমরেড রায় এবং তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীবৃন্দ এবং শিক্ষকসমাজের বৃহত্তম অংশ সমিতির পাশে সেদিন যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তাতে সেই কাজ সম্ভব হয়নি। সমিতির এই শক্তির পুরোভাগে দাঁড়িয়েছিলেন কমরেড সত্যপ্রিয় রায়। ১৯৬৫ সালে যখন আন্দোলন প্রায় বন্ধ, চারিদিকে ভীতসন্ত্রস্ত ভাব, সেদিন কমরেড রায় বজ্রকণ্ঠে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘটের আহ্বান দিলেন। এই আন্দোলনের ফলে মানুষের জড়তা কাটিয়ে ধীরে ধীরে অন্য সংগঠনগুলিও সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে আরম্ভ করলো। এগিয়ে এলো ১৯৬৬ সাল। প্রগতিশীল আন্দোলনে নেতারা সকলে প্রায় জেলে। ১৯৬৬ সালে আরম্ভ হলো খাদ্য আন্দোলন। এই আন্দোলনে জাতির সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা যাতে যুক্ত হন এবং এই আন্দোলনে সামিল হন তার জন্য কমরেড সত্যপ্রিয় রায় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বলিষ্ঠ আহ্বান জানালেন। এই আন্দোলনে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করলেন। এর পূর্বে ১৯৬৪ সালে তিনি আর একবার জেলে গিয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তিনি পুনরায় সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে কর্মবিরতি ও অবস্থানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। এই সময়ে তাঁর সর্বাপেক্ষা বড় কাজ হচ্ছে ১২ই জুলাই কমিটিতে শিক্ষক সমিতিকে যুক্ত করা। যে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারায় তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, দিনের পর দিন সে চিন্তাধারা তাঁকে এইভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান হবে না। তাই ১৯৬৬ সালে যখন তাঁর নেতৃত্বে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমাজ একমাস ধর্মঘট ও অবস্থান করলেন, প্রায় চার সহস্রাধিক শিক্ষক কারাবরণ করলেন তখনও সরকারের টনক নড়লো না। তদানীন্তন কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমাজের কোনো দাবি মেনে নিলেন না ; তখন তিনি আন্দোলন প্রত্যাহার করলেন কার্যকরী সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রস্তাবে তিনি বললেন যে, বর্তমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার কেবলমাত্র জনবিরোধী নয়, শিক্ষাবিরোধীও। সুতরাং তিনি আহ্বান জানালেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে এই সরকারকে গদিচ্যুত কর। —

"Oust this anti-people and anti-educational Govt. in the General Election". আমার যতদূর মনে হয়, গণসংগঠনের মঞ্চ হতে এই আহ্বান বোধহয় প্রথম। এ বিষয় নিয়ে কিছু কর্মী ও নেতার সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হলেও তিনি তাঁর মত দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করেন এবং শিক্ষকসমাজও তাঁর নির্দেশে এই প্রস্তাব কার্যকরী করার জন্যে অগ্রসর হন।

এক কথায় বলা যায় যে, এই সাহসী মানুষটিকে আর কেবলমাত্র শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নেতা হিসাবে নয়, জননেতা হিসাবেই জনসাধারণ তাঁকে বরণ করলেন। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির নীতিকে তিনি মনেপ্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তার একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ১৯৬৭ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন। উত্তর-পশ্চিম লোকসভা কেন্দ্র (কলকাতা) — এই আসনে সাধারণত বামপন্থী পার্টির পক্ষে জয়লাভ করা দুরূহ। মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁকে অনুরোধ করলেন এই আসনে দাঁড়ানোর জন্য। তিনি মনেপ্রাণে জানতেন যে, তিনি জয়লাভ করতে পারবেন না। তা সত্ত্বেও তিনি পার্টির অনুরোধে উক্ত আসনে প্রার্থী হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে বসে কাজ করতে গিয়ে অনেক বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি। এই আলোচনার মধ্যদিয়ে বুঝতে পেরেছিলাম যে, সমাজতন্ত্র ছাড়া উপায় নাই এবং সমাজতন্ত্র কায়েম করার কাজ একমাত্র মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষেই সম্ভব।

১৯৬৯ সালে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি তাঁকে শিক্ষামন্ত্রী করেছিলেন শিক্ষক আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতা হিসাবে। পার্টির সে নির্দেশ তিনি মাথা পেতে নিয়েছিলেন এবং যতদিন তিনি মন্ত্রী ছিলেন ততদিন নিষ্ঠার সঙ্গে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছিলেন। শিক্ষক আন্দোলনের নেতা হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্রদের নিয়েই শিক্ষা। তাই শিক্ষার উন্নতি ও সম্প্রসারণ করতে হলে একদিকে যেমন বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি নূতনভাবে জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচলন করা উচিত ; তেমনি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের চাকুরির নিরাপত্তা এবং তাঁদের বেতন ও ভাতা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এই দাবির ভিত্তিতে দীর্ঘদিন তিনি সমিতির সম্পাদক ও সভাপতিরূপে সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। তিনি মনে করতেন যে, শিক্ষার ব্যয় দরিদ্র জনসাধারণের উপর চাপানো উচিত নয়। শিক্ষার সমগ্র ব্যয়ই দেশের সরকারকে বহন করতে হবে। সরকারী মহার্ঘভাতা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর চিরকালের দাবি ছিল যে, বিদ্যালয়ে একজন চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হতে শিক্ষাজগতের অধ্যক্ষ পর্যন্ত সকলেই সমান হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার অধিকারী। কংগ্রেসী সরকার এই দাবি কোনোদিন মানেননি। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সময়ে মহার্ঘভাতা ঘোষণার পর তিনি সমিতির পক্ষ হতে তদানীন্তন যুক্তফ্রন্টের অর্থমন্ত্রী কমরেড জ্যোতি বসুকে অনুরোধ করেন যে, শিক্ষকদের মহার্ঘভাতা হতে দুই টাকা কম করে সেই সময়ে ১৫ হাজার অ-শিক্ষক কর্মীদের অতিরিক্ত মাসিক পনের টাকা মহার্ঘভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা হোক। কমরেড জ্যোতি বসু কমরেড রায়ের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এর জন্যে তাঁকে একশ্রেণির শিক্ষকদের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। অবশ্য তিনি তার যথাযোগ্য উত্তর দিয়েছিলেন। নিজে শিক্ষামন্ত্রী হওয়ার পরে তিনি মহার্ঘভাতা ঘোষণার সময় তাঁর চিরদিনের দাবি সমহারে মহার্ঘভাতা দেওয়া তা পূরণ করেন। এই টাকার অঙ্ক বেশি না হলেও বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী হতে কলেজের অধ্যক্ষ পর্যন্ত একই হারে মহার্ঘভাতা পান। একথা আমি এই জন্যে উল্লেখ করছি যে, একটা মানুষ কীভাবে তাঁর মত ও পথকে বলিষ্ঠভাবে অনুসরণ করতে পারেন কমরেড রায় তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বানচাল করার জন্যে তার জন্মলগ্ন হতেই প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। তা সত্ত্বেও যে কয়েকমাস তিনি কাজ করতে পেরেছিলেন তার মধ্যেই শিক্ষকদের চাকুরির নিরাপত্তা বিধান এবং সাহায্যপ্রাপ্ত ও সাহায্যহীন বিদ্যালয়ের সর্বস্তরের কর্মীদের জন্য পেনশন দানের ব্যবস্থা করেন। অ-শিক্ষক কর্মীদের ছেলেমেয়েদের মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন আর প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে কংগ্রেসী আমলের কিছু বাস্তুঘুঘুর বাসা ভেঙে দেন। প্রাথমিক শিক্ষার নূতন আইন রচনা করেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনার নূতন বিধি প্রণয়ন করেন এবং কলেজ শিক্ষকদের জন্য একটি নূতন বেতনহার ঘোষণা করেন। যুক্তফ্রন্টের কী শিক্ষানীতি হওয়া উচিত তাও ঘোষণা করেন। এই সময়ে বিধান পরিষদ বিলুপ্ত হওয়াতে কমরেড নিরঞ্জন সেনের জীবনাবসান ঘটায় টালিগঞ্জের আসনে তিনি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ২৪ হাজারেরও বেশি ভোটে কংগ্রেসী প্রার্থীকে পরাজিত করে

বিধানসভার সদস্য হন। ১৯৭১ সালে অন্তর্বর্তীকালীন নির্বাচনেও তিনি উক্ত আসনে জয়লাভ করেন।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শিক্ষক নেতা কমরেড সত্যপ্রিয় রায় সংগ্রামের অভিজ্ঞতায় বুঝেছিলেন যে, মানুষের মুক্তি আসবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা হলে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলে। এই জন্যে তিনি প্রথমে যুক্ত কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং পরবর্তীকালে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিই তাঁর আনুগত্য ছিল। ১৯৭১ সালের ৬ই এপ্রিল নকশাল ও কংগ্রেসী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হাতে মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট নেতা ও নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সর্বোচ্চ নেতৃত্বের অন্যতম কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য নিহত হন। সংবাদ পাওয়া মাত্র কমরেড অনিলাদি কমরেড অমিতাভ সেনকে সঙ্গে নিয়ে বহরমপুরে গিয়েছেন। সারা পশ্চিমবাংলার বিদ্যালয়গুলিতে পরের দিন ধর্মঘটের আবেদন দেওয়া হয়েছে। কমরেড রথীনদা নকশাল ও কংগ্রেসী চক্রের দ্বারা ভীষণভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির ভবনে বিকেলে আমি এবং সত্যপ্রিয়বাবু বসে কমরেড সন্তোষের এইভাবে নিহত হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি হঠাৎ আমাকে বললেন, "ভায়া পার্টি সদস্যপদ নেওয়ার জন্যে অনেকবার তোমরা অনুরোধ করেছ, পার্টির প্রতি আমার পূর্ণ আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও শৃঙ্খলাবদ্ধ পার্টির সদস্যপদ আমি নিতে ইতঃস্তত করেছি। পার্টি নেতৃত্ব ও পার্টি সদস্যদের অকুণ্ঠ ভালবাসা আমি পেয়েছি। অন্তরে বিশ্বাসও করেছি যে, ভবিষ্যতে মানুষকে মুক্তির পথে এই পার্টি নিয়ে যেতে সমর্থ। কিন্তু আজ পার্টির উপরে নেমে এসেছে প্রচণ্ড আঘাত। নকশাল, কংগ্রেস এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্র আজ পার্টিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, এই বিপদের দিনে আর পার্টির বাইরে না থেকে আমি পার্টির ভিতরে গিয়েই পার্টির সেবা করতে চাই। আমাকে পার্টি সদস্যপদ দেওয়ার জন্যে আমি আবেদন করতে চাই।" আমি বিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে চোখ নামিয়ে বললাম, "আমি সানন্দে আপনার কথা পার্টি নেতৃত্বকে জানাবো।" আর তার পরদিনই তাঁর বক্তব্য পার্টি নেতৃত্বকে জানাই এবং তাঁরা নিয়মানুসারে তাঁকে পার্টি সদস্যপদ গ্রহণের অনুমতি দেন। এইভাবে ১৯৭১ সালেই তিনি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টির প্রার্থী সদস্যপদ লাভ করেন এবং যথাসময়ে নিজ যোগ্যতায় পূর্ণ সদস্যের মর্যাদা লাভ করেন। এই কথাগুলি এই জন্যেই উল্লেখ করলাম যে, একটি মানুষ, সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যাঁর পূর্বে বিশেষ যোগাযোগ ছিল না, বিক্ষোভ-আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে প্রথম থেকেই নেতৃত্বপদ লাভ করেন। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়েই শিক্ষা দর্শন সম্পর্কে অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এই রকম ওয়াকিবহাল মানুষ অত্যন্ত বিরল। এক কথায় বলা যায়, শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর প্রায় কিছু অজানা ছিল না। আবার এই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আন্দোলন পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি ক্রমে ক্রমে গণ-আন্দোলনেরও এক সক্রিয় নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এই আন্দোলনের মধ্যদিয়েই তিনি মার্কসীয় দর্শনের দিকে আকৃষ্ট হন এবং কম্যুনিস্টরাই শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক এবং এঁরাই ভারতবর্ষের একদিন প্রকৃত মুক্তি আনতে পারবে — এই মত ও পথকে তিনি গ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের শিক্ষক আন্দোলনের পথিকৃৎ কমরেড রায় আন্তর্জাতিক শিক্ষক আন্দোলনেরও অন্যতম নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। সে আলোচনায় আমি যেতে চাই না। আমি কেবলমাত্র মানুষ সত্যপ্রিয় রায় কীভাবে ধীরে ধীরে নিজেকে নির্যাতিত মানুষের প্রকৃত সংগ্রামী নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই দিকটাই এই লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরলাম। ১৯৭৭ সালে নূতন বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর গত সেপ্টেম্বর মাসে বামফ্রন্ট সরকার তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রশাসক পদে নিযুক্ত করেন। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সামান্য কয়েক মাস পর্ষদে কাজ করে সেখানেও তাঁর প্রতিভার স্পর্শ রেখে গিয়েছেন।

উৎস ঃ শিক্ষা ও সাহিত্য/সত্যপ্রিয় রায় স্মরণ সংখ্যা/৫৮তম বর্ষ/ মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৯

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা আন্দোলনের বিকাশ ও সত্যপ্রিয় রায়

ভবেশ মৈত্র

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা আন্দোলন ও বামপন্থী আন্দোলন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। যুক্তবঙ্গে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালে। এই সময়েই অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখা বঙ্গদেশে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে হাত দেয়। তার পরের দশকে সর্বভারতীয় কৃষক সভা ও অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস ফেডারেশন গঠিত হলো এবং এই প্রদেশে নিজ নিজ সংগঠন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

১৯২১ সালে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি বা অল বেঙ্গল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (এ বি টি এ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২ সালে প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সমিতির দুইটি মুখ্য উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়। এই উদ্দেশ্য দু'টি হলো— " To improve the status of Teachars (2) To form a brotherhood of Teachers and enble the profession."

ব্রিটিশ শাসনকালে জাতীয় আন্দোলন ও শিক্ষক আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকলেও শিক্ষার প্রসার ও শিক্ষকদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন কিছুই প্রায় হয়নি। শিক্ষা সম্পর্কে উপনিবেশবাদী শাসকদের মনোভাব ছিল সম্পূর্ণ জাতীয়তা-বিরোধী। জনশিক্ষা যেমন ছিল উপেক্ষিত তেমনি শিক্ষকদের আর্থিক ও পেশাগত অবস্থা ছিল দুর্বিসহ। সে সময়ের শাসকরা শিক্ষার আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। বছরের পর বছর আবেদন-নিবেদন করার পরেও কোনো কণ্ঠ পাওয়া যায়নি। সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রেই এই বঞ্চনার চিত্র। জনসাধারণ সবাই মিলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। তাদের স্বপ্ন ছিল দেশ স্বাধীন হলে ভারতবাসী তার মানবিক অধিকারগুলি ভোগ করতে পারবে। নিরক্ষরতা ও অনাহার দেশ থেকে অপসৃত হবে। শিক্ষক-সহ সমাজের সমস্ত খেটে-খাওয়া মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার ভোগ করার সুযোগ পাবে। রুশ দেশে লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হওয়ার পরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষেরা আশার আলো দেখতে পান।

বহু রক্তপাত এবং অগণিত মানুষের আত্মত্যাগের ফলে ইংরেজ শাসকরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে বাধ্য হলেও যাবার সময় এই মহান দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের অঙ্গচ্ছেদ করে পাকিস্তান নামে একটি আলাদা রাষ্ট্র তৈরি করে। ভারতের শাসনভার জাতীয় কংগ্রেসের হাতে এবং পাকিস্তানের শাসনভার মুসলিম লিগের হাতে দিয়ে যায়। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের একটি আইনের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসকদের কাছ থেকে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ক্ষমতার হস্তান্তর হয়।

১৯৪৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে ভারতের সংবিধান অনুমোদিত হয়। এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে সংবিধান চালু হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইতোমধ্যে রুশ দেশের লালফৌজের কাছে ফ্যাসিবাদী হিটলারের পরাজয় ঘটে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর দেশের আর্থিক সঙ্কট চরম আকার ধারণ করে। পঞ্চাশের মন্বন্তর (১৯৪৩ সাল) বাংলাদেশকে শ্মশানে পরিণত করেছিল। তার উপর দেশ বিভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা-সহ সাধারণ জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। স্কুল, কলেজ এবং কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের জীবনে নেমে আসে চরম আঘাত।

শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য স্বাধীনতা- পূর্ব যুগ থেকেই শিক্ষক সমিতিগুলি সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করে আসছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক বছর অতিবাহিত হলেও সে সময়ের কংগ্রেস সরকার কোনোরকম আলাপ-আলোচনায় বসতে রাজি না হবার ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বাঁধতে

থাকে। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সে সময়ের নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ শিক্ষক সমাজের মনোভাবকে সক্রিয় কর্মসূচির মাধ্যমে প্রকাশ করতে গররাজি হওয়ায় সাধারণ শিক্ষকদের চাপে নেতৃবৃন্দ শিক্ষকদের সাধারণ সভা ডাকতে বাধ্য হয়। ঐ সভা কলকাতার ভারত সভা হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন চেতলা বয়েজ হাইস্কুলের শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সত্যপ্রিয় রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন। শিক্ষকতা বৃত্তিকে তিনি ব্রত হিসাবে বেছে নেন। ১৯২৯ সালে ময়মনসিংহ জেলার একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন। তারপর তিনি চট্টগ্রাম জেলার কানুনগোপাড়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতায় এসে কালীধন হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

ভারতসভা হলের সভায় সমিতির নেতৃবৃন্দের দোদুল্যমানতার বিরুদ্ধে সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে একদল সংগ্রামী শিক্ষক সক্রিয় কর্মসূচির সপক্ষে সরব হয়ে ওঠেন। এদের মধ্যে ছিলেন হীরেন রায়, অজিত দাস, ভুজঙ্গভূষণ ভট্টাচার্য, সুধা রায় প্রমুখ সংগ্রামী শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। শ্রীমতী মীরা সেন (চ্যাটার্জী) ও গোলোকপতি রায়ও ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেরই কমিউনিস্ট পার্টির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সত্যপ্রিয় রায়ের তথ্যনির্ভর ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে উপস্থিত সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা খুবই উদ্বুদ্ধ হন। ভারতসভা হলের এই সমাবেশ থেকে ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ তারিখে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের একদিনের প্রতীক কর্মবিরতি পালনের সিদ্ধান্ত হয়। সে সময়ের অবস্থা অনুযায়ী এই কর্মসূচি ছিল অত্যন্ত দুঃসাহসিক। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা এই প্রতীক কর্মবিরতিতে অংশগ্রহণ করে এই কর্মসূচিটি সফল করেন। কয়েকটি বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি কয়েকজন শিক্ষককে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেন। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ শিক্ষকদের এই সংগ্রামে সক্রিয় সমর্থন জানায়। এই সংগ্রামের মধ্যদিয়ে সত্যপ্রিয় রায় সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন এবং দলমত নির্বিশেষে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেন। এই সময়ে অনিলা দেবীর মতো একজন শক্তিশালী ও সাহসী সংগঠক এবং সুবক্তা, প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট নেত্রী, কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এ বি টি এ'র সংগঠনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ফলে সমিতির আন্দোলনে একটি মাত্রা যুক্ত হয়।

১৯৫০ সালের পর পশ্চিমবঙ্গের জনবসতির এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ ও শিশু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এই রাজ্যে চলে আসতে বাধ্য হয়। আশ্রয়হীন এই মানুষগুলির মধ্যে ছিল বিভিন্ন পেশার লোক। উচ্চশিক্ষিত থেকে নিরক্ষর এবং ধনী থেকে বিত্তহীন দরিদ্র মানুষও চলে আসেন এপারে। কোনোরকমে মাথা গোঁজার ঠাঁই পাওয়াও ছিল অসম্ভব। এদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। উদ্বাস্তু কলোনিগুলিতে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষেরা বিদ্যালয় স্থাপন করে কোথাও স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে বা অতি সামান্য পারিশ্রমিকে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত হন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে অনেকেই পূর্ববাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন। এপারে এসেও অনেকেই তাঁদের অতীত ভুলতে পারেননি। এই অবস্থায় দুই/তিন বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক জনগোষ্ঠীর মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। এ রাজ্যের কংগ্রেস সরকার উদ্বাস্তুদের উপর মোটেই সহানুভূতিশীল ছিল না, ফলে তাদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ জমছিল। এসবের প্রতিফলন ঘটে শিক্ষক সংগঠন ও শিক্ষক আন্দোলনের উপর।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সে সময়ের সাংগঠনিক কাঠামো তখনকার শিক্ষক মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। অগ্রসরমনা শিক্ষকেরা সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও ব্যাপক ও গণতান্ত্রিক করার সপক্ষে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেন। ১৯৫০ সালে বিষ্ণুপুর সম্মেলনে সত্যপ্রিয় রায় সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে নির্বাচিত হন সমিতির কার্যকরী সভাপতি এবং ১৯৫৩ সালে সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ঐ বছরেই চুঁচুড়া সম্মেলনে সমিতির সংবিধান পরিবর্তিত হয়। এই সংশোধনের মাধ্যমে জেলা ও মহকুমা সমিতিগুলিকে শক্তিশালী ও প্রতিনিধিত্বমূলক করা হয়। আঞ্চলিক ভিত্তিতে সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার প্রথাও প্রচলিত হয়। এই সংবিধান বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে সমিতিকে সংগ্রামী কর্মসূচি রূপায়িত করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলা হয়। দলমত নির্বিশেষে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের শতকরা ৮০ ভাগ সমিতির সদস্য তালিকাভুক্ত হন।

প্রতি বছরই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অর্থাৎ তাঁদের বেতন, ভাতা, চাকুরীর নিরাপত্তা ও শর্তাবলীর উন্নতির জন্য ধারাবাহিকভাবে আবেদন-নিবেদন, মিটিং-মিছিল ইত্যাদি চলতে থাকলেও সরকার বিশেষ গুরুত্বের সাথে সমিতির দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনায় বসতে আগ্রহ দেখায়নি। এর সাথে সাথে 'সকলের জন্য শিক্ষা'র দাবিতে সোচ্চার হয় সমিতি।

বিভিন্ন দেশের শিক্ষার ইতিহাস পর্যালোচনা করে এবং ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪৫নং ধারায় বর্ণিত নিঃশুল্ক সর্বজনীন শিক্ষার রূপদান করতে সরকারী দায় ও দায়িত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে জনশিক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি। ছাত্র ও অন্যান্য শিক্ষক সংগঠনের সাথে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষকেরা সমিতির নেতৃত্বে সর্বজনীন শিক্ষার জন্য দাবি করেন। মিটিং-মিছিলের মাধ্যমে একদিকে এর সপক্ষে জনমত গঠন করা, অন্যদিকে সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি চলতে থাকে। শিক্ষক সমিতির এই সতর্ক ও সনিষ্ঠ আন্দোলন সমস্ত স্তরের খেটে-খাওয়া মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে শিক্ষক আন্দোলনের বিষয় ও পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন আসে, তাতে কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল। যদিও সংখ্যাগত দিক থেকে তাদের সংখ্যা বেশি ছিল না।

১৯৫২ সালের নির্বাচনে কিছুসংখ্যক কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের শিক্ষক বিধানসভা ও বিধান পরিষদে নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালের ২২শে জুন ভারতসভা হলে সমিতি আহূত নির্ধারিত এম এল এ এবং এম এল সি'দের আমন্ত্রণ জানানো হয়। ১৮ জন শিক্ষক প্রতিনিধি উপস্থিত হন। কংগ্রেসের বিশিষ্ট সদস্য জে সি গুপ্ত ও ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এবারের বাজেটে ও শিক্ষার প্রতি যে অবহেলা চলছে তার প্রতিকারের কোনো ব্যবস্থা নাই।" সত্যপ্রিয় রায় এই সভার অনুমোদনের জন্য একটি স্মারকলিপির খসড়া প্রস্তুত করেন। এই সমাবেশে আমন্ত্রিত ছিলেন শ্রীজ্যোতি বসু। তিনি বলেন, "শিক্ষকেরা কেবল নিজেদের বেতন বৃদ্ধির দাবি করেননি, তাঁরা দেশকে শিক্ষিত করার দাবি করেছেন।" সকলেই ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের যৌথ আন্দোলনের কথা বলেন।

এই সময়েই নবগঠিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ একটি খসড়া 'স্কুল কোড' প্রকাশ করেন। এই 'স্কুল কোড'কে অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী, শিক্ষা-বিরোধী ও শিক্ষক-বিরোধী বলে সমালোচনা করা হয়। এই 'কোড'কে "স্কুল পেনাল কোড" বলে আখ্যায়িত করা হয়। পর্ষদের ভিতরে ও বাইরে রাজ্যব্যাপী সভা-মিছিল সংগঠিত হতে লাগল। ২২শে জুলাই সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির কার্যকরী সভাপতি সত্যপ্রিয় রায় সমিতির আপত্তিগুলি তথ্য ও যুক্তিসহ তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরেন। ৪ঠা আগস্ট সত্যপ্রিয় রায় ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত সমিতির মনোভাব পর্ষদের সভাপতিকে জানিয়ে আসেন।

১৮ই আগস্ট ছাত্ররা সারাবাংলা ছাত্র ধর্মঘট করে সুরেন ব্যানার্জি রোডের পর্ষদ অফিসের সামনে জমায়েত হয়। সেখানে প্রায় লক্ষ লোকের জমায়েত থেকে 'স্কুল কোড' প্রত্যাহারের দাবি ওঠে। পর্ষদের শিক্ষক প্রতিনিধি-সদস্যরা ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্র-বিরোধী, শিক্ষা-বিরোধী এবং ছাত্র-শিক্ষক স্বার্থবিরোধী 'স্কুল কোডে'র বিরোধিতা করেন। তাঁরা সবাই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি যেসব যুক্তিতে 'স্কুল কোডে'র বিরোধিতা করে, সেসব যুক্তি ও ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করেই তাঁরা তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন। শিক্ষক প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ফুলরেণু গুহ, অনিলা দেবী, কালীনাথ সান্যাল, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সব শেষে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ডঃ মুখার্জি বলেন, "বোর্ড একটি আইনানুগ সংস্থা, আমরা সরকারের ক্রীড়ণক নই"। তারপর বিতর্কিত 'স্কুল কোড' সংশোধনের দায়িত্ব দেওয়া হয় ২২ জনের এক বিশেষ কমিটির উপর। এই বিশেষ কমিটিতে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাতজন পর্যবেক্ষকও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। সেই সভাশেষে ছাত্র প্রতিনিধিদের সাথে পর্ষদের সভাপতি ও সহ-সভাপতি দেখা করে সভার সিদ্ধান্তগুলি বুঝিয়ে বলেন। শিক্ষকের দাবি এবং শিক্ষার দাবি যে অভিন্ন তা এই আলোচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বভাবতই ছাত্র ও শিক্ষকেরা, বিশেষ করে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্যরা খুবই উৎসাহিত হন। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কমিটি তার কাজ করে। ৯ই নভেম্বর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের শিক্ষা কনভেনশনে সত্যপ্রিয় রায় ঘোষণা করেন আপত্তিকর বিষয়গুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

জনগণের জয় হয়েছে। সংশোধিত স্কুল কোড ১৭ই নভেম্বর, ১৯৫২ তারিখে পর্ষদের কার্যকরী সমিতিতে পাস

হয়। শিক্ষকদের বেতন ও ভাতার দাবি সরকারের কাছে আবার পেশ করার জন্য এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পাশাপাশি ছাত্র আন্দোলনও তীব্রতর হয়। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে বিশাল ছাত্র-সমাবেশের নেতৃত্ব দেন ছাত্রনেতা নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুখেন্দু মজুমদার, হীরেন দাশগুপ্ত ও প্রবীর রায়চৌধুরী প্রমুখেরা। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সংগঠন ও আন্দোলনের কর্মসূচির সাথেও এরা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন।

১৯৫৩ সালের ১৭ই জানুয়ারি কার্যকরী সভাপতি সত্যপ্রিয় রায় এক বিবৃতিতে বলেন, 'পর্ষদে দু'বছর পরিশ্রম করে যা তৈরি করা গেল তা এখন সরকারের আলমারির তাকে তুলে রাখা হয়েছে। সমস্ত প্রচেষ্টা নিরর্থক হয়ে যাচ্ছে। কোডের অভাবে বিদ্যালয়ে সাধারণ প্রশাসকের কোনো নিয়ম-কানুন নাই। শিক্ষকদের বেতনক্রমের সুরাহা এখনও পর্যন্ত হলো না। সমস্যাগুলি সম্পর্কে সরকারের নীরবতা যন্ত্রণাদায়ক'।

১৯৫৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি ভারতসভা হলে বিশেষ সম্মেলন আহূত হয়। এখানে প্রস্তাবে বলা হলো, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের উপর অত্যাচার বেড়েই চলেছে। সানুনয় আবেদন-নিবেদন ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সম্মেলন থেকে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, বিধানসভায় ব্যয়-বরাদ্দ নিয়ে আলোচনা করার সময় শিক্ষকদের দাবিসমূহ সরকার ও বিধানসভার সামনে উপস্থিত করতে আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার বেলা ৫টার সময় সমিতির কার্যালয় থেকে এক শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা বিধানসভার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে।

এই শোভাযাত্রায় অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। গ্রাম-শহর থেকে বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকা এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। এই মিছিলে প্রাথমিক শিক্ষকেরা "বুভুক্ষু প্রাথমিক শিক্ষক" ব্যাজ ধারণ করে মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন। মিছিল বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত পোস্টারে সুসজ্জিত ছিল। পথচারী সাধারণ মানুষ শিক্ষকদের এই শোভাযাত্রায় সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানায়।

বিধানসভার পশ্চিমদিকের প্রবেশপথে, মিছিল আটকে দিলে শিক্ষক-শিক্ষিকারা রাজপথের উপর বসে পড়লে আর এক অভিনব দৃশ্যের অবতারণা হয়। বিধানসভার ভিতরে জ্যোতি বসু বলেন, "পুলিস শিক্ষক শোভাযাত্রীদের গতিরুদ্ধ করেছে"। তিনি দাবি করেন সভা মুলতুবি রেখে শিক্ষক প্রতিনিধিদের মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী ও মাননীয় স্পীকারের সাথে দেখা করে তাদের বক্তব্য বলার সুযোগ করে দেওয়া হোক। বিধান রায় দম্ভের সাথে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। গণেশ ঘোষ, হেমন্ত বসু-সহ সমস্ত বিরোধী সদস্যরা একযোগে সরকারের শিক্ষানীতির সমালোচনায় সোচ্চার হন এবং শিক্ষক সমাবেশে যোগ দিয়ে সহমর্মিতা প্রকাশ করেন।

সমিতির পত্রিকা 'শিক্ষা ও সাহিত্য'তে অনিলা দেবী লিখলেন — "দুঃশাসনের দরবারে, আবেদন-নিবেদনের কোন মূল্য থাকে না। জাতির স্রষ্টা যদি তাদের ভূমিকা ভুলে যায়, ভবিষ্যত তাদের ক্ষমা করবে না।"

শিক্ষকেরাই 'শিক্ষা বাঁচাও, শিক্ষাকে বাঁচতে দাও', সমগ্র জাতির সামনে এবং শাসকদের কাছে শিক্ষকের দাবি পেশ করার জন্য ২৫শে ফেব্রুয়ারি অনভ্যস্ত কিন্তু সুসংবদ্ধ এবং দৃঢ় পদক্ষেপে রাজপথ ধরে যাত্রা করেছেন পরিষদ ভবন অভিমুখে" অনিলা দেবীর এই লেখাটি আজও বিশেষ করে স্মরণযোগ্য।

অবশ্য এরূপ আরও অনেক লেখা তিনি লিখেছেন। তাঁর চিন্তার স্বচ্ছতা, ওজস্বী ভাষা ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা তাঁকে সত্যপ্রিয় রায়ের আদর্শ সহযোগী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ২রা থেকে ৯ই আগস্ট শিক্ষক সপ্তাহ, তার পরেও নানা কর্মসূচির মাধ্যমে সমস্ত বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে সংগঠন প্রসারিত হয় এবং জনসংযোগের মাধ্যমে শিক্ষকদের দাবি ও শিক্ষার দাবি আদায়ের সংগ্রাম ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। জনসমর্থন বিপুলভাবে বৃদ্ধি পায়। এই সমস্ত আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন সত্যপ্রিয় রায়। ১৯৭৯ সালে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকায় সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্ব সম্পর্কে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)'র নেতা প্রমোদ দাশগুপ্ত লিখেছেন, 'সংগ্রামই প্রকৃত শিক্ষক' এই মার্কসবাদী সত্যটি কমরেড সত্যপ্রিয় রায় উপলব্ধি করেছিলেন ও পশ্চিমবাংলার প্রায় সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীকে এ বি টি এ'র মধ্যে সংগঠিত করেছিলেন ও দক্ষতার সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কমরেড সত্যপ্রিয় রায় বুঝেছিলেন ১৯৫৪ সালের আন্দোলনের সাফল্যের জন্য অন্যান্য গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী শক্তির সহায়তা প্রয়োজন।

১৯৫৪ সালের স্মরণীয় শিক্ষক আন্দোলন। যে আন্দোলন সারা বিশ্বের শিক্ষাপ্রেমী ও সংগ্রামী মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিল। এই আন্দোলনে নেতৃত্বদানে সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যে দৃঢ়তার সাথে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তা যে কোন আন্দোলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়

হয়ে থাকবে। শিক্ষা ও শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার ভিত্তিতে যে আন্দোলনের সূত্রপাত, তা দাবানলের মতো এই রাজ্যের সাধারণ মানুষের আন্দোলনে পরিণত হলো। এই আন্দোলনের একদিকে যেমন শিক্ষকদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল তেমনি বাড়িয়ে দিল আত্মমর্যাদাবোধ। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষাদরদী মানুষদের দাবি শুধু অবজ্ঞাই করলো না, চালালো অকথ্য নিপীড়ন ও অত্যাচার। কলকাতার রাস্তা রঞ্জিত হলো সংগ্রামী মানুষের রক্তে। অন্যদিকে জ্যোতি বসু সহ সমস্ত বামপন্থী দলের সর্বোচ্চ নেতৃবৃন্দ এবং আপামর গণতান্ত্রিক মানুষ শিক্ষকদের সংগ্রামের সাথে একাত্ম হয়ে গেল। শিক্ষক আন্দোলন ও বামপন্থী আন্দোলন সমার্থক এবং পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠলো, যে ধারা আজও অব্যাহত।

তবুও রাজ্য ও কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার তাদের জনবিরোধী, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক বিরোধী মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটলো না। বর্তমান সময়ে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা তথা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রূপকার হিসাবে কংগ্রেস ও বি জে পি'র মত দলগুলি জনশিক্ষা এবং শিক্ষকদের মর্যাদার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে জলাঞ্জলি দিয়েছে। স্বভাবতই আন্দোলন থামেনি। শিক্ষক ও শিক্ষা আন্দোলনের ভিত আরও প্রসারিত ও শক্ত হয়েছে। বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ আন্দোলন ব্যাপকতর হয়েছে। এক রাজ্য থেকে সর্বভারতীয় স্তরে প্রসারিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে এ বি টি এ এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে। সে এক বিরাট ইতিহাস।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদে 'শিক্ষক কেন্দ্রে' নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। একমাত্র কংগ্রেস এ বি টি এ-র প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করালেও যতদিন পশ্চিমবঙ্গে বিধান পরিষদ ছিল সবকটি নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী এ বি টি এ-র প্রতিনিধির কাছে দারুণভাবে পরাজিত হয়। এই নির্বাচনী আন্দোলনে সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবীর নেতৃত্ব চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নির্বাচনী আন্দোলনে সরাসরি অংশগ্রহণের পদক্ষেপটিকে সে সময়ে অনেকে রাজনীতিকরণ আখ্যা দিলেও সাধারণ শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রতিটি নির্বাচনে সমিতির এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়। ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে এ এক অনন্য ঘটনা। বিধান পরিষদের বিতর্ক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সমিতির প্রতিনিধিরা জনস্বার্থবাহী সমস্ত প্রস্তাবের সপক্ষে দাঁড়িয়ে যেমন লড়াই করছেন তেমনি শিক্ষা ও শিক্ষকদের দাবিগুলির ন্যায্যতা সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণে বিশেষভাবে সফল হন।

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে অছিলা করে ডাঃ বিধান রায়ের সরকার পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদকে দিয়ে প্রশাসক নিযুক্ত করে। এর মূলে ছিল সে সময়ের প্রচলিত আইনে যতটুকু গণতান্ত্রিক উপাদান ছিল তা সরকার সহ্য করতে পারছিল না। তারপর সরকার একটি নতুন আইন পাস করানোর জন্য রাজ্য আইনসভায় একটি বিল পেশ করে। শিক্ষাবিরোধী, শিক্ষকবিরোধী উক্ত অগণতান্ত্রিক বিলের বিরুদ্ধে বিধান পরিষদে সত্যপ্রিয় রায়ের কয়েক দিনব্যাপী উপস্থাপিত বক্তব্য পরিষদীয় বিতর্কে ইতিহাস হয়ে রয়েছে। সমিতির প্রতিনিধি সদস্যদের জন্য নির্ধারিত সময় সবাই শ্রীরায়ের অনুকূলে ছেড়ে দেন। শুধু তাই নয়, পরিষদের বামপন্থী সদস্যদের জন্য যে সময় নির্ধারিত ছিল সত্যপ্রিয় রায়ের ঐতিহাসিক বক্তব্য যাতে তিনি আরও সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করতে পারেন সেজন্য তার অনুকূলে সবাই সময় ছেড়ে দেন। সংসদীয় ইতিহাসে এও এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত। রাজ্য সরকার গণআন্দোলন থেকে কোন শিক্ষাই নেয়নি প্রতিক্রিয়াশীল, অগণতান্ত্রিক এবং শিক্ষা ও শিক্ষকদের মর্যাদা বিরোধী মধ্যশিক্ষা পর্ষদ আইন ভোটের জোরে পাস করিয়ে নেয়। সাথে সাথে শিক্ষকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত করতে থাকে। সমিতি এই চক্রান্ত ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। ১৯৫৬ সালের পক্ষব্যাপী অনশন আন্দোলন শিক্ষক ও জনসাধারণের মধ্যে সাড়া ফেলে দেয়। এসব সত্ত্বেও শিক্ষা ও শিক্ষকদের মূল দাবিগুলি সম্পর্কে তাদের নীতি পরিবর্তন করে না। রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের হারে মহার্ঘভাতা, পেনশন, গ্রাচুইটি সহ অবসরভাতা, শিক্ষা প্রশাসনে এবং শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণে শিক্ষকদের ভূমিকার যথাযোগ্য স্বীকৃতি সহ সর্বজনীন অবৈতনিক শিক্ষা প্রচলন, শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় বৃদ্ধি প্রভৃতি দাবির ভিত্তিতে লাগাতার সংগ্রাম আন্দোলন চলতে থাকে।

এরই মধ্যে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময়ে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদী সোরগোলের মধ্যে কংগ্রেসীরা সমিতির কেন্দ্রীয় অফিসে হামলা চালায় এবং সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবীকে সমিতির নেতৃত্বের পদ থেকে পদত্যাগের

জন্য হুমকী দেয়। সে সময় সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী ও গোলোকপতি রায় প্রমুখ নেতৃবৃন্দের দৃঢ়তা ও সাহসিকতা সমিতির সমস্ত সদস্যদের সাহস জোগায়। রবীন্দ্র সরোবরের জমায়েত ভাঙার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসীদের গুণ্ডা জমায়েতও ব্যর্থ হয়। সমবেত শিক্ষকেরা অসীম সাহসের সাথে জমায়েত সফল করে। সে সময়ে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা বিভক্ত। সংশোধনবাদীরা অন্যদের চীনপন্থী, দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে কংগ্রেসীদের সাহায্য করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা সঙ্গত যে সে সময়ে প্রায় সমস্ত কমিউনিস্ট (সংশোধনবাদীরা বাদে) ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতারা ভারতরক্ষা আইনে প্রতিদিন কারারুদ্ধ হচ্ছিলেন।

শুধু চাকুরীর শর্তাবলীর উন্নতির জন্য নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি লড়াই করেনি। শিক্ষার প্রসার ও উন্নতির জন্য লাগাতার সংগ্রাম করেছে। গণতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সমিতির প্রতিনিধি হিসাবে সত্যপ্রিয় রায় বিভিন্ন কমিশন ও কমিটির কাছে যে সব বক্তব্য পেশ করেন তা দেশে বিদেশে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং এ রাজ্যের বামপন্থী রাজনীতিকেও প্রভাবিত করেছে। মুদলিয়র কমিশনের সুপারিশকে উপেক্ষা করে হুমায়ুন কবীরের নেতৃত্বে একাদশ শ্রেণির মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করে সমিতির বক্তব্য সারা ভারতবর্ষে সমাদৃত হয়। অবশেষে কোঠারি কমিশন ঐ ভুল সংশোধন করে বারো শ্রেণির মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক (১০ + ২) শিক্ষা প্রচলনের জন্য সুপারিশ করেন।

শিক্ষানীতির প্রণয়ন ও প্রয়োগে শিক্ষকদের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বলেন, Teachers all over the world have now been demanding an effective voice shaping the educational policies of their respective countries,...... The selection of a school teacher as president of your conference is a clear pointer to this new outlook. ১৯৬২ সালে উড়িষ্যা মাধ্যমিক শিক্ষকদের রাজ্য সম্মেলনে তিনি সভাপতি হিসাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সত্যপ্রিয় রায় দেশে বিদেশে বিভিন্ন সম্মেলন ও সেমিনারে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে তাঁর যেসব সুচিন্তিত বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে তার অনেকগুলি আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। শিক্ষা আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে তাঁর ব্যক্তিগত অধ্যায়ন ও চিন্তাশীল মনন যেমন সমিতির শক্তিশালী দৃষ্টিভঙ্গী গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছে তেমনি বহুজনের সাথে মত বিনিময় ও সক্রিয় শিক্ষক আন্দোলনে নেতৃত্বদানের মধ্যদিয়ে তিনি নিজেও নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন। এই প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়েই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন "সংগ্রামই শিক্ষক"। তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে তিনি প্রবীণ বয়সে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সদস্যপদের জন্য আবেদন করেন এবং পার্টি সদস্যপদ লাভ করেন।

বিগত শতাব্দীর পাঁচের দশকের শেষ দিকে পশ্চিমবঙ্গে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। সে সময়ের কংগ্রেস সরকার সাধারণ মানুষের জন্য সুষ্ঠু খাদ্য বন্টন ব্যবস্থা তো দূরের কথা এমনকি তাদের বিক্ষোভ সমাবেশকেও সহ্য করতে পারছিল না। ১৯৫৯ সালে কলকাতার মনুমেন্টের পাদদেশে (বর্তমান শহিদ মিনার) বামপন্থীদের ডাকে এক সমাবেশে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু মানুষ গ্রাম গ্রামান্তর থেকে সমবেত হয়েছিলেন। এখানে বিক্ষোভকারীদের ঘিরে ধরে পুলিস ৮০জনকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলে। এরকম নৃশংসতার নজির পাওয়া ভার। এরপরও অবস্থার কোন উন্নতি তো হয়ইনি। ছয়ের দশকে মানুষের জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে ওঠে। কংগ্রেস সরকারের সহানুভূতিহীন নৃশংস আচরণে সমস্ত অংশের মানুষ ক্ষুব্ধ। এই দশকটি অনাহার বুভুক্ষা এবং প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দশক।

১৯৬৬ সালের শুরুতে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা লেখার কাগজ, রাতে পড়ার জন্য কেরোসিনের দাবিতে রাজ্যব্যাপী মিছিল করে। নদীয়ার বিদ্যালয়ের ছাত্র আনন্দ হাইত ও স্বরূপনগরের প্রত্যন্ত গ্রামের নুরুল ইসলামকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করে।

সারা পশ্চিমবঙ্গ গর্জে ওঠে। শিক্ষক সমাজ খুবই উত্তেজিত ও ক্ষুব্ধ হন।

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকারের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির ডাকে কলকাতার এসপ্লানেড ইস্টে (বর্তমান সিধু-কানহু-ডহর) হাজার হাজার শিক্ষক অবস্থান করেন এবং সরকারের পক্ষ থেকে কোন ইতিবাচক সাড়া না পেয়ে প্রতিদিন এক একটি দলে আইন অমান্য করে কারাবরণ করেন। প্রতিদিনই জমায়েত ও অবস্থানে শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। একমাস কর্মবিরতি, কারাবরণ ও অবস্থান কর্মসূচি পালনের পরেও সরকার শুধু নীরবই ছিল না, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কুৎসা ও মিথ্যা প্রচার

করে প্ররোচনা দিতে থাকে। ক্ষুব্ধ শিক্ষক সমাজের মনোভাবকে মর্যাদা দিয়ে সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবীর নেতৃত্বে সমিতির কার্যকরী সমিতি সিদ্ধান্ত নেয় যে, "শিক্ষা বিরোধী ও শিক্ষক বিরোধী সরকারকে আগামী নির্বাচনে পরাস্ত করো।" সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবী সহ সমিতির প্রায় সমস্ত নেতৃত্ব সে সময়ে কারান্তরালে ছিলেন। গণআন্দোলনের ইতিহাসে এটি একটি অভূতপূর্ব সিদ্ধান্ত। কেউ কেউ মনে করেছিল গণসংগঠনের পক্ষ থেকে এ ধরনের রাজনৈতিক স্লোগান দেওয়া হয়ত ঠিক হলো না। কিন্তু সাধারণ শিক্ষকদের বোধ ও মানসিকতাকে সঠিকভাবে অনুধাবন করে নেতৃত্ব যে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা আজ প্রমাণিত। পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এক নতুন সত্যপ্রিয় রায়কে পেলেন। সমাজে শিক্ষক আন্দোলনের স্বীকৃতি আরও ব্যাপক হলো।

১৯৬৬ সালে প্রকাশিত হয় কোঠারী কমিশনের প্রতিবেদন। কমিশনের স্কুল শিক্ষার উপর একটি টাস্কফোর্স গঠিত হয়। এই টাস্কফোর্সের কয়েকটি সাবগ্রুপ হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা বিষয়ক সাবগ্রুপের সদস্য মনোনীত হন সত্যপ্রিয় রায়। তখন তিনি সর্বভারতীয় মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি। শিক্ষা বিশেষ করে বিদ্যালয় শিক্ষা সম্পর্কে শ্রীরায়ের অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং কমিশনের মত গঠনে তিনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এই প্রতিবেদনের উপর বিস্তৃত আলোচনা করে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে বক্তব্য পেশ করেন এবং ঐ প্রতিবেদনের ইতিবাচক দিকগুলি সম্পর্কে জনমত গঠনে সচেষ্ট হয়। যা পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট সরকারের শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে প্রভূত সাহায্য করে।

"শিক্ষা বিরোধী ও শিক্ষক বিরোধী সরকারকে অপসারিত করো" সমিতির এই আহ্বান শিক্ষক-সহ অন্যান্য অংশের মেহনতি মানুষ এ রাজ্যে বাস্তবায়িত করে। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস পরাজিত হয় এবং অজয় মুখোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব নেন জ্যোতি বসু। এই সরকারের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ ১৭জন এম এল এ সহ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছে এই অজুহাতে রাজ্যপাল ধরমবীরা প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনে মত দেন। প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার নয় মাসের মধ্যে ভেঙে যায়। অল্প সময় হলেও এই সময়ের মধ্যে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার কতকগুলো অত্যন্ত জরুরী জনমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করে পাশাপাশি চলতে থাকে শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক ও কর্মচারীদের সংগ্রাম ও সমাবেশ। এই সময়ে সমস্ত কালাকানুন রদ করা হয়। কর্মচারীদের অন্যায়ভাবে বরখাস্তের আদেশ তুলে নেওয়া হয়। জমি বন্টনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। এইসব কারণে যুক্তফ্রন্ট সরকার খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। ১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থাৎ মাত্র তিনমাসের মধ্যে প্রফুল্ল ঘোষ মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করলে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারের সাথে চক্রান্ত করে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণা করেন।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আবার নির্বাচন হয়। বামপন্থী দলগুলির শক্তি বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। অজয় মুখার্জীর জেদে তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। জ্যোতি বসু সর্ববৃহৎ সংসদীয় দলের নেতা হওয়া সত্ত্বেও উপমুখ্যমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। সত্যপ্রিয় রায় এই মন্ত্রিসভায় শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সরকারও তের মাসের বেশী কাজ করতে পারেনি। কারণ মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী কংগ্রেসের সঙ্গে যোগসাজশ করে ১৬ই মার্চ, ১৯৭০-এ পদত্যাগ করে মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন। রাজ্যপাল জ্যোতি বসুকে মন্ত্রিসভা গঠনে সুযোগ না দিয়ে ২৩/৩ তারিখে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করেন। রাজ্যে কংগ্রেসীরা তাণ্ডব চালাতে থাকে। নকশাল নামধারী অতিবিপ্লবীরা সি পি আই (এম)-এর কর্মীদের হত্যা করতে থাকে। ১৭.৩.৭০ থেকে ৩১.৩.৭০-এর মধ্যে ২৩৮জন সি পি আই (এম) নেতা ও কর্মী নিহত হন। ১৯৭১ সালের নির্বাচনের মুখে শ্রদ্ধেয় জননেতা হেমন্ত বসুকে হত্যা করে পরিকল্পিতভাবে। পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করেন সি পি আই (এম) হেমন্ত বসুকে হত্যা করেছে। এভাবে ক্রমান্বয়ে সন্ত্রাস বাড়তে থাকে। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার কর্মচারীদের বেতনভাতার বিষয়টি বিবেচনার জন্য পে-কমিটি গঠন করেন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে সর্বজনীন শিক্ষা চালু করার জন্য পরিকল্পনা করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো হয়। প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়। বহু একর কৃষিজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করা হয়। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে পুলিসী হস্তক্ষেপ বন্ধ হয়।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়ার পর সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নেতা সন্তোষ ভট্টাচার্য, দুর্গাপুরের প্রধান শিক্ষক বিমল দাশগুপ্ত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপাল সেন নিহত হন। কংগ্রেস রিগিং-এর মাধ্যমে ১৯৭২ সালে বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সি পি আই (এম) এই নির্বাচনে মাত্র ১৭টি আসনে জয়যুক্ত হয়। তাঁরা বিধানসভা বয়কট করেন। কংগ্রেস বিরোধীদল-বিহীন বিধানসভা নিয়ে সরকার চালাতে থাকে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরমে ওঠে। এই সময়ে সত্যপ্রিয় রায়, অনিলা দেবী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অসীম সাহসিকতার সাথে সমিতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখেন। শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য দেখা দেয়। পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে যায়। অসাধু ব্যক্তিরা পরীক্ষা ব্যবস্থা দখল করে নেয়। 'মস্তান রাজ', 'গণটোকাটুকি', 'তোলাবাজি' প্রভৃতি শব্দগুলি এই সময় চালু হয়। এই অব্যবস্থার মধ্যেও সংগ্রামী মানুষেরা নিজেদের মধ্যে ও সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক জীবন চালিয়ে গেছে। সে ছিল আর একরকমের সংগ্রাম। এই অবস্থার মধ্যেই বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার জন্য শিক্ষক সমাজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

১৯৭৫ সালে এলো 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা"। সারা দেশব্যাপী জরুরী অবস্থা ঘোষণা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তথা বাক-স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হলো। কমিউনিস্ট পার্টি সহ সমস্ত বিরোধী দলগুলির কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা হলো। শত শত রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হলো। সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন নিষিদ্ধ হলো। সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের নেতাদের রাজ্যপালের বিশেষ আদেশবলে বরখাস্ত করা হয়। এই অবস্থাতেও মানুষ আত্মসমর্পণ করেনি। মিছিল করেছে ও সভা করেছে। এই ধরনের সর্বব্যাপক নিপীড়ন ও অত্যাচার চালিয়েও মানুষের প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করা সম্ভব হয়নি। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে সারা দেশ গণপ্রতিবাদে উদ্বেল হয়ে উঠে।

১৯৭৭-এর নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নীরবে কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নেতৃত্বে গঠিত বামপন্থী মোর্চাকে জয়যুক্ত করে। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে এই রাজ্যে সরকার গঠিত হয় এবং পর পর ছয়বার বিপুল সংখ্যায় গরিষ্ঠতা নিয়ে জয়যুক্ত হয়। পরবর্তী সময়ে সি পি আই বামফ্রন্টে যোগ দেয়। বামফ্রন্ট আরও শক্তিশালী হয়।

বামফ্রন্ট সরকার ধাপে ধাপে জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে অগ্রসর হয়। সবচাইতে উল্লেখ্যযোগ্য হলো নাগরিক জীবনকে সন্ত্রাসমুক্ত করা। শুধু ফিরিয়ে দিয়েছে তাই নয়, এই অধিকারকে আরও প্রসারিত করেছে। এক্ষেত্রে সত্যপ্রিয় রায়ের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সংগ্রামী ঐতিহ্যের বিরাট অবদান রয়েছে।

সাতের দশকের কালো দিনগুলির কংগ্রেসী সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে স্বজন হারানোর ব্যথা বুকে নিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে, তাঁদের জীবন-জীবিকার লড়াইয়ের সাথে নিজেদের যুক্ত রেখেছেন। কংগ্রেস ও তাদের সাকরেদদের অন্যায় ও অত্যাচারে পর্যুদস্ত সাধারণ মানুষ ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে বামপন্থী প্রার্থীদের জয়যুক্ত করে। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। সরকার গঠনের প্রথমদিন থেকেই নির্যাতনমূলক সমস্ত আইনকে বাতিল করে দেয় বামফ্রন্ট সরকার। সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের যে সমস্ত নেতাকে রাজ্যপালের বিশেষ আদেশে বরখাস্ত করা হয়েছিল তাঁদের পুনর্নিয়োগ করা হয়। শিক্ষক ও গণআন্দোলনের যে সমস্ত কর্মী ও নেতা তাঁদের কাজের জায়গা থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন তাঁদের সকলকে নিজ নিজ কাজের জায়গায় যোগ দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। অথচ অন্তর্বর্তীকালে যারা কাজে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের বিতাড়িত করা হয় না। কৃষকদের কাছ থেকে যে সমস্ত জমি মস্তানরা জোর করে কেড়ে নিয়েছিল তাঁরা তা আবার নিজেদের দখলে আনতে শুরু করেন। কংগ্রেসী মস্তান ও তোলাবাজদের অত্যাচারে যে সব ছোট ব্যবসায়ীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা সেই অত্যাচার থেকে রেহাই পান। রাজ্যের সমস্ত মানুষ তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পান।

শিক্ষাক্ষেত্রে যে চরম অরাজকতা ও দুর্নীতি পরীক্ষা ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিয়েছিল এবং স্কুল-কলেজে পঠন-পাঠনের কাজ চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, বামফ্রন্ট সরকারের দৃঢ় মনোভাব ও সহযোগিতার হাত প্রসারিত হওয়ার ফলে শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। সাথে সাথে সমস্ত স্তরে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পদ সৃষ্টি করে শিক্ষাব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টাকে মানুষ স্বাগত জানায়।

শিক্ষকদের বেতনভাতা ও চাকুরীর শর্তাবলী বিবেচনার

জন্য বিষয়টি নবগঠিত রাজ্য পে-কমিশনের বিবেচ্য বিষয় বলে স্বীকৃত হওয়ায় শিক্ষকদের পেশাগত জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে।

কৃষি ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য বামফ্রন্ট সরকারের সনিষ্ঠ প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। অতীতের কংগ্রেস সরকারের সাথে তুলনা করে মানুষ বুঝতে পারে দুইয়ের মধ্যে তফাৎ কোথায়। মানুষ বামফ্রন্টের সাথে আরও ঘনিষ্ঠ হয় — বামফ্রন্টের অনুগামী দিন দিন বাড়তে থাকে।

মাসুল সমীকরণ নীতি এবং লাইসেন্স প্রথা পশ্চিমবঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশে বিশেষভাবে বাধার কারণ হয়ে উঠেছিল। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার পশ্চিমবঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠায় শিল্পপতিদের নিরুৎসাহিত করতো। সংবাদ মাধ্যমগুলি লাগাতার পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে বিরূপ সংবাদ পরিবেশন করে একটা প্রতিকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। হলদিয়া প্রকল্পের অনুমোদন দেয়নি কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার, সল্টলেকে ইলেকট্রনিক্স প্রকল্প স্থাপনের বিরোধিতা করেছে ইন্দিরা গান্ধী। বক্রেশ্বরের বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ মানুষের লড়াই সকলেরই জানা আছে।

শিক্ষা প্রশাসনের গণতন্ত্রীকরণ এবং শিক্ষানীতি প্রণয়নে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার সংশ্লিষ্ট সকলের প্রশংসা পেয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার মান উন্নত হয়েছে। বিনিয়োগকারীরা পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপন করতে এগিয়ে আসছেন, বিশেষ করে এখানকার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের কর্মদক্ষতার জন্য।

পর পর ছয়বার পশ্চিমবাংলার মানুষ বামফ্রন্টকে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় আসীন করেছেন। সপ্তমবারও এবারের নির্বাচনের মাধ্যমে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত হয়ে বামফ্রন্ট ফিরে আসবে এটা নিশ্চিত সত্য হলেও মনে রাখতে হবে বিভিন্নরকমের চক্রান্ত ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়াই করে এতদিন বামফ্রন্ট প্রগতিশীল কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে চলেছে। গ্রাম-শহরে পঞ্চায়েত ও পৌরব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ প্রশাসনের অনেক কাছাকাছি এসেছেন। তাঁরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছেন।

এই অবস্থা বজায় রাখতে এবং উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে অনেক প্রাণ দিতে হয়েছে। নানা দিক থেকে এ রাজ্যে বিগত প্রায় ত্রিশ বছর ধরে আক্রমণ চলেছে বামপন্থী নেতা ও কর্মীদের উপরে। আজও চলেছে মাওবাদী ও ঝাড়খণ্ডীদের আক্রমণ, তৃণমূলীদের অত্যাচার ও আক্রমণের কথা সকলেরই জানা আছে। উত্তরবঙ্গে কামতাপুরী নাম-ধারীদের সশস্ত্র আক্রমণে শিক্ষক-সহ অনেক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী ও সাধারণ মানুষের প্রাণ দিতে হয়েছে। দুঃখের কথা, অধিকাংশ সংবাদমাধ্যম এদের সমর্থন করেছে। উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে এদের আপ্রাণ চেষ্টা। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারে সত্য কী? আগামীদিনের লড়াই আরও কঠিন হয়ে উঠছে দিন দিন, যতই নির্বাচনের দিন এগোবে নানা ধরনের চক্রান্ত হবে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ঐতিহ্য এই শিক্ষাই দেয় যে লড়াই যতই কঠিন হোক এ লড়াইয়ে জিততে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা — একটি পর্যালোচনা

রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়

সূচনা ঃ বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের মানুষের নজর কেড়েছে। রাজ্য সরকারের সমর্থক এবং বিরোধী, স্তাবক ও নিন্দুক, বিত্তবান বা দরিদ্র, উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথবা সীমিত আশাযুক্ত — সব মানুষই স্কুলের লেখাপড়ার বিষয়ে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন। সুস্থ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে তাঁদের চেতনার মান অনেক উন্নত হয়েছে। মানুষের প্রত্যাশা ও চাহিদা বেড়েছে। তাঁরা শিক্ষার বিষয়টি জানার ও বোঝার চেষ্টা করছেন, নিজেদের মত করে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করছেন, বিতর্ক তুলছেন, সমালোচনা করছেন। কেউই নিস্পৃহ থাকছেন না। শিক্ষা নিয়ে মানুষের চিন্তায় এই আলোড়ন একটি অত্যন্ত সুস্থ ইতিবাচক লক্ষণ। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পার্থক্য থাকে। একটি অভিন্ন ব্যবস্থা তাদের সবাইকে সমানভাবে সন্তুষ্ট করতে পারে না। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে এই ব্যবধান কিছু মানুষের মনে ব্যবস্থাটি সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব জাগিয়ে তুলেছে। সেই সঙ্গে কোনো কোনো প্রভাবশালী মহলের অপপ্রচার-বিভ্রান্তির বাতাবরণ তৈরী করছে। শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের আগ্রহকে সঠিক পথে চালিত করা এবং এই ব্যবস্থার কোনো দুর্বলতা থাকলে তাকে দূর করে ব্যবস্থাটিকে উন্নততর করার জন্য জনমত সংগঠিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এজন্য প্রয়োজন কিছু তথ্যভিত্তিক বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ। এই নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই লক্ষ্যে একটি বিনম্র প্রয়াস করা হল।

প্রেক্ষাপট ঃ বর্তমান পর্যালোচনাটি শিক্ষাসংক্রান্ত দু'টি মূল বিষয়ের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপন করা হচ্ছে — (ক) মৌলিক শিক্ষার লক্ষ্য ও চরিত্র এবং (খ) এ প্রসঙ্গে সর্বভারতীয় চিত্র।

(ক) বিদ্যালয় শিক্ষার লক্ষ্য ও চরিত্র — দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে মৌলিক শিক্ষা বলে গণ্য করা হয়। বহু আলোচিত কোঠারী কমিশনের প্রতিবেদনে (১৯৬৬) এই শিক্ষাকে বলা হয়েছে ব্যাপকভিত্তিক সাধারণ শিক্ষা (broad-leaved general education) এবং জনশিক্ষার প্রান্তিক পর্যায় (terminal stage of mass education)। তবে সরকারী নীতিসংক্রান্ত ঘোষণায় ও দলিলে 'প্রারম্ভিক' অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার ওপরেই বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। ভারতের সংবিধানে সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যে যে নির্দেশ দেওয়া আছে সেখানেও ১৪ বছর বয়সের উল্লেখ প্রারম্ভিক (elementary) শিক্ষাকেই বোঝায়।

এই স্তরের শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীর অনেক প্রণিধানযোগ্য অভিমত আমাদের জানা আছে। এগুলির প্রকাশভঙ্গিতে বৈচিত্র্য আছে। এক একজন চিন্তাবিদ শিক্ষার বিশেষ বিশেষ দিকে বেশী দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে বিভিন্নতা আছে, কিন্তু বিরোধ নেই। সেইসব অভিমত নিয়ে আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। বিভিন্ন কমিশন-কমিটির সুপারিশ এবং তার ভিত্তিতে জাতীয় স্তরে ঘোষিত লক্ষ্যগুলিকেই আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। বিদ্যালয়স্তরে শিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে এইসব সুপারিশ ও সরকারী সিদ্ধান্তের মূল সুর একটিই — শিক্ষার লক্ষ্য হল পরিপূর্ণ মানুষ তৈরী করা। 'পরিপূর্ণ মানুষ' এই কথাটিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য বলা যায় একটি সুস্থ সমাজের উপযুক্ত নাগরিক। শুধু সুস্থ সমাজে বাস করার উপযুক্ত নয়, আমাদের কাঙ্ক্ষিত সমাজ গঠন করার ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ। এই সমাজের চরিত্রও অবশ্যই নিরূপিত হবে দেশের পবিত্র সংবিধানের মূলনীতিগুলিকে অনুসরণ করে। এগুলি হল গণতন্ত্র (democracy), ধর্মনিরপেক্ষতা (secularism), সমাজতন্ত্র (socialism) এবং সাম্য (egalitarianism)। শিক্ষাব্যবস্থার চরিত্রে এই মূল ধারণাগুলি বিধৃত থাকবে। সেই সঙ্গে শিক্ষাকে হতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক। সুতরাং শিক্ষাব্যবস্থার কাছে সমাজের প্রত্যাশা এই যে আগামীদিনের নাগরিকদের এমনভাবে গড়ে তোলা হোক যাতে তারা এই মূল্যবোধসমূহে সমৃদ্ধ সমাজমনস্ক মানুষ হয়ে ওঠে। শিক্ষাক্রমের ভেতর দিয়ে শিক্ষার্থীদের সমাজ ও জীবন সম্পর্কে সুস্থ ধারণা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিতে উজ্জীবিত করতে হবে এবং নিজেদের আচরণে সেগুলি সফলভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, বোধ ও প্রয়োগদক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করতে হবে।

শিক্ষার্থীদের এইভাবে মানুষ করতে চাওয়ার দূর লক্ষ্য হচ্ছে সুস্থ সমাজগঠন, সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন। নাগরিকদের সুস্থ জীবনযাপনে এবং সমাজের প্রকৃত উন্নয়নসাধনে শিক্ষার এই মৌলিক গুরুত্ব বিবেচনা করেই ১৯৪৮ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার ঘোষণায় (Universal Declaration of Human Rights) শিক্ষাকে সব মানুষের অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই বিশ্ব ঘোষণাপত্রের ২৬নং ধারার প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "Everyone

has the right to eudcation." শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত জাতীয় পরিষদ (এন সি ই আর টি) বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রম নিয়ে বিভিন্ন সময়ে তাদের সুপারিশগুলিতে এই লক্ষ্যের কথা একাধিকবার বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। বিগত এন ডি এ সরকারের আমলে ২০০০ সালে এন সি ই আর টি এবিষয়ে যে সুপারিশ করেছিল তার ভেতর অনেক প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণার পরিচয় ছিল, দেশজুড়ে সেই প্রস্তাবগুলির তীব্র বিরোধিতা হয়েছিল। কিন্তু সেই দলিলেও বিদ্যালয় শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য হিসেবে যা বলা হয়েছিল তার মধ্যে শোষণবিহীন সমাজব্যবস্থা গঠন করার কথাও ছিল। বইটির ৩৯ পৃষ্ঠায় ২·৫ অনুচ্ছেদে আছে "It must also lead to a non-violent and non-exploitative social system" (National Curriculum Framework for School Education, 2000, NCERT)। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোগত বাসনা যাই হোক না কেন সর্বজনস্বীকৃত এই সত্যগুলি মাঝে মাঝে উচ্চারণ করতেই হয়।

দেশের শিক্ষাচিত্র ঃ একথা অনস্বীকার্য যে নিছক সংখ্যার বিচারে ভারতে বিদ্যালয় শিক্ষার বিরাট বিস্তার ঘটেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA)[১] সাম্প্রতিক একটি প্রকাশনায় বলেছে, ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বের বৃহত্তমগুলির একটি। (Indian education system is one of the largest education systems in the World) তারপরেই যোগ করেছে 'it caters to the needs of more than 1,028 million people.'[১] এই উক্তির প্রকৃত অর্থ দাঁড়ায় যে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা দেশের সব মানুষের প্রয়োজন মেটাচ্ছে। বাস্তব অবস্থা কিন্তু তা নয়। কেন্দ্রীয় সরকারেরই আর একটি সংস্থা NCERT[২] বলছে যে আমাদের দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৩৭জনের অক্ষর পরিচয় হয়নি। যাদের স্কুলে যাবার বয়স হয়েছে সেইসব ছেলেমেয়েদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষার বাইরে রয়েছে। তাই ওপরের উক্তিটিতে একটি চতুর আত্মম্ভরিতার প্রকাশ ঘটেছে। সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্য থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। কোটি কোটি দেশবাসীকে অশিক্ষার অন্ধকারে ফেলে রেখে আমরা বৃহত্তম শিক্ষাব্যবস্থার বড়াই করছি।

গণপরিসংখ্যানের হিসাব অনুসারে বর্তমানে ভারতবাসীর ৫৪ শতাংশের বয়স ২৫ বছরের নিচে। এই বিশাল মানবসম্পদকে বিকশিত করে তোলার কী আয়োজন আমাদের রাষ্ট্র করবে তার ওপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। মৌলিক শিক্ষাকে উপেক্ষা করার এই ধারা যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে তার পরিণাম নিয়ে গভীর উদ্বেগের সঙ্গতকারণ আছে। সেক্ষেত্রে সমাজে সর্ববিধ বৈষম্য বাড়বে। অর্থনৈতিক উন্নতি হয়ত হবে, কিন্তু সমাজের বিকাশ ঘটবে না। আমরা আকাশছোঁয়া সেনসেক্সের সঙ্গে পাতালস্পর্শী দারিদ্র্যের সহাবস্থানের সাক্ষী হব।

কেন এমন হল ঃ আমাদের জাতীয় পরিকল্পনায় শিক্ষাব্যবস্থাকে যে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি তা বাজেট বরাদ্দে ধারাবাহিক কার্পণ্য থেকেই পরিষ্কার। স্বাধীনতার আগে থেকেই এই মর্মে জাতীয় ঐকমত্য ছিল যে কেন্দ্রীয় বাজেটের অন্তত দশ শতাংশ বা মোট জাতীয় আয়ের ছয় শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে। দেশ স্বাধীন হবার পরে বিভিন্ন কমিশন/কমিটিগুলি এবং বিশেষজ্ঞরা ঠিক এই পরামর্শই দিয়ে এসেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকেও কখনোই প্রতিশ্রুতির অভাব ঘটেনি। এন সি ই আর টি তাদের ২০০০ সালের বিদ্যালয় শিক্ষার পাঠক্রম সংক্রান্ত দলিলে একই ইঙ্গিত দিয়েছে।[৩] তবু দেশবাসীর তিক্ত অভিজ্ঞতা এই যে সেই প্রতিশ্রুতি কোনোদিনই পূরণ হল না। দেশ গড়ার জন্য মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্ষেত্রে জাতির প্রতি এই বিশ্বাসঘাতকতার দীর্ঘ কাহিনি এখানে বিবৃত করা হচ্ছে না। কিন্তু এর পরিণাম তো একের পর এক প্রজন্মকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। শিক্ষাখাতে যথেষ্ট সম্পদ বরাদ্দ করার দাবী যখনই জোরদার হয়েছে তখনই ভারত সরকার বহুশ্রুত প্রতিশ্রুতি পুনরুচ্চারণ করেছে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অঙ্গীকার পালন করেনি, অর্থাভাবের গতানুগতিক অজুহাতে এড়িয়ে গেছে। অথচ শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অমর্ত্য সেন সহ একাধিক বিশেষজ্ঞ তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে সার্বজনীন শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহ করা রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব ছিল না.; এখনও তা সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে যেটার অভাব তা হল শাসকদের রাজনৈতিক সদিচ্ছা। একথা শাসকদলের বিরোধী কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বক্তব্য নয়। সংসদ সহ অনেক দায়িত্বশীল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চ থেকে এই সমালোচনা করা হয়েছে এবং তা জোরের সঙ্গে কেউ খণ্ডন করতে পারেনি।

এই ব্যাধি অবশ্য ভারতেরই বৈশিষ্ট্য নয়। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও মোটামুটি একই চিত্র দেখা যায়। সভ্যতার শত্রু এই অজ্ঞতার বোঝা তাই সারা বিশ্বে উদ্বেগ সঞ্চারিত করেছে। একের পর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে নানাভাবে নানা ভাষায় সকলের জন্য শিক্ষা সুনিশ্চিত করার সংকল্প ধ্বনিত হয়েছে। আমাদের রাষ্ট্রও এইসব ঘোষণার অংশীদার। বিশ্বমঞ্চে

দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি পালন করার জন্য চাপ বাড়ছে। অন্য দিকে দেশের মানুষও শিক্ষার মূল্য সম্পর্কে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে ক্রমশ অবহিত, সচেতন ও সোচ্চার হয়ে উঠছে। দেশবাসীর এই ন্যায্য দাবীকে উপেক্ষা করে চলা রাষ্ট্রের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। তাই সার্বজনীন শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবার প্রশ্নটি নতুন করে ভাবতেই হচ্ছে।

সংবিধান সংশোধন ঃ ১৯৫০ সালে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের অধ্যায়ে স্থান দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতির অংশে বলা হয়েছিল 'আগামী দশ বছরের মধ্যে', অর্থাৎ ১৯৬০ সালের মধ্যে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব বালক-বালিকার জন্য অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করার লক্ষ্যে রাষ্ট্র সবরকম চেষ্টা করবে। কিন্তু তারপরে অনেকগুলি দশক পার হয়ে গেলেও সেই মহান ব্রত পালন করা যায়নি। ঘটনার নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে এসে গত ২০০১ সালে সংবিধানের ৮৬তম সংশোধনের মাধ্যমে প্রারম্ভিক শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের তালিকায় নিয়ে আসা হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। তবু দুঃখজনক অপূর্ণতা রয়ে গেছে। নির্দেশাত্মক নীতির বিধানে বয়সের কোনো নিম্নসীমার উল্লেখ ছিল না। এখন মৌলিক অধিকারের আওতায় এনে[৬] বছরের কম বয়সীদের বাদ দেওয়া হল। বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষাতত্ত্বের বিচারে এই ব্যবস্থা কাম্য নয়। এমনকি এন সি ই আর টি-ও এতে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছে, '....it is unfortunate that 0 to 6 age group has been excluded from the purview of Article 21'.[৪]

সংবিধানে শিক্ষার অধিকার স্বীকৃতি পেলেও একে বাস্তব রূপ দেবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন এখনও সংসদে পাশ করা হয়নি। আজ না হয় কাল, আইন প্রণীত হবে। কিন্তু চরম দারিদ্র্যপীড়িত পরিবারগুলি কি এর সুযোগ নিতে পারবে? পুঁথিপত্রের বিধান কি তাদের সন্তানদের কাছে সত্যিই কাঙ্ক্ষিত ফল আনতে পারবে? এই প্রসঙ্গে এন সি ই আর টি-র প্রাগুক্ত দলিলটিতে একটি অত্যন্ত মূল্যবান কথা বলা হয়েছে। কথাটি এই — "If 'free' education is understood as removal of constraints to education, then we must realise the importance of other sectors of the states social policy for supporting and facilitating the achievement of Universal Elementary Education."[৫] বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে এই উক্তির গভীর তাৎপর্য আছে। আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের যে নীতিগুলির ফলে দারিদ্র্য বাড়ছে, বৈষম্য তীব্রতর হচ্ছে সেগুলিকে বহাল রেখে সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন অলীক কল্পনা।

মূল দ্বন্দ্ব ঃ অন্য পর্যায়ের শিক্ষার মতই মৌলিক বা বিদ্যালয় শিক্ষার দু'টি প্রধান দিক হল সংখ্যাগত সম্প্রসারণ এবং গুণগত মানোন্নয়ন। নিঃসর্ত বিচারে শিক্ষার আনুভূমিক বিস্তার উৎকর্ষের পরিপূরক হবে বলে ধরে নেওয়া যায়। জ্ঞানের আলো যদি শিক্ষাবঞ্চিতদের ঘরে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যায় তবে অনেক নতুন মেধা, নতুন প্রতিভা উন্মেষের পথ খুঁজে পাবে, সমাজ পাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পতাকাকে গৌরবের শিখরে তুলে ধরার লক্ষ লক্ষ বাতিস্তম্ভ। আগামী প্রজন্মের শিক্ষিত বাবা-মায়েরা উন্নত শিক্ষার ধারাকে চক্রাকারে সমৃদ্ধ করে যাবেন।

কিন্তু আমাদের এই উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন ভেঙে যায় যখন শিক্ষাকে পরিকল্পনায় অবহেলা করা হয়, বাজেট বরাদ্দ কার্পণ্য করা হয়। সংখ্যাগত সম্প্রসারণ ও গুণগত উন্নয়ন — দু'টিই ব্যয়সাপেক্ষ কাজ। যৎকিঞ্চিৎ সম্পদ দিয়ে এর কোনোটাই সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। আমরা জানি, শিক্ষার প্রতি এই উপেক্ষার মূল উৎস শ্রেণিস্বার্থ বজায় রাখার তাগিদ। এটা কোনো বিরোধীপক্ষের রাজনৈতিক বক্তব্য নয়। ১৯৭৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী (শিক্ষা ও সমাজকল্যাণ) শ্রী ডি পি যাদব বলেছিলেন, "The prevailing education system was fashioned primarily to suit the need of the elite, and the socially and economically underprivileged do not get sufficient justice from its working."[৬] ২ বছর পরে এর চেয়েও স্পষ্ট ও জোরালো ভাষা শোনা গেল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কণ্ঠে। ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত একটি দলিলে তারা বললেন, "Ours is a dual society in which economic and social power is mainly concentrated in the hands of a small class at the top. This reflects itself in a dual educational system in which the access to the best educational institutions at all stages is mostly limited to the same class. It is this dual educational system which strengthens and perpetuates our dual society."[৭]

এই অকপট স্বীকারোক্তি করা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় তিন দশক আগে। তিরিশ বছরেও শিক্ষার অভিজাতমুখিনতা কাটানো সম্ভব হয়নি। তাই ২০০৫ সালেও এন সি ই আর টি-কে অশিক্ষার অন্ধকার নিয়ে বিলাপ করতে হয়, উদ্বেগ

প্রকাশ করতে হয় এই দেখে যে শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র যথেষ্ট ব্যয় করছে না, সরকার জোর দিতে চাইছে 'বিকল্প' বিদ্যালয়ের দিকে যা থেকে বোঝা যায় যে শিক্ষার দায়দায়িত্ব পরিবার এবং সমাজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার জন্য বাজারী শক্তির চাপ সম্পর্কে সজাগ থাকার প্রয়োজনীয়তার দিকেও এই কেন্দ্রীয় সংস্থা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদের ভাষায়, "On the one hand we are witnessing the increasing commercialisation of education, and on the other, inadequate public funding for education and the official thrust towards 'alternative' schools indicate a shift of responsibility for education from the state to families and communities. We need to be vigilant about the pressures to commodity schools and the application of market-related concepts to schools and school quality."[৮] মানুষের কল্যাণ এবং তার ভেতর দিয়ে দেশের উন্নতির জন্য সমাজের যা করণীয় সেগুলির করার জন্যই তো রাষ্ট্র তার বিভিন্ন দপ্তর, তার রাজস্ব সংগ্রহ ও কর্মপরিকল্পনা, সামাজিক দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই পালন করতে হবে। 'সমাজ' নামক কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্বের ওপর সে ভার অর্পণের প্রস্তাব রাষ্ট্রের চরম ব্যর্থতাকেই সূচিত করে। ব্যয় সংক্ষেপ করার জন্য প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে মুক্ত বিদ্যালয়কে উৎসাহিত করার রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকেও এন সি ই আর টি ভালো চোখে দেখেনি। এন সি ই আর টি-র দলিলটিতে বিদ্যালয় শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিরাট কাজ বাকি রয়ে গেছে বলে আক্ষেপ করা হয়েছে। এই কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য পথের সন্ধানও দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু যখনই কর্মসূচি সম্পর্কে বিশদ সুপারিশ করা হয়েছে, আভিজাতমুখী দৃষ্টিভঙ্গী গোপন করা যায়নি।

এই প্রসঙ্গটির সূচনায় বলা হয়েছিল, বিদ্যালয় শিক্ষার সংখ্যাগত প্রসার গুণগত মানের পরিপূরক হবার কথা। তবে সম্পদের অভাব দু'টি এখন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। বিস্তার ঘটালে উন্নয়নের জন্য টাকা থাকে না, উন্নয়নের খাতে ব্যয় বাড়ালে বিস্তার থমকে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের চিত্র ঃ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রের মতই শিক্ষাব্যবস্থার যে মূল কাঠামোটি ভারত সরকারের অনুসৃত নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। কোনো অঙ্গরাজ্যের পক্ষে সেই সীমার বাইরে গিয়ে বিশেষ কিছু করা সম্ভব হয় না। তাই আমাদের রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার যথাযথ মূল্যায়নের জন্য জাতীয় প্রেক্ষাপটটি সম্পর্কে ওপরে লেখা নীতিহ্রস্ব উপস্থাপনাটি অপরিহার্য ছিল।

এ রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের সূচনা ঃ কোনো বিষয়ে সামগ্রিক হতাশা ও দিশাহীনতার অবস্থাকে বোঝাতে হলে সাধারণত অমাবস্যার অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা হয়। ১৯৭৭ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আগে এ রাজ্যের সবগুলি ক্ষেত্র, বিশেষ করে শিক্ষা, যে সর্বব্যাপী নৈরাজ্য ও বিশৃংখলা, সন্ত্রাস ও তঞ্চকতার গভীরে নিমজ্জিত হয়েছিল তার জন্য অমারাত্রির উপমাও বোধ করি যথেষ্ট নয়। সে অভিজ্ঞতা যাঁদের হয়েছে তাঁদের স্মৃতিপট থেকে সেই কালো ছবি কোনোদিন মুছে যাবে না। আর নতুন প্রজন্মের কাছে তা ইতিহাসের শিক্ষা যা ভুলে যাওয়া আত্মহত্যার নামান্তর। সেই মর্মন্তুদ লজ্জার কাহিনি অনেক জায়গায় লিপিবদ্ধ আছে। এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। বামফ্রন্ট সরকার কোন্ পরিস্থিতিতে বিধ্বস্ত রাজ্যকে পুনর্গঠিত করার কাজে হাত দিয়েছিল তা স্মরণ করে নেবার জন্য এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করা হল।

জনপ্রিয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার প্রাক্-মুহূর্তে শিক্ষাব্যবস্থা সর্বনাশের যে চরম সীমায় পৌঁছেছিল তাতে সাধারণ মানুষের ধারণা হয়েছিল যে এই গভীর সঙ্কট কাটিয়ে উঠে সুস্থ স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। কিন্তু রাজ্যবাসীর সমর্থন ও সক্রিয় সহযোগিতায় শক্ত হাতে সভ্যতার শত্রুদের মোকাবিলা করে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই সরকার আবার প্রমাণ করল, 'বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি'। অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনেছিল ঠিকই, আন্তরিক সদিচ্ছার সঙ্গে শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত সংস্কারের কাজও শুরু করেছিল। কিন্তু নৈরাজ্যের বছরগুলিতে শিক্ষার মান ও প্রসার — উভয়ক্ষেত্রেই যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তা নিরাময় করে উন্নয়নের যাত্রায় গতিসঞ্চার করতে কিন্তু সময় অনিবার্যভাবেই লেগেছিল। রাজস্বের অবস্থা সঙ্কটজনক ছিল। সুতরাং সংখ্যাগত প্রসার ও একই সঙ্গে গুণগত মানোন্নয়নের জন্য যথাযথ পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। ছিল অগ্রাধিকার ঠিক করার প্রশ্ন। প্রকৃত জনশিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষার ব্যাপক প্রসারকেই আশু প্রয়োজন বলে চিহ্নিত করা হল। দরিদ্র, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষকে শিক্ষার প্রতি আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে অতি তাৎপর্যপূর্ণ যে উৎসাহব্যঞ্জক ব্যবস্থাগুলি তখন করা হয়েছিল তা এখন সবাই জানেন। সেই সঙ্গে শিক্ষকমণ্ডলীর মর্যাদা, বেতনক্রম, নিরাপত্তা বাড়াবার জন্য যে দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপগুলি নেওয়া হল তা অনেক

সীমাবদ্ধতার মধ্যেও শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের বড় অংশকেই অনুপ্রাণিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের নীতি ও কার্যক্রম নির্ধারণের এবং তাদের সার্থক রূপায়ণের জন্য সরকার দায়িত্বশীল শিক্ষকসংগঠনগুলির ওপর আস্থা স্থাপন করেছে এবং সংগঠনগুলিও নিরলস পরিশ্রম করে সেই আস্থার পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে উপযুক্ত গঠনমূলক ভূমিকা পালন করেছে। এখনও এই পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট রয়েছে।

যথাযথ গুণমানের শিক্ষাকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে এই সমন্বিত প্রচেষ্টার যে সুফলটি প্রত্যক্ষ গোচর ও স্বপ্রমাণিত তাহ'ল বিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষার্থী সংখ্যার বিরাট স্ফীতি। প্রাক্-বামফ্রন্ট আমলের সঙ্গে তুলনা বোধহয় যুক্তিযুক্ত হবে না, কারণ সম্পূর্ণ প্রেক্ষাপটই তখন ভিন্ন ছিল। তাই এখানে শুধু সাম্প্রতিক কিছু তথ্য দেওয়া হলো ঃ[৯]

(ক) ২০০১-০২ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৫২,৪২৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। এইসব বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ কোটি ১ লক্ষ ৫১ হাজার।

(খ) ঐ সময়ে মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা ছিল ১২,০৮৬ (জুনিয়র ও উচ্চমাধ্যমিক সহ) যেখানে পাঠরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৫১ লক্ষ ৭৪ হাজার।

(গ) প্রতি বছরে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাচ্ছে। ২০০৪ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৫,৮৬,৯৬৯জন। ২০০৫ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে হ'ল ৬,১৫,১৪৭জন। এই বছর সেই সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৭ লক্ষ ৬৫ হাজার।

(ঘ) উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২০০৪ সালে ৩,৮০,৯১২। ২০০৫ সালে ৩,৯৮,৮৩৫। এ বছর পরীক্ষায় বসছে চার লক্ষের বেশী পরীক্ষার্থী।

বিদ্যালয় শিক্ষার পাশাপাশি আমাদের রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষারও একটি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য আছে। সমাজের যে অংশের মানুষ এই বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থায় আগ্রহী তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে। গতানুগতিকভাবে ধর্মমুখী শিক্ষার এই ধারাকে যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত করে শিক্ষার মূলস্রোতের কাছাকাছি নিয়ে আসার জন্য কিছু সুচিন্তিত ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক করে তোলার বিষয়টির পূর্ণাঙ্গ বিবেচনার জন্য ২০০১ সালে রাজ্য সরকার প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং পশ্চিমবঙ্গের পূর্বতন রাজ্যপাল ডঃ এ আর কিদোয়াইয়ের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিল। ২০০২ সালে সেই কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া যায়। পাঠক্রম-পাঠ্যসূচির পুনর্বিন্যাসের পরে বর্তমানে এই শিক্ষার সঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষার পার্থক্য অনেকটাই দূর করা গেছে। ২০০১-০২ সালের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যে ৫০৭টি অনুমোদিত মাদ্রাসা আছে। ক্রমশ এই শিক্ষাটি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যেসব ছাত্র-ছাত্রী মাদ্রাসায় ভর্তি হচ্ছে তারা কিন্তু বিদ্যালয় ব্যবস্থা থেকে সরে আসছে না। এরা প্রায় সকলেই নতুন উদ্যোগের ফসল, সবটাই সংযোজন।

প্রথামুক্ত শিক্ষা ঃ জনশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক চেষ্টার ধারাবাহিক সুফল এই রাজ্যের অধিবাসীরা পেয়ে চলেছেন। তথাপি সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁদের পক্ষে এই প্রথাবদ্ধ শিক্ষার সুযোগ নেওয়া সম্ভব নয়। যেসব নরনারী যথাযথ বয়সে নানা কারণে শিক্ষার অঙ্গনে প্রবেশ করতে পারেননি, আর্থিক অনটনের জন্য যাঁরা অকালে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছেন, রুটি-রুজির তাগিদে কৈশোরেই যাঁদের লেখাপড়ায় ইতি টানতে হয়েছে, যেসব ছাত্রী স্কুলের পড়া সাঙ্গ করার আগেই বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেছেন — তাঁদের কারো পক্ষেই প্রথাগত বিদ্যালয়ে আসার অবকাশ নেই। বয়স এঁদের কাছে বাধা, কাজের জায়গা ছেড়ে নিয়মিত স্কুলে আসা এঁদের পক্ষে অসম্ভব, একসঙ্গে সব বিষয়ে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়াও এঁদের পক্ষে কঠিন। আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিবন্ধী মানুষদের সামনে নতুন করে শিক্ষার দরজা খুলে দেবার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে মুক্ত বিদ্যালয় ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার ঘোষিত উদ্দেশ্য হল, যাদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছয়নি তাদের কাছে যাওয়া। [To reach the unreached]. রাজ্যস্তরে মুক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রেও পশ্চিমবঙ্গ অন্যতম পথিকৃৎ। বিধানসভায় গৃহীত আইনের ভিত্তিতে একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসেবে কাজ করে চলেছে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়। [শিক্ষায় আগ্রহী অথচ প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়ে থেকে অপারগ এইসব মানুষের সমস্যাগুলি দূর করার জন্য মুক্ত বিদ্যালয়ের নমনীয় নিয়মবিধির মধ্যে প্রধান কয়েকটি এইরকম —

(ক) এখানে ভর্তির বয়সের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। নবীন-প্রবীণ, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ — যেকোন বয়সের নারী-পুরুষই এই বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন।

(খ) শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পাঠকেন্দ্রে হাজিরা দেবার বাধ্যবাধকতা নেই। স্বশিখন পদ্ধতিতে রচিত পাঠোপকরণ ব্যবহার করে তাঁরা নিজের চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে বিষয়গুলি আয়ত্ত করবেন। পাঠকেন্দ্রগুলি সাধারণত ছুটির

দিনে খোলা থাকে। নিজে পড়া তৈরী করতে গিয়ে যে পড়ুয়া যেখানে অসুবিধে বোধ করবেন সেটুকু বুঝে নেবার জন্য তিনি পাঠকেন্দ্রে আসতে পারেন।

(গ) পাঠ্যবিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে মুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিশেষ স্বাধীনতা পায়। পাঠক্রমের অন্তর্গত সবকটি বিষয় একজন শিক্ষার্থীকে পড়তে হবে এবং পাশ করতে হবে এমন নয়। তিনি নিজের প্রয়োজন বিবেচনা করে যেকোন বিষয় বা বিষয়গুচ্ছ নিয়ে পড়াশুনা করতে পারেন। তবে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের যে পড়ুয়ারা প্রথাগত মাধ্যমিক পরীক্ষার সমমানের শংসাপত্র পেতে চান স্বভাবতই তাঁদের পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্ধারিত আবশ্যিক বিষয়গুলিতে উত্তীর্ণ হতে হবে।

(ঘ) পরীক্ষা দেবার ক্ষেত্রেও মুক্ত বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা কিছু সুবিধা পান। যে বিষয়গুলি নিয়ে তাঁরা ভর্তি হয়েছেন তার সবগুলি একসঙ্গে পরীক্ষা না দিলেও চলে। নিজের প্রস্তুতি বুঝে বিভিন্ন সময়ে এক বা একাধিক বিষয়ে পরীক্ষায় বসতে পারেন। পাশ করার জন্য তাঁরা নাম লেখাবার পরে পাঁচ বছরে ন'বার পরীক্ষা দেবার সুযোগ পান।]

কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কোনো সংস্থার পক্ষ থেকে এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জোর প্রচার চালানো হচ্ছে যে মুক্ত বিদ্যালয়ই আদর্শ ব্যবস্থা এবং উৎকর্ষের বিচারে এটি প্রথাবদ্ধ বিদ্যালয়ের চেয়েও উন্নত। আমরা এই তত্ত্বের ঘোর বিরোধী। স্কুলে যাবার বয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে এই শিক্ষা প্রথাবদ্ধ শিক্ষার বিকল্প হয়ে উঠতে পারে না। এই শিক্ষকবিহীন খণ্ডিত ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাগুলি অকাট্য। সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা যদি বিদ্যালয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য হয় তাহলে মুক্ত ব্যবস্থা কখনই কাম্যফল দিতে পারে না। নিঃসন্দেহে এই ব্যবস্থা শিক্ষায় সব শিশুকে সমান সুযোগদানের নীতির পরিপন্থী। এই সত্যটি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক তাপস মজুমদারের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত একটি বিশেষজ্ঞ দল। এঁদের প্রতিবেদনের উপসংহারে বলা হয়েছে, "To conclude, most of the operational part of this report rests on the simple premise that the granting of the right to elementary education, as a justiciable fundamental right of all the citizens of India upto the age of 14 years, implies that all children, including those who have so far been deprived of this opportunity of schooling, have equal entitlement to a period of fomal and normal schooling that the state has already made available to the average school going child. The expert groups, therefore,....did not favour any different and less costly mode of schooling, whether formal or non-formal, for the deprived children which is sometimes advocated, even if reluctantly, on the oft-repeated, ground of the shortage of resources in the hands of the State." অর্থটি খুবই স্পষ্ট। অর্থাভাবের অজুহাতে বঞ্চিতদের জন্য সস্তা গৌরবে (cost-effective) স্বতন্ত্র ব্যবস্থা অনুমোদনযোগ্য নয়। শিক্ষাখাতে ব্যয় কমিয়ে আনার যে ঝোঁক তাকে তাত্ত্বিক ভিত্তিতে স্থাপন করাই বিভ্রান্তি ছড়াবার মূল উদ্দেশ্য।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, এইসব দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা জেনে-বুঝেও এ রাজ্যে মুক্ত বিদ্যালয় চালানো ও তার প্রসার ঘটানোকে আমরা সমর্থন করছি কেন। এর উত্তরও অস্পষ্ট নয়। মুক্ত ব্যবস্থার যাঁরা যথার্থ লক্ষ্য দল তাঁদের কাছে বাস্তবের নির্মম আঘাতেই প্রথাবদ্ধ শিক্ষার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। মুক্ত বিদ্যালয়ের আংশিক সময়ের শিক্ষাই তাঁদের সামনে একমাত্র ভরসা। এই দুর্বল ব্যবস্থাও যদি না করা হয় তাহলে এই বঞ্চিত মানুষের সামনে লেখাপড়ার খণ্ডিত সুযোগও থাকবে না। এমন অসহায় মানুষ যখন সমাজে আছেন তখন মুক্ত বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। বর্তমান বিশ্বায়নের দাপটে আগামী দিনে যদি এই বর্গের নাগরিকের সংখ্যা বেড়ে যায় তাহলে মুক্ত বিদ্যালয়ের প্রাসঙ্গিকতাও বাড়বে। বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে মুক্ত বিদ্যালয় একটি অবাঞ্ছিত অপরিহার্যতা।

মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারছে বলেই রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলেছে। ২০০৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের অনুমোদিত পাঠকেন্দ্রের সংখ্যা — মাধ্যমিক স্তরে ১৬৮, উচ্চমাধ্যমিকে ৬৪। পঞ্জীকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা—মাধ্যমিকে ৭৮,৪৪০, উচ্চমাধ্যমিকে ৭,৮৬৩। বলে রাখা দরকার যে এখানে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পঠন-পাঠনের সূচনা হয়েছে ২০০১ সালে।

বিকল্প শিক্ষার অন্যান্য ব্যবস্থা : প্রথাবদ্ধ শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে বিকল্প আয়োজনের কারণ ওপরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সেই যুক্তিতেই অন্য যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলি সংক্ষেপে বলা যায় —

১। শিশু শিক্ষাকেন্দ্র — গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের কাছে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেবার জন্য শিশু শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে। এগুলি রাজ্য সরকারের পঞ্চায়েত

ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের তত্ত্বাবধানে চালানো হয়। ২০০৩ সালের তথ্য অনুযায়ী[১১] পশ্চিমবঙ্গে মোট শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ১৬,২০৯। সেখানে ছাত্রছাত্রী আছে ১০, ৩৩,৪৪১ জন। এইসব কেন্দ্রে পাঠদানের জন্য শুধু মহিলাদেরই নিয়োগ করা হয় যাঁদের বলা হয় শিক্ষা সহায়িকা। ঐ সময়ে শিক্ষা সহায়িকার সংখ্যা ছিল ৩৯,০৭৮।

২। **শিশু শিক্ষা প্রকল্প** — গ্রামাঞ্চলের শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মত শহরের ছেলেমেয়েদের জন্য নেওয়া হয়েছে শিশু শিক্ষা প্রকল্প। এই প্রকল্প রাজ্য সরকারের পৌর দপ্তরের অধীন। মূলত বস্তিবাসী, পথশিশু প্রভৃতি যারা বিদ্যালয়ের বাইরে আছে তারাই এই প্রকল্পের লক্ষ্যদান। ৯২৬টি প্রকল্প-কেন্দ্রে ৪৬,৩৬৪ জন ছেলেমেয়ে এখানে ভর্তি হয়েছে।

৩। **মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র** — উচ্চপ্রাথমিক পর্যায়ের (৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি) বিকল্প শিক্ষার জন্য গড়ে উঠেছে মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র। গ্রামাঞ্চলে এই ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিশু শিক্ষা মিশন নামে একটি শাখা খোলা হয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে প্রথাবদ্ধ শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করা হয়। এখন আমাদের রাজ্যে মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের সংখ্যা ৮৪৭। সেখানে পড়াশুনা করছে ৫৪,৮,৯৩ জন ছাত্রছাত্রী। এখানকার শিক্ষকের ('সম্প্রসারক') সংখ্যা ১৫৯৮।

এ ছাড়াও আছে সাক্ষরতা প্রসারের জন্য সরকারী ও বেসরকারী নানা উদ্যোগ। আছে জনশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারী দপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রম। ডি পি ই পি এবং পরে ২০০০ সালের নভেম্বর মাস থেকে সর্বশিক্ষা অভিযান সমাজের পিছিয়ে-পড়া অংশের ছেলেমেয়েদের মৌলিক শিক্ষার অঙ্গনে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে মূল্যবান কাজ করে চলেছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের ঘোষিত লক্ষ্য হল ২০০৭ সালের মধ্যে সব শিশুর জন্য পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা এবং ২০১০ সালের মধ্যে তাদের জন্য আট বছরের প্রারম্ভিক শিক্ষাকে সুনিশ্চিত করা। এই অভিযানের তিনটি মূল স্তম্ভ আছে -- সকলকে স্কুলে আনা, সকলকে স্কুলে ধরে রাখা এবং উপযুক্ত গুণমানের শিক্ষা দেওয়া। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের দুপুরের খাবার (mid-day meal) দেবার কর্মসূচি ক্রমশ সুসংগঠিত রূপ নিচ্ছে এবং যথেষ্ট সুফল দিচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পরে কিছুদিনের মধ্যেই যে ব্যবস্থাগুলি নিয়েছিল তার মধ্যে আছে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ও প্রাথমিক স্তরে বিনামূল্যে সব বিষয়ের বই বন্টন।

রাজ্যজুড়ে সর্বাত্মক ও সুপরিকল্পিত কর্মকান্ডের ফলে জনশিক্ষার প্রভূত বিস্তার ঘটেছে তার দু'টি গুণগত বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। প্রথমত, তপশীলী জাতি ও উপজাতি অংশের ছেলেমেয়েদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় যোগদান। দ্বিতীয়ত, প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মেয়েদের ভর্তি হবার হার বৃদ্ধি। ২০০৩-০৪ শিক্ষাবর্ষের হিসাব অনুযায়ী ছাত্রীদের ভর্তির হার ছিল প্রাথমিক স্তরে ৪৯·৫২% এবং উচ্চ প্রাথমিকে ৪৮·২৩%। বামফ্রন্ট সরকারের কার্যকালের প্রথম দশ বছরের মধ্যেই শিক্ষাবিস্তারের উজ্জ্বল কৃতিত্ব দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। ১৯৮০-র দশকের শেষদিকে নারীশিক্ষা প্রসারে সাফল্যের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ ইউনেস্কোর 'নোমা' (NOMA) পুরস্কার পেয়েছিল। প্রারম্ভিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধির বিচারে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্য একটি অনন্য স্থান অধিকার করে আছে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষও এই বিশাল অগ্রগতি লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়েছে, কৌতূহল প্রকাশ করেছে — এর পেছনে রহস্যটা কী?

সাফল্যের চাবিকাঠি —বিদ্যালয় শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার যে ইতিবাচক পদক্ষেপগুলি নিয়েছে তার কিছু পরিচয় ওপরে দেওয়া হয়েছে। এই খাতে বাজেট বরাদ্দও উল্লেখযোগ্য। প্রাসঙ্গিক কিছু তথ্য নিচে দেওয়া হল[৩]—

শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দ

বছর	টাকা
১৯৭৬-৭৭ (কংগ্রেস সরকারের শেষ বছর)	১১৪ কোটি
২০০১-০২	৪২২০ কোটি
২০০২-০৩	৪৫৪২.৮৮ কোটি

● ২০০২-০৩ সালের এই বরাদ্দ ছিল রাজ্যের মোট বাজেটের ২৩·৭৩%

● বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বরাদ্দ হয়েছে শিক্ষা বাজেটের ৮৬%

● ১৯৯৫-৯৬ সালে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩·৭% ব্যয় করা হয়েছে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেখানে জাতীয় গড় ছিল মাত্র ২.৮

শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের পেছনে এই পদক্ষেপগুলির অবশ্যই মূল্যবান অবদান আছে। তবে সেটাই মূল কারণ নয়।

আসল চাবিকাঠি হচ্ছে শিক্ষাব্যবস্থাকে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখে সাধারণ দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নতির অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করার দৃষ্টিভঙ্গী ; সেই দর্শনের ওপর ভিত্তি করে বিকল্প উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার সার্থক রূপায়ণ। এই বিকেন্দ্রীকৃত উন্নয়নই বামপন্থী চিন্তার স্বকীয়তা, তার বিশেষত্ব। সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে জড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে সাধারণ গরীব মানুষকে, তাদের হাতে অর্পণ করা হচ্ছে ক্ষমতা ও সম্পদ। রাজ্য সরকারের এই নীতি ও তার সার্থক প্রয়োগ আন্তর্জাতিক মহলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। ইউ এন ডি পি কর্তৃক প্রকাশিত ২০০৩ সালের মানবোন্নয়ন প্রতিবেদনে বিকেন্দ্রীকৃত ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে বিশদ পর্যালোচনা আছে। এই বিষয়ে তাঁরা বলেছেন, "It is widely believed that decentralisation increases popular participation in decision-making because it brings government closer to people-making it more knowledgeable about local conditions and so more responsive to peoples demands."এই প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হয়েছে – "But does evidence support this idea? More important, does decentralising authority and resources help advance the pro-poor agenda?"

এই প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানে তাঁরা একটি সারণিতে বিশ্বের ১০টি বিভিন্ন রাষ্ট্র এবং ভারতের দুটি রাজ্যের – কর্ণাটক ও পশ্চিমবঙ্গ – চিত্র তুলে ধরেছেন। ভারতের রাজ্য দুটির অবস্থা যে ভাবে পরিবেশন করা হয়েছে তা নিচে দেওয়া হলো[১৪] –

অর্থাৎ কর্ণাটকের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে প্রক্রিয়াটিও সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হয়েছে এবং ফলও ভাল হয়েছে। কর্ণাটকে দেখা যাচ্ছে জনগণের প্রতিনিধিত্ব বাড়লেও গরীব মানুষের কার্যকর অংশগ্রহণ ঘটেনি, সরকারের সংবেদনশীলতাও কম। পশ্চিমবঙ্গে প্রতিনিধিত্ব, অংশগ্রহণ এবং সংবেদনশীলতা– তিনটিই উন্নতমানের। এর ফলে অর্থনীতির বিকাশ, বন্টনে সমতা ও মানবোন্নয়ন এগিয়ে গেছে। এই প্রতিবেদনেই পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে আরো নির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে "In the state of West Bengal, India, where local authorities (Panchayat) were empowered long before the National Government required all the state goernments to create and empower them, poverty declined sharply in the 1980s. Under 'operation barga' the panchayat helped to improve agricultural technology and reform land tenency. They also helped register 1.4 million share cropper."[১৫]

এই বক্তব্য ও বিশ্লেষণ প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণ করছে যে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য জনগণের শাসনের এক বিরল নজির সৃষ্টি করেছে। (আশা করি একথা কেউ বলবেন না যে ইউ এন ডি পি পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহার রচনার দায়িত্ব নিয়েছে) কেন্দ্রীয় সরকার এবং দেশের অন্যসব রাজ্য সরকারের মতই পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও আর্থিক অনটন আছে। কিন্তু একটি সম্পদের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট অনন্য। তা হ'ল রাজনৈতিক সদিচ্ছা, গরীব মানুষের স্বার্থরক্ষা ও চেতনাবিকাশে অকৃত্রিম দায়বদ্ধতা। বামপন্থীরা ছাড়া আমাদের পরিচিত রাজনৈতিক দলের বা

Participation by or responsiveness to poor people	Impact on social and economic poverty
Karnataka–Fairly good; improved reprsentation but poor peoples participation is less effective and responsiveness low.	Neutral : did little to help pro-poor growth or equity; human development and spatial equity indirectly benefitted from funding allocation and development programme.
West Bengal– Good : improved participation, representation and responsiveness.	Good : Increased growth,equity and human development; evidence lacking or capatial equity.

জোটের মতাদর্শ বা কর্মসূচিতে কি এই মানবমুখী দর্শনের বিন্দুমাত্র আভাষ আছে? তাদের গঠিত সরকার কি এভাবে প্রকৃত অর্থে দরিদ্র মানুষের বন্ধু হয়ে উঠতে পারবে? না, তা সম্ভব নয়, কারণ শ্রেণিচরিত্রই তাদের বিপরীত পথে নিয়ে যাবে।

শিক্ষার গুণগত মান ঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সর্বদাই আদরণীয় ছিল। তবে বর্তমান জ্ঞানভিত্তিক সমাজে, বিশেষত, বিশ্বায়নজাত তীব্র প্রতিযোগিতার চাপে এই প্রশ্নটি অনেক বেশী মনোযোগ আকর্ষণ করছে। কিছুদিন ধরে নানামহল থেকে বলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। কবে কোথায় কোন্ মাপকাঠি দিয়ে এটা নির্ধারিত হয়েছে আমরা জানি না। তবু যখন কিছু দায়িত্বশীল মানুষের মনেও এমন ধারণা দানা বাঁধছে তখন বিষয়টি একটু গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা দরকার।

এ রাজ্যে শিক্ষায় আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থার কাছে মানুষের প্রত্যাশাও বহুগুণ বেড়ে গেছে। বেশ ভালো ব্যবস্থাকেও তাঁরা যথেষ্ট ভালো বলে মনে করছেন না। এই অতৃপ্তিও একটি সুস্থ লক্ষণ যদিও একাংশের মানুষের সীমিত হতাশাকে বিভ্রান্ত করে বিপথচালিত করার বাতাবরণ তৈরী করা হচ্ছে। আমরা মনে করি, পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার অনেকগুলি ইতিবাচক দিক আছে, আবার অবশ্যই কিছু দুর্বলতাও রয়েছে যার সবটাই রাতারাতি দূর করা সম্ভব নয়। এই নিবন্ধের সূচনাতেই দেখানো হয়েছে যে সম্পদের অনটন থাকলে শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন — দুটির দিকেই যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া যায় না। পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত সুবিবেচনার সঙ্গে জনশিক্ষা বিস্তারের কাজকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল। শিক্ষার আঙিনায় শিক্ষার্থীসংখ্যার এই বিরাট স্ফীতি এই নীতির কাঙ্ক্ষিত সুফল। কিন্তু এই কৃতিত্বের প্রভাব পড়েছে ধারণক্ষমতার অভাব ও পরিকাঠামোর সীমাবদ্ধতায়; যা অনিবার্যভাবেই কাম্য উৎকর্ষের চেষ্টাকে কিছুটা ব্যাহত করে। এটা তো সাফল্যজাত সমস্যা। যারা এই কৃতিত্বকে আড়ালে রেখে শুধু সমস্যাগুলিকে বড় করে দেখান, তাঁরা সমালোচক নন, নিন্দুক। আমরাও অনেক সময় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করি। তবে তা এখানে শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে বলে নয়, আমরা আরো উন্নতি চাই বলে।

শিক্ষার গুণগত মান বিচার করতে হলে প্রথমেই যে প্রশ্নটির মীমাংসা করা দরকার তা হল এমন একটি মৌলিক সামাজিক পরিষেবার ক্ষেত্রে উৎকর্ষের পরিমাপক কী। এ নিয়ে কিছু মতপার্থক্য থাকলেও মোটামুটিভাবে স্বীকৃত ধারণা এই যে যে-কোনো স্তরে শিক্ষাব্যবস্থার উৎকর্ষের অর্থ হ'ল সেই পর্যায়ের শিক্ষার লক্ষ্যপূরণের উপযুক্ততা। সুতরাং লক্ষ্য থেকে সরে এসে উৎকর্ষের বিচার অবৈজ্ঞানিক। তত্ত্বের দিক থেকে এটা স্বীকৃত যে বিদ্যালয় শিক্ষার মূল লক্ষ্য হ'ল সুস্থ সমাজের উপযুক্ত মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা, কোনো বিশেষ পেশাদারী উচ্চতর শিক্ষায় প্রবেশের 'ইঁদুর দৌড়ে' সাফল্যের প্রস্তুতি দেওয়া নয়। কিন্তু বর্তমান বাজার-শাসিত দুঃসময়ে আমাদের জীবনের পরিমন্ডলে একদিকে রয়েছে ক্রমবিস্ফারিত উচ্চাভিলাষ, অন্যদিকে ক্রমসঙ্কুচিত সুযোগ। মুনাফার স্বার্থে ছড়ানো হচ্ছে বিলাস-বৈভবের রঙীন হাতছানি, আর কর্মসংস্থানহীন বৃদ্ধির যাঁতাকল। তীব্র প্রতিযোগিতার চাপ মানুষকে করে তুলছে আত্মমগ্ন, সমাজ-নিস্পৃহ। শিক্ষাকেও ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বাজারমুখী চরিত্রের দিকে। জীবিকার শিক্ষার তাগিদ জীবনের শিক্ষাকে করে তুলছে অপ্রাসঙ্গিক। শিক্ষা সুস্থ সমাজ গড়ার প্রক্রিয়া হবে না, হবে অসুস্থ সমাজের বিকৃত চাহিদাপূরণের যন্ত্র। অনিবার্যভাবেই ভেঙে পড়ছে মূল্যবোধের কাঠামো, হারিয়ে যাচ্ছে নৈতিকতা।

এই লক্ষ্যচ্যুতিকে মেনে নিয়ে বিশেষ কিছু সঙ্কীর্ণ জায়গায় সাফল্যকে মাপকাঠি হিসেবে প্রয়োগ করলে হয়ত পশ্চিমবঙ্গ সামনের সারিতে নেই, সেখানে উজ্জ্বল হয়ে বিরাজ করছে কেন্দ্রীয় বোর্ডগুলি যাদের জনশিক্ষা প্রসারের দায় নেই। ওই অভিজাত পর্ষদগুলির প্রতি সাধারণ মানুষের দুর্বলতা বাড়ছে, মোহ জাগছে। আমরাও অনেক সময় ওদের পাঠক্রমকে আদর্শ বলে তুলে ধরি। তবে এ সম্পর্কে প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ অধ্যাপক যশপালের নেতৃত্বে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে পাওয়া যাচ্ছে এই মূল্যায়ন— "The schools affiliated to CBSE in the states other than Delhi enjoy the prestige of being elite schools. The CBSE curriculum becomes, a trend-setter for the State Boards leading to heavier curriculum for majority of children. Therefore, the Committee recommends that jurisdiction of CBSE be restricted to Kendriya and Navodaya Vidyalayas and all other schools be affiliated to the respective State Boards"[১৬] অবিকল এই উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছিল ২০০৪ সালে দিল্লিতে এন সি ই আর টি আয়োজিত একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে। সেখানে একের পর এক রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের অধিকর্তারা বললেন, যতদিন কেন্দ্রীয় বোর্ডগুলি থাকবে ততদিন আমাদের পক্ষে

সঠিক বিজ্ঞানসম্মত পাঠক্রম অনুসরণ করা সম্ভব নয়। কথাটি অভ্রান্ত। কিন্তু এসব তাত্ত্বিক বাণী এখন অরণ্যে রোদন। অরণ্য গভীর হচ্ছে, রোদনের শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে।

তবু পরীক্ষার ফলকেই যদি গুণমানের সূচক বলে মেনে নেওয়া যায়, পশ্চিমবঙ্গের স্থান কোথায়? ১৯৯০ সালের জানুয়ারী মাসে এন সি ই আর টি একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষার আয়োজন করেছিল। সব রাজ্য থেকে বেছে নেওয়া কিছু স্কুলের ১০ম ও ১২শ শ্রেণির কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রীকে সেই পরীক্ষায় বসানো হয়েছিল। পরীক্ষাটির নাম ছিল National Selection Achievement Test. বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী বেছে নেওয়ার কাজ এন সি ই আর টি তাদের পদ্ধতি অনুযায়ী করেছিল। যে কটি বিষয়ে পরীক্ষা হয়েছিল তার প্রশ্নের ভিত্তি ছিল কেন্দ্রীয় পর্ষদের সিলেবাস, রাজ্যের নয়। ১৯৯২ সালের আগস্ট মাসে সেই বিরাট পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ বেশিরভাগ রাজ্য থেকে অনেক এগিয়ে আছে। আবার ২০০০ সালে এন সি ই আর টি পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র- ছাত্রীদের জন্য অনুরূপ পরীক্ষা গ্রহণ করেছিল। সেখানেও পশ্চিমবঙ্গ একেবারে সামনের সারিতে ছিল। আমরা মনে করি যে আমাদের রাজ্য যথেষ্ট এগোতে পারেনি। কিন্তু বাস্তব চিত্র দেখাচ্ছে অন্য বেশীরভাগ রাজ্যই অনেক পিছিয়ে পড়েছে। বিশ্ব মানবোন্নয়নের ক্রমতালিকায় ভারতের স্থান যে তিন বছরে ১২৪ থেকে নেমে ১২৭-এ চলে এসেছে, এটা অবশ্যই তার একটা কারণ।

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান শিক্ষাচিত্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল উৎকর্ষের বিকেন্দ্রীকরণ। শিক্ষায় প্রবেশের মতই উৎকর্ষের সুযোগও সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে। একসময় পর্ষদ-সংসদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম দশটি স্থান আলো করে থাকতো কলকাতা বা অন্য দু'একটি বড় শহরের নামকরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। এখন দেখা যাচ্ছে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অখ্যাত বিদ্যালয়ের নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরাও সেখানে স্থান করে নিচ্ছে। উচ্চমাধ্যমিকের পরে জয়েন্ট এন্ট্রান্সেও ভাল ফল করে তারা ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হবার পথে চলছে। উৎসাহ ও সহায়তা দিচ্ছে রাজ্য সরকার, রাজ্যের মানুষ। এ আনন্দ, এ অহঙ্কারকে তুচ্ছ করবে কোন্ নির্লজ্জ?

আমরা চাই এই দৃষ্টিভঙ্গীতে অবিচল থেকে এই নীতিকে ভিত্তি করে আরো এগিয়ে যেতে। যেখানে যা ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে সংগঠিতভাবে সেগুলি দূর করে আরো উঁচু মানের শিক্ষাকে আরো বেশী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের অঙ্গীকার, আমাদের ব্রত। আমরা পিছিয়ে পড়তে চাই না। তাই আবার, বারবার ক্রমোন্নত বামফ্রন্টকে চাই।

তথ্যসূত্র ঃ

১। NIEPA, New Delhi – Elementary Education in India, 2004, pp.2
২। NCERT, New Delhi – National Curriculum Framework, 2005, pp.1
৩। NCERT, New Delhi–National Curriculum Framework, 2000, pp.126
৪। Ibid – pp. 60
৫। Ibid – pp. 8
৬। Report of the All India Conference of District Education Offices, New Delhi, March 6-8, 1976, pp 23
৭। U.G.C., New Delhi – Development of Higher Education in India : A Policy Frame, February 1978, Para 2.02
৮। NCERT, New Delhi, National Curriculum Framework, 2005, pp.8
৯। Department of School Education, Govt. of West Bengal – Annual Report 2004-05
১০। Deptt. of Education MHRD, Govt. of India, New Delhi – Report of the Expert Group on Financial Requirement, for Making Elementary Education A Fundamental Right, 1999, Para 6.1
১১। Annual Report (2004-05), School Education Department, Govt. of West Bengal
১২। Ibid
১৩। Ibid–pp. 284
১৪। UNDP – Human Development Report, 2003, pp. 134 and 141
১৫। Ibid.
১৬। 'Learning Without Burden – Report of the National Advisory Committee, Govt. of India, MHRD, Deptt. of Education, 1993.

ইন্ডিয়ান স্কুল অব সোস্যাল সায়েন্সেস, কলকাতার মুখপত্র সমাজ সমীক্ষার ১৫শ বর্ষ ১৯ সংখ্যার সৌজন্যে

চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচন

ভোটের সূচিতে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা

সংবাদপত্র ও সংবাদ মাধ্যমের কাছে প্রেরিত

সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি

ভারতের নির্বাচন কমিশন পশ্চিমবঙ্গের চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণের যে দিনগুলি নির্ধারণ করেছেন, ঐ দিনগুলিতে আমাদের রাজ্যের কয়েক লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। এই সময় খাতা দেখা ও নির্দিষ্ট সময়ে ফল প্রকাশের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজও চলবে।

তাই আমাদের স্নেহের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবে আমরা গভীর উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশ করছি।

আশা করি, ভারতের নির্বাচন কমিশন আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণের জন্য এ ব্যাপারে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

West Bengal Board of Madrasah Education

Begum Rokaiya Bhaban

19 Haji Md. Mohsim Square, Kolkata-700 016

মশীর আলম
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ

Ref. / Memo No. : 293 *Date : 27/02/06*

সম্পাদক,
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি
পি-১৪, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ
কলকাতা-৭০০ ০১৩

মহাশয়,

ডঃ শামসুল আলম নতুন সভাপতিরূপে ২৪·০২·২০০৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদে কার্যভার গ্রহণ করেছেন।

ধন্যবাদান্তে,

ভবদীয়,
মশীর আলম, *সচিব*
পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ

এই দায়িত্ব পালন করতে হবে

কান্তি বিশ্বাস

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি তার জন্মলগ্ন থেকে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজের মর্যাদা বৃদ্ধি এবং শিক্ষার সুযোগের সম্প্রসারণ ও তার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। সেইসাথে সমাজের এক দায়িত্বশীল এবং সচেতন অংশ হিসাবে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীগণ যাতে শ্রেণিকক্ষের বাইরে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে নিজকর্তব্য সম্পাদন করতে পারেন, তার জন্য এই সমিতি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এরজন্য কখনও অনুসন্ধানকারী কমিটি নিয়োগ করে রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আর্থিক অবস্থা নিরূপণের জন্য সমিতি উদ্যোগী হয়েছে। প্রকৃত অবস্থার সঠিক চিত্র তুলে ধরে সরকারের নিকট প্রতিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে, ব্যর্থ মনোরথ হয়ে আন্দোলনে সামিল হয়েছে। শিক্ষার সার্বিক কল্যাণের জন্য "শিক্ষার দাবি জাতীয় দাবি, জাতীয় দাবি মানতে হবে" শুধু ধ্বনি উচ্চারণ করে এই সমিতি ক্ষান্ত থাকেনি, পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি, পাঠ্যপুস্তক, পঠন-পাঠন-এর মানকে সময়োপযোগী ও উন্নত করার প্রতি যেমন যত্নবান হয়েছে, তারই সাথে শ্রেণিকক্ষে স্বীয়কর্তব্য নিষ্ঠার সাথে পালন করার জন্য শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা সহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে যোগ্য ভূমিকা পালন করার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। এই কাজের অঙ্গ হিসাবে তিক্ত অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে শিক্ষা-বিরোধী কংগ্রেস সরকার যাতে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে তার জন্য সমিতি জনমত গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছিল। অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করে ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সমিতি আহ্বান করেছিল এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার গড়ার জন্য। তার পরের প্রত্যেকটি বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের বিজয়ের জন্য সমিতি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করেছে। সমিতির এই দীর্ঘ পথপরিক্রমার বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়ে সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনা ও তথ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের আর্থিক অবস্থার সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য সমিতি প্রখ্যাত অর্থবিজ্ঞানী ও সাংবাদিক দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেছিল। কমিটি ১৯৫৪ সালে তার তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন পেশ করে। ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় রাজ্যের কর্মরত একজন Carpenter-এর মাসিক বেতন ১৩১ টাকা। একজন Fitter-এর মাসিক বেতন ১৬২ টাকা এবং একজন Turner-এর মাসিক বেতন ১০৯ টাকা। আর বিদ্যালয়ের একজন স্নাতকোত্তর পদবীসম্পন্ন শিক্ষকের মাসিক বেতন ৭৫ টাকা। কলকাতা বন্দরের একজন সাধারণ কর্মী কিংবা Pottery-এর একজন অদক্ষ শ্রমিকের মাসিক বেতন ৬১ টাকা। আর বিদ্যালয়ের একজন স্নাতক পদবীসম্পন্ন শিক্ষকের মাসিক বেতন ৬০ টাকা। আই এ পাশ শিক্ষকের বেতন ৫০ টাকা। ঐ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের ৮৫·৭ শতাংশ পরিবার ছিল ঋণগ্রস্ত — আর কোনো বেতনভুক পেশায় কর্মীদের পরিবার এত অধিক হারে ঋণগ্রস্ত ছিল না।

শিক্ষকদের এই লজ্জাজনক, বেদনাদায়ক অবস্থার প্রতিকারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল। সমিতির নেতৃবৃন্দ অভিমানের সুরে বলেছিলেন, মহাকরণের একজন আর্দালীর বেতনের থেকেও শিক্ষকদের বেতন কম। তদানীন্তন শিক্ষাসচিব ডি এম সেন মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই শিক্ষকদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে বলেছিলেন, এর পরে আর্দালীর পদ শূন্য হলে শিক্ষকগণ যদি ঐ পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করেন, তাহলে সেই আবেদন অনুকম্পার সাথে বিবেচনা করা হবে। ক্ষোভে প্রজ্জ্বলিত শিক্ষক নেতৃবৃন্দ ঘৃণার বাণী বর্ষণ করে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষ ত্যাগ করেছিলেন।

এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মানুষ গড়ার যে কারিগর সেই সমাজের প্রতি এই সরকারের দায়বদ্ধতার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচের সারণি থেকে পাওয়া যাবে।

মাসিক বেতন ও ভাতা (টাকায়)		
	১৯৭৭	১৯৯৮
পাশ গ্রাজুয়েট শিক্ষক	৩৩২	৬,৪৭১
অনার্স গ্রাজুয়েট শিক্ষক	৩৮২	৭,৬৩৫
স্নাতকোত্তর শিক্ষক	৪২২	৮,৩২০

উল্লেখ করা যেতে পারে বামফ্রন্ট সরকারের পূর্বে রাজ্যের ১,৬০০ নিম্ন-মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারের নিকট হতে ঘাটতি-ভিত্তিক সাহায্য পেত। অর্থাৎ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বেতন দেওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের নিকট হতে যে বেতন আদায় করা হতো, তাতে যদি শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বেতন সংকুলান না হতো, তাহলে সরকার ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করত। প্রথম বছরে একবার মাত্র বৎসর শেষে ঐ অনুদানের টাকা দেওয়া হত, পরে অনেক আন্দোলনের ফলে বছরে দু-বার ঐ অর্থ দেওয়া হত। বাকি বিদ্যালয়গুলি কেউ বৎসরে ১৬,০০০ টাকা, কেউ ৮০০০ টাকা থোক সাহায্য পেত। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের বেতনহার যাই-হোক না কেন মূলত ছাত্র-বেতনের উপর তা নির্ভর করত।

শিক্ষকদের চাকুরির কোনো নিরাপত্তা ছিল না। পুলিশের গোপন রিপোর্টে শিক্ষকের চাকুরি যেত। এস টি ই এ-র একদা সভানেত্রী বীণা চৌধুরী, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির নেতা, পরে সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন — অরুণ চৌধুরী প্রমুখ বহু শিক্ষককে ঐ ভাবে ছাঁটাই হতে হয়েছে।

শিক্ষকতা পদের সুযোগ পাওয়া ছিল কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীপনার উপর নির্ভরশীল। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে আজ যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগের যে ব্যবস্থা এই সরকারের আমলে চালু হয়েছে যা দেশের মধ্যে নজিরবিহীন, তা সকলের প্রশংসাধন্য হয়েছে।

শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের অবসরকালীন সুযোগ পূর্বে ছিল নামে মাত্র। শেষ মূল বেতনের অর্ধেক এবং গ্র্যাচুইটির সুযোগ আজ তারা পাচ্ছেন। ১৯৮১-এর পরে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের পেনশন দেওয়ার জন্য আলাদা অফিস হয়েছে। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখ পর্যন্ত ঐ অফিস হতে ৭৮,৬৭০ জন মাধ্যমিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী পেনশন পেয়েছেন। মাদ্রাসার শিক্ষকদের এই সকল আর্থিক সুযোগ দেওয়া হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের জমানায়, দেশের আর কোনো রাজ্যে মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীগণ এই সুযোগ পান না।

শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের শুধু সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি নয়, শিক্ষার সুযোগ কী ভাবে বেড়েছে যা ভারতের আর কোনো রাজ্যে বাড়েনি, তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচে দেওয়া হলো ঃ

	১৯৭৭	২০০৬
হাইস্কুল	৩,৬৬৬	৯,৫১৪
হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল	৯৬৭	৩,৮৯১
মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী	২,০৫,০০০	৭,৬৪,২৩২
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী	৫৮,০০০	৪,৩৪,৫৭১
শিক্ষক	৭৪,৯৬৪	১,৫১,৮৫৬
মাদ্রাসা	২৩৮	৫০৪
মাদ্রাসা পরীক্ষার্থী	৩,৯৯৩	২৭,৭১৮
শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী	১,৭৮৫	৭,৭৬৩

শিক্ষাবাবদ রাজ্যের মোট ব্যয় বরাদ্দ ১৯৭৬-৭৭ সালে ছিল ১১৪ কোটি টাকা, বিদায়ী বৎসরে তা ধারাবাহিক ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৫,৮৮২ কোটি টাকা। মাদ্রাসার ব্যয় বরাদ্দ ঐ সময়ে ৫ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা থেকে ১৮৮ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

দেশের প্রায় সকল রাজ্যে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ আছে। এই রাজ্যে শূন্যপদে নিয়মিত শুধু শিক্ষক নিযুক্ত হচ্ছেন তা-ই নয়, এ বৎসর ২১ হাজারের বেশি স্থায়ী এবং সর্বক্ষণের শিক্ষকের পদ মঞ্জুর করা হয়েছে, যা দেশে সর্বকালীন রেকর্ড।

বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ, গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ, বীক্ষণাগারের উন্নয়নের জন্য বর্তমান বৎসরে দ্বাদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ হতে ৬৪ কোটি টাকা বিভিন্ন বিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে, এটাও এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত।

সমগ্র শিক্ষা প্রশাসনকে গণতন্ত্রীকরণ এবং সেক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের যোগ্য ভূমিকা পালন করার অবকাশ সৃষ্টি করে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার যে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছে গোটা দেশে তা প্রশংসিত হয়েছে।

এই সব কিছুর জন্যই আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রতিবেদন-গুলিতে এই রাজ্যের শিক্ষা পরিচালনা বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

এই ধারা অব্যাহত রাখতে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের একটা বড় ভূমিকা আছে। তার জন্য রাজ্যে পুনরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যান্য সকল প্রগতিশীল শক্তির সাথে যুক্ত হয়ে সর্বস্তরের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীগণ নিজ দায়িত্ব পালন করবেন। এই বিশ্বাস সকলেরই আছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থা

অধ্যাপক মোহাম্মদ রেফাতুল্লা

প্রাক্তন অধিকর্তা, এস সি ই আর টি

হাজারো লাখো মেহনতি শ্রমিক, কৃষক, শোষিত ও উৎপীড়িত সাধারণ মানুষ, শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিল্পী, লেখক-লেখিকা ও অগণিত পিছিয়ে পড়া মানুষের বিপুল জনজোয়ারের সমর্থনে লালপতাকা উড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকার লালবাড়ি রাইটার্স গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় দখল করে ঐতিহাসিক ১৯৭৭ সালে। যদিও তার পূর্বে কিঞ্চিৎকাল ১৯৬৭ সালে ও ১৯৬৯ সালে দুবার যুক্তফ্রন্ট সরকার জনবিরোধী, দুর্নীতিপরায়ণ ও সাম্প্রদায়িক কংগ্রেসের অপশাসন ঘুচিয়ে ক্ষমতায় এসেছিল। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্টের ক্ষমতায় বিজয়ী হবার পর আজ পর্যন্ত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ভিত্তিতে প্রায় ২৯ বছর সগৌরবে সরকারে আসীন রয়েছে। ঐ সময়ের মধ্যে ঘটেছে নানা অভূতপূর্ব ও প্রজানুরঞ্জক ব্যবস্থাপনা ও কর্মোদ্যোগ যা এই অঙ্গরাজ্যকে আজ সারা ভারতবর্ষে এক মডেল রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আজ রাজ্যের কৃষককে অভিযোগ করতে হয় না.....তুমি মহারাজ সাধু হলে আজ, আমি আজ চোর বটে।' ঘটে গেছে বর্গাদার আন্দোলন, জমির পাট্টা বিতরণ, বলিষ্ঠ পঞ্চায়েতীরাজ ও বিকেন্দ্রীকরণ জনগণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা, মেহনতি ও সর্বহারা শোষিত মানুষের প্রতিষ্ঠা লাভ ও রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রস্থলে অভিষেক, অভূতপূর্ব সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক বাতাবরণ, শিক্ষাক্ষেত্রে জনগণের প্রভাসিত সুশৃংখল সুস্থির পরিবেশ এবং শিল্প-প্রযুক্তি, কৃষি ও কর্মসংস্থানে এক নতুনদিনের ইঙ্গিত। আজ দ্বিধাহীনভাবে এ রাজ্যের মানুষ গান গাইতে পারে 'গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।' নারীশিক্ষা, প্রযুক্তি, কারিগরী, পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা, গ্রামোন্নয়ন এবং জমির উপর সর্বহারা মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে এক স্বাতন্ত্র্য অথচ গৌরবময় ভূমিকায় অবস্থান করছে। অনেক ক্ষেত্রে রাজ্যের ঐ সাফল্য কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ সরকারও (কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত) স্বীকার করেছে। পাশাপাশি বাস্তহারা ও আদিবাসী সমস্যা এবং সংখ্যালঘুদের শিক্ষায় পশ্চাদপদতা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছুটা কালোছায়া উঁকিঝুঁকি মারছে। সঙ্গে সঙ্গে দিশেহারা নিঃস্ব ও গরীব মানুষের আর্ত ও বেদনা ও নিরক্ষরতা এই সরকারের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে যাতে তার প্রভাব শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যত্র পিছিয়ে যাবার মনোভাবকে দূর করে বামফ্রন্টের জনস্বার্থ অনুকূলমূলক কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে পারে। আজ কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বত্রাসী মহানায়কের কাছে আত্মসমর্পণ ও দেশকে বিকিয়ে দেবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সরকারই গলা উঁচিয়ে দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। পূর্বতন ফ্যাসিবাদী, গণহত্যাকারী, অতি সাম্প্রদায়িক ও দাঙ্গাবাজ এন ডি এ সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চারও এই রাজ্য। এই রাজ্যের সুষ্ঠু ও সুস্থ রাজনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, কৃষি ও সার্বিক উন্নয়ন নীতি প্রকৃত অর্থে এক বিকল্প অর্থনৈতিক মডেলের মাধ্যমে এক নতুন জায়গায় পৌঁছতে পেরেছে। মহামতি গোখেলের "What Bengal thinks today, India thinks tomorrow" কথাটি এখনও অনেক দিক থেকে পশ্চিমবাংলা এখনও সারা ভারতে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করছে।

বামফ্রন্ট সরকারের আশু লক্ষ্য

১৯৭৭ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব লক্ষ্য ও কার্যক্রম ঘোষণা করেছিলেন প্রধানত সেগুলির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ এখনও চরম উদ্যমে চলছে। যেমন ঃ

(১) সাম্যবাদী বামফ্রন্ট নিপীড়িত, সর্বহারা ও পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবন-জীবিকার আর্থিক, কৃষি ও স্বাস্থ্যের সুরক্ষা ও উন্নতিসাধন, এ প্রসঙ্গে ভূমিসংস্কার ও পঞ্চায়েতী রাজ সম্প্রসারণ ;

(২) বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও সাক্ষরতা বৃদ্ধি ;

(৩) সর্বজনীন ফ্রি প্রাইমারী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে সুদৃঢ় করা ও ঐ ব্যবস্থায় সংস্কারসাধন ;

(৪) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ ;

(৫) মাতৃভাষা ও প্রধান প্রধান আঞ্চলিক ভাষাগুলোর যেমন উর্দু, নেপালীর মাধ্যমে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষাদানের সুযোগ বৃদ্ধি ;

(৬) বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত

শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারীদের চাকুরীর নিরাপত্তা দান ও সরকার থেকে মাসিক মাইনে প্রদান এবং চাকুরীঅন্তে অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা দান ;

(৭) ১৯৭৬ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধন করে প্রশাসনে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরী করা ;

(৮) প্রাথমিক শিক্ষা আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক ও অন্যান্য শিক্ষা পর্ষদকে নির্বাচনভিত্তিক গণতান্ত্রিক কাঠামোকে প্রসারিত করা ;

(৯) সর্বজনীন শিক্ষা — ডি পি ই পি, সর্বশিক্ষা ও অন্যান্য প্রকল্প/কার্যক্রম ঃ ইতিমধ্যেই বামফ্রন্ট সরকার ৩নং কার্যক্রমের এলাকাকে দ্বাদশশ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক বলে ঘোষণা করেছে। প্রতিশ্রুতির অনেক বেশি জনসাধারণ উপকৃত হয়েছে। মজুর, শ্রমিক, কৃষক ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের দারিদ্র্যক্লিষ্ট সাধারণ মানুষ দারুণভাবে উপকৃত হয়েছে। শিক্ষাকে তৃণমূল স্তরে পৌঁছানো, সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার ও তাদের ধরে রাখা ও বিদ্যালয়ছুটদের হার কমানো প্রভৃতি শিক্ষাসমস্যাকে প্রশমিত করা গেছে। উৎসাহদান নীতি হিসাবে এর কার্যকারিতা অনেক বেশি। সরকারের আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্যেও সাম্যবাদী সরকারের এটা ছিল অত্যন্ত সমাজদরদী পদক্ষেপ। বলা যায়, ঐ নীতির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসমষ্টির প্রায় ৬১ শতাংশ শিক্ষার ক্ষেত্রে উপকৃত হচ্ছে। বর্তমানে দ্বাদশশ্রেণি পর্যন্ত সকল শ্রেণির এবং সব আয়ের মানুষজন এই উপকার ভোগ করে থাকেন। একই ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে দ্বিপ্রহরিক ব্যবস্থা প্রশংসার দাবী রাখে। শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শিক্ষাকে সকলের কাছে পৌঁছে দিতে বামফ্রন্ট সরকার এভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এর ফলে প্রায় ১ কোটির অধিক ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয় অঙ্গনে ঢুকে পড়েছে। সর্বশিক্ষা অভিযানের সফল "স্কুল চলো" কর্মসূচি আরও সফলতার মাত্রা পেতে চলেছে। রাজ্যের আরও ২-৩ লাখ ছাত্রছাত্রীর বিদ্যালয়ে নিয়ে আসা খুব সত্বর সম্ভব হবে। পাশাপাশি SSK, MSK যাদের সংখ্যা প্রায় ১৫,০০০-এর কাছাকাছি গ্রামের বিদ্যালয়ে না আসা শিশুদের কাছে এক স্বর্গপ্রাপ্তি। আমি দেখেছি সারা পশ্চিমবাংলায় এই শিশুশিক্ষা ব্যবস্থা গ্রামে গ্রামে শিক্ষার এক নতুন হাওয়া তৈরী করেছে। জনসাধারণ সন্তুষ্টচিত্তে সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। পঞ্চায়েতের ভূমিকা এ প্রসঙ্গে খুব প্রশংসার্হ। নানা প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ কর্মসূচি ও তার সফল রূপায়ণ বাড়তি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জায়গা করে দিয়েছে। সর্বশিক্ষার নানান কর্মকাণ্ড কি গ্রাম ও শহর, কি সচল, কি বিকলাঙ্গ, কি বালিকা, কি বিশেষভাবে চাহিদাসম্পন্ন শিশু, কি বস্তিবাসী বালক-বালিকা — সবার কাছে আজ জ্ঞানের দরজা খুলে দিয়েছে। 'EFA' বা সকলের জন্য শিক্ষার যে কর্মসূচি বিশ্বসংস্থা গ্রহণ করেছিল পশ্চিমবাংলার জনদরদী ও সাম্যবাদী সরকার আদর্শগতভাবে তা বাস্তবে রূপদান করতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে ডি পি ই পি প্রকল্পে ১৯৯৮-৯৯ সাল থেকে শুরু হয়েছে স্কুল বাড়ি নির্মাণ, সর্বজনীন শিক্ষার আনুষঙ্গিক কাজকর্ম, বাড়তি শিক্ষক-শিক্ষিকার নিয়োগ ও তাদের শিক্ষাগত, গুণগত বৃদ্ধিকরণ, বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার-তৈরী করা প্রভৃতি শ্রেণিকক্ষে এক নতুনদিকের সূচনা করেছে। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে মোট দশটি জেলা এখন শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার তকমা মুছতে চলেছে। সর্বজনীন শিক্ষার এই বেগবান প্রচেষ্টাকে আরও নিবিড় ও তৃণমূল স্তরে পৌঁছে দিয়েছে সর্বশিক্ষা অভিযান। ২০০১-০২ সালের থেকে ঐ প্রকল্পে বিদ্যালয় বয়সী শিক্ষার্থীদের ২০১০ সালের মধ্যে প্রারম্ভিক স্তরে ভর্তি করা, লিঙ্গবৈষম্য দূর করা, কাম্য গুণগত শিক্ষাদানের সুযোগ প্রসারিত করা এবং ১০০ ভাগ শিশুদের বিদ্যালয়ে ২০১০ সালের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার প্রচেষ্টাকে রূপদান করা, সহজ ও ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে সহজপাঠ্য অথচ চিত্তাকর্ষক পাঠ্যপুস্তক তৈরী করা — সবকিছু আজ শিক্ষার পরিবেশকে নতুন গতি দান করেছে। সর্বত্র চলছে এক যুদ্ধকালীন তৎপরতা। পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়েছে ৮৬টির বেশি বিষয়ে। এবং বাংলা, হিন্দী, উর্দু, সাঁওতালী (অলচিকি লিপি), নেপালী, ইংরাজী ও আরবী ভাষায় যাদের সংখ্যা প্রায় ৫.৫০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। প্রতিটি পাঠ্যপুস্তকে ধর্মনিরপেক্ষভাবে তুলে ধরা হয়েছে সাধারণ মানুষের মর্মবেদনা, শোষণ ও সাধারণ চিত্র, জাতীয় সংহতির নানান দিক, ভারতীয় সংস্কৃতির উৎকর্ষতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনি, পরিবেশ, শান্তি, মানবিক অধিকার ও বিপর্যয় সংক্রান্ত বিষয় ও আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব, নানান মূল্যবোধ গঠনমুখী তথ্য এবং কৃষি, শিল্প, কর্মসংস্থান, সামাজিক পশ্চাদপদতার দূরীকরণ ও বিকাশশীল সমাজের নানা উপাদান সেখানে আলোচিত ও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সংখ্যালঘু নারীদের সমস্যা ও দুর্বলতম শ্রেণিদের উপরও ঐসব পাঠ্যপুস্তকে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ঐসব পাঠ্যপুস্তকের পঠন-পাঠন যাতে সুচারুভাবে ঘটে সেজন্য SCERT, DPEP, SSA, মাধ্যমিক পর্ষদ, মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়, শিশুশিক্ষা মিশন ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ শিক্ষক প্রশিক্ষণের নিবিড় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। লেখক

SCERT-এর অধিকর্তা থাকাকালীন এ ব্যাপারে বিভিন্ন পর্ষদের সহযোগিতায় সারা পশ্চিমবঙ্গে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। SOPT, OB Scheme, Micro Teaching, PMOST প্রভৃতি রাজ্যব্যাপী শিক্ষক শিক্ষণ প্রকল্পে এক নতুন জোয়ার সৃষ্টি হয় ফলে শিখন শেখানো প্রক্রিয়া আজ Joyful Learning, SLIP, ILIP স্তরে আরও নিবিড়ভাবে গুণগত মানকে বাস্তবে এক সার্থকতার স্তরে নিয়ে গেছে। চৈত্রসংক্রান্তির রঙে ও গানে যেমন গ্রামজগৎ মুখরিত হয়, আজ বাম জমানায় সর্বশিক্ষা প্রতিটি বাড়িকে বিশেষতর, মেহনতী ও দুর্বল দরিদ্র মানুষদের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট করেছে। আজ শিক্ষা কেবল বড়লোক কিংবা শিক্ষিত মহলে সীমাবদ্ধ নয়, মাটির ধূলোর সঙ্গে মিশে প্রকৃত জনশিক্ষা অভিযানে পরিণত হয়েছে। সরকার যেহেতু সাম্যবাদী, সেহেতু গ্রাম ও সাধারণ মানুষের শিক্ষাগত কল্যাণসাধনই প্রধান লক্ষ্য। কারণ ঐসব মানুষই পৃথিবীর সর্বত্র কি আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা কি দক্ষিণ গোলার্ধের সর্বত্র শোষিত হচ্ছে কিংবা শিক্ষা-স্বাস্থ্যে পিছিয়ে পড়েছে। মানুষের মনের মুক্তি, কুসংস্কার ও অপসংস্কৃতি কিংবা শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে গণচেতনার উন্মেষ সাধন গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষতার মূল আদর্শ ও দিকগুলির বিকাশ আজ প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বিশ্বত্রাসী, সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরাদের প্রশ্রয়ে ধাবিত বিশ্বায়ন ও উদারীকরণ নীতি ও সর্বগ্রাসী সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মানুষ ও শিক্ষিত সমাজকে সজাগ করতে প্রকৃত শিক্ষা কর্মসূচিও এই সরকারের শিক্ষাগত কর্মসূচি। আজ রবীন্দ্রমুক্ত বিদ্যালয় ও নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসূচির মাধ্যমেও দরিদ্র ও বঞ্চিত মানুষের ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রতি প্রাণের হাহাকারকে মেটাতে বহুলাংশে সফল হয়েছে। গ্রামের মানুষ হিসাবে দেখেছি ঐ ব্যবস্থাপনায় অগণিত ছাত্র-ছাত্রী এমনকি ৬৫ বছরের বৃদ্ধা পর্যন্ত শিক্ষার মধুপান করছে। আজ সব মিলিয়ে প্রারম্ভিক স্তরের নিম্নস্তরে GER প্রায় শতকরা ১০০ ভাগের কাছাকাছি এবং NER প্রায় ৯০ ভাগের অধিক।

শিক্ষার সম্প্রসারণ

বামফ্রন্ট আমলে এরাজ্যে ঘটেছে শিক্ষার চরম সম্প্রসারণ। কি প্রাথমিক-প্রারম্ভিক, কি মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক, কি উচ্চশিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, কি প্রযুক্তিবিদ্যা সর্বত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামস্তর পর্যন্ত সব ধরনের শিক্ষার সুযোগ কম বেশি পাওয়া যায়। ভূমিসংস্কার, সেচ ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির ফলে মানুষের যে আর্থিক সচ্ছলতা গ্রামে-গঞ্জে দেখা যায় তারফলে মানুষ আজ ভবিষ্যৎকে আরও ভালোভাবে দেখতে শিখেছে। নিম্নের পরিসংখ্যান বর্তমান সরকারের শিক্ষায় সার্বিক সাফল্য প্রমাণ করে।

	১৯৭৬-৭৭	২০০৪-০৫
প্রাথমিক বিদ্যালয় (শ্রেণি I–IV-V)	৪০,৯৪১	৫২,৪২৬
মাধ্যমিক বিদ্যালয় (শ্রেণি V-VI–X)	৭৮৭৪	১১৯৬৬ (মাধ্যমিক ও উঃমাঃ একত্রে)
উঃমাঃ বিদ্যালয় (শ্রেণি XI–XII)	৬৯৫	
কলেজ শিক্ষা	২২৫	৪৭৬
বিশ্ববিদ্যালয়	০৬	১৬
কারিগরী শিক্ষা	০৯	৬৭
ITI	১৮	
শিক্ষার্থীর সংখ্যা		
প্রাথমিক	৫০৪৩০৭৭	১০১২১৩৬২
মাধ্যমিক (মাদ্রাসাসমেত)	২৪৮৭৬৩২	৪৫৮৮৫৮
উচ্চমাধ্যমিক (মাদ্রাসাসমেত)	৬০৪২৯	৫৮৮২৭৪
কলেজ	১৭৫০০০	৭০১৯০ (কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় একত্রে)
বিশ্ববিদ্যালয়	২৪০০০	

(অশোক মিত্র কমিশন, Annual Reports (School & High Edn. Dept). উপরের চিত্র নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে বর্তমান সরকার সর্বক্ষেত্রে কতটা সাফল্য অর্জন করেছে। সবস্তরে বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী ও অন্যত্র সংখ্যাবৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে মাধ্যমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে উচ্চ-মাধ্যমিকে উন্নীতকরণ এবং এককভাবে উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন—স্কুল শিক্ষার সুযোগকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। তাছাড়া রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় শাখা ১৯৯৭ সাল থেকে (কার্যকরী ২০০১ সাল) ১০৭টি মাধ্যমিক ও ৩২টি উচ্চ-মাধ্যমিক (২০০২-০৩) Study Centre মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত মানুষের অভাবকে মেটাতে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে এরাজ্য এক নতুন নজীর সৃষ্টি করেছে। পঠন-পাঠন বিশ্ববিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক ও কলা বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রামীণ চর্চাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাণী সম্পদবিকাশ বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আইন বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নানাধরণের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে আজ পঃবাংলায় উচ্চ-শিক্ষার দ্বার খুলে গেছে। আজ কারিগরী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের

সংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ এরাজ্যের ছেলেমেয়েরা ভিন্‌রাজ্যে অত পাড়ি দেয় না বরং সারা ভারতবর্ষে এরাজ্যের ছেলেমেয়েরা কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছে। কলেজে বৃত্তিমূলক শিক্ষা শারীর শিক্ষা ও যুগপ্রয়োজনী নতুন নতুন বিজ্ঞান বিষয় সংযোজিত হয়েছে। মোট ৩৩১টি কলেজে অনার্স পঠন পাঠন, ৩৬০টি কলেজের ২৫৭টি কলেজে বিজ্ঞান পঠন পাঠন এবং ২০৭টি কলেজে কমার্স বা বাণিজ্য শাখার পঠনপাঠন চালু হয়েছে। মেয়েদের হোস্টেলের সুবিধাও বিস্তৃত হয়েছে। মোট ৭৬টি মেয়েদের কলেজের মধ্যে ৩৫টির মত কলেজে হোস্টেলের সুযোগ রয়েছে। নতুন বিষয়ের মধ্যে Bio-Chemistry, Computer Sciences, Micro Biology, Sericulture, Statistics, Electronics Psychology ও নানান বিষয়ের পঠনপাঠনের সুযোগ। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বৃত্তিমূলক শিক্ষা চালু রয়েছে প্রায় ১০০টির বেশি কলেজে যার মধ্যে Computer literacy, Office Management & Secretarial practice, Tax Procedure & Practice, Functional Higher: Communicative English, Industrial Fish & fishertes, Engineering, Mass Communication and is Geography, Advertisement Sales Promotion and Sales Management, Agro-Service প্রভৃতি বিষয়। আজকের কলেজীয় শিক্ষা সেদিক থেকে পঠনপাঠন বিষয়ে যেমন শিক্ষার্থীদের তৈরী করছে তেমনই বৃত্তিশিক্ষার মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর হবার সুযোগ সৃষ্টি করছে। এটা বামজমানার নতুন সৃষ্টি ও কর্মোদ্যোগের দিক। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে গবেষণা ও নতুন নতুন বিষয়ের (Emerging Subjects) উপর জোর দেওয়া হয়েছে। আধুনিক জগতের প্রয়োজন অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাস সাধন করা হয়েছে। বর্তমানে ৭৫.৬৩% সাধারণ ডিগ্রী কলেজ, কলা, সঙ্গীত ও গৃহবিজ্ঞান ৯.০৪%, কারিগরি ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রায় ১০%, পরিচালনা সংক্রান্ত ২.৫২% এবং আইন কলেজ প্রায় ২.৩১% শিক্ষার ক্ষেত্রকে পরিপুষ্ট করে। বৃত্তিদানও প্রসারিত হয়েছে যাতে মেধাবী ও গরীব ছাত্রছাত্রীরা উচ্চশিক্ষা পেতে পারে। মহসিন ট্রাষ্ট ফান্ডও কার্যকরী হয়েছে এ আমলে। শিক্ষার উন্নতিকল্পে বামফ্রন্ট সরকার বেশি জোর দেন প্রাথমিক ও বিদ্যালয় শিক্ষার উপর। রাজ্য বাজেটের প্রায় ৩০ শতাংশ অর্থ শিক্ষার উন্নতি ও উৎকর্ষতার জন্য রাজ্য সরকারের এই প্রচেষ্টা সারাভারতবর্ষে এক উল্লেখযোগ্য দিক। সর্বস্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সরকারী তহবিল থেকে মাইনে দান, অবসরকালীন সমস্ত সুযোগ-সুবিধা দান এবং চাকুরীর নিরাপত্তা দান বিষয়ে সারাভারতে এক দুর্লভ নজীর সৃষ্টি করেছে পঃবঙ্গ সরকার। সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতে এরাজ্য সারাভারতে এক অভূতপূর্ব উদাহরণ। State Bank Book ট্রাস্টের নেতৃত্বে ও বাংলা একাডেমির সহযোগিতায় মাতৃভাষায় পাঠ্য ও Reference পুস্তকগুলির রচনার উদ্যোগ সফল হয়েছে। কিছু কলেজকে যার Autonomous কিংবা Deemed University স্তরে উন্নীত করা হয়েছে যাতে পঠনপাঠনে নতুন বৈচিত্র্য, আধুনিকতা ও গুণগতমাত্রা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষক শিক্ষিকাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে CSC এবং SSC সৃষ্টিও চরম সার্থকতার স্বাক্ষর বহন করে। নিরপেক্ষভাবে ভালো শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ ব্যবস্থা পূর্বতন প্রাতিষ্ঠানিক কমিটি ভিত্তিক নানান দোষত্রুটি দূরীকরণে সক্ষম হয়েছে এবং সরকার এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন। সরকার একইসঙ্গে শিক্ষার নানান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মনোনীত সুপরামর্শ পাওয়ার উদ্দেশ্যে গঠন করেছে প্রাথমিকে ইংরেজী প্রবর্তন পবিত্র সরকার কমিটি, বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি, মাধ্যমিক উচ্চ-মাধ্যমিক পাঠ্যসূচি সমতুলতা কমিটি, মাদ্রাসা পঠন-পাঠনের উন্নতি বিষয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা কমিটি, সামগ্রিক শিক্ষাস্তরের জন্য ডঃ অশোক মিত্র কমিশন, উচ্চ-শিক্ষা বিষয়ে ডঃ ভবতোষ দত্ত কমিশন ও ডঃ রমেন্দ্র পোদ্দারের নেতৃত্বে গঠিত উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত প্রভৃতি। ঐসব কমিশন ও কমিটির সুপারিশগুলির উপর ভিত্তি করে শিক্ষার সর্বস্তরে নানান গঠনমূলক ও পঠনমূলক, পরিচালনা বিষয়ে নানা ইতিবাচক সরকারী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সার্বিক উন্নয়ন ব্যাপারে শিক্ষক সংগঠনগুলির যেমন ABTA, ABPTA, WBCUTA, AIFUCTO প্রভৃতি প্রশংসনীয় ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আজ প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি প্রায় ৩০০র বেশি বিদ্যালয়ে Computer শিক্ষা চালু হয়েছে। সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়ে ১০টি করে Computer সরবরাহ করা হয়েছে। সামাজিক মানুষের সংযুক্তি ও তাদের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করে শিক্ষাকে Society friendly করার উপর জোর পড়েছে। বোর্ডগুলির প্রশাসনিক পরিচালনায় নির্বাচনভিত্তিক হওয়ায়-শিক্ষাকে

আরও গণতন্ত্রীকরণ করা সম্ভব হয়েছে যা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। রাজ্যে বাণীপুর ও কল্যাণীতে শারীরশিক্ষা ও খেলাধূলার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে ICSE ও CBSCর অধীনে নতুন নতুন বিদ্যালয়কেও রাজ্য সরকার Noc দান করেছে যাতে সর্বশ্রেণির মানুষের শিক্ষার বিশেষ চাহিদা মেটে। IEDCর মাধ্যমে সাধারণ বিকলাঙ্গদের চাহিদা মেটাচ্ছে সরকার। রাজ্যদপ্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে এ বিষয়ে একটি দপ্তর। আবার বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও সৃষ্টি করা হয়েছে Deptt. of Women Studies, Institute of Advance Centres, Institute of Asian Studies, Netaji Subhas Open University এবং নানান নতুন শিক্ষার শাখা যা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকেও উৎকর্ষতার দিকে এবং গ্রামীণ মানুষের দরজায় পৌঁছে দিয়েছে। কারণ সরকার মনে করেন, শিক্ষাই আনে চেতনা এবং তার মাধ্যমেই ঘটে সমাজের নতুন সৃষ্টি ও উন্নয়ন। শিক্ষাই সমাজ, জাতি ও উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। কারিগরী ও প্রযুক্তি শিক্ষা আন্দোলনে এখন পশ্চিমবাংলা সারা ভারতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে সক্ষম হয়েছে। সল্টলেকে ও রাজারহাটে প্রযুক্তি ও শিল্প নগরীর পরিকল্পা এ রাজ্যকে এক নতুন মর্যাদায় উন্নীত করেছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সেদিক থেকে এক সফল যোদ্ধা ও নায়ক সন্দেহ নেই। সর্বভারতীয় স্তরে তিনি এখন জনপ্রিয়তার শিখরে। সরকারের কীর্তির আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো কলেজস্তরে স্নাতকোত্তর (P.G.level) বিষয়ের পঠনপাঠনের সম্প্রসারণ ও সুযোগ সৃষ্টি। এখনও পর্যন্ত প্রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১২টি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫টি এবং বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি — সর্বমোট ২৭টি কলেজে P.G.level বিভিন্ন বিষয়ের পঠন-পাঠনের সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে P.G.level শিক্ষার জন্য পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হয় না — বাড়ির পাশাপাশি জেলা শহরে সেই সুযোগ আছে, যা নিঃসন্দেহে উচ্চশিক্ষাকে কম খরচে শিক্ষার্থীদের ও সাধারণ মানুষের চাহিদাকে মেটাতে পেরেছে।

সংখ্যালঘু ও মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ এ রাজ্যের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ কিংবা তার কিছু অধিক অংশ সংখ্যালঘু মানুষ। সংবিধানের অধিকার মোতাবেক তারা নিজ সংস্কৃতি ও ধর্ম অনুযায়ী শিক্ষা পাওয়া ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠা করার অধিকারী। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানসম্মত ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতির সমর্থক। যেহেতু এ রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার সফল ব্যবস্থা রূপায়ণে নানা কর্মোদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। সরকার চান, সংখ্যালঘুদের যে ৫০৮টি মাদ্রাসা ও কলেজ রয়েছে সেখানে ধর্মশিক্ষা বজায় থাকুক, সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি ভাষা, ইতিহাস ও বিজ্ঞান, ভূগোল, অঙ্ক, পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ের বর্তমান যুগোপযোগী পাঠ্যসূচি চালু হোক। বর্তমানে সে উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে সংখ্যালঘু কমিটি ও মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংখ্যালঘু দপ্তর। মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষামূলক দেখভাল করেন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এবং তার সঙ্গে সহযোগিতার সেতু রচিত হয়েছে SCERT, SSA, DPEP, NICERT, NIEPA, COBSE, UNICEF, INTEL প্রভৃতি রাজ্যস্তর, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কল্যাণকারী সংস্থার সঙ্গে। আজ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ সারা ভারতে এক model হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং বিভিন্ন রাজ্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বর্তমান লেখক SCERT'র অধিকর্তা হিসাবে এবং পরে ঐ মাদ্রাসার সচিব হিসাবে মাদ্রাসা শিক্ষার মানকে উন্নীতকরণ, পাঠ্যপুস্তক রচনা, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির রূপায়ণ, UNICEF ও অন্যান্য দেশীয় স্তরের প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ ও মাদ্রাসার পঠনপাঠনে গুণগতমান বৃদ্ধিকরণ ও মাদ্রাসাগুলির সঙ্গে আরও খোলাখুলি সংযোগ বৃদ্ধি করা প্রভৃতি ব্যাপারে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। কি নিউ স্কীম, কি পুরাতন স্কীমভিত্তিক মাদ্রাসার সার্বিক উন্নয়নে সরকার যেভাবে সহযোগিতা করেছেন তা দুর্লভ। বর্তমানে প্রায় ৫০-এর বেশি হাই মাদ্রাসাকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। ৩০টির বেশি মাদ্রাসায় Computer সরবরাহ করা হয়েছে। পর্ষদকে স্বয়ংশাসিত করার সঙ্গে সভাপতিকে অন্যান্য পর্ষদের সমতুল পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন পর্ষদের পরিচালন কমিটির সদস্য করা হয়েছে। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ আজ শিক্ষা পর্ষদের সঙ্গে যোগাযোগের ভিত্তিতে মাদ্রাসা স্তরের শিক্ষাকে আরও কার্যকরী স্থানে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার উন্নয়নে রাজ্য সরকার এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছেন। বর্তমান লেখক ঐ সংস্থার পরিচালন সংস্থার সভাপতি। অতি সম্প্রতি ঐ মাদ্রাসার ২২৫ বছর পূর্তি আড়ম্বরের সঙ্গে পালন উপলক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর

উপস্থিতিওঝ কিছু উন্নয়নমূলক ঘোষণার মাধ্যমে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হলো। বস্তুত, ১৯১৫ সালের মাদ্রাসা শিক্ষার যে আধুনিকীকরণ শুরু হয়েছিল তার দ্বিতীয় ধাপ শুরু হয়েছিল এই সরকারের প্রচেষ্টায় ১৯৮১ সালে। যার মাধ্যমে মাদ্রাসার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মচারীরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঐ ধরনের চাকুরীজীবীদের মত চাকুরীকালীন ও অবসরকালীন সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা লাভ করেন। আলিম (মাধ্যমিক স্তর) স্তরের পাঠক্রমের আধুনিকীকরণ ঘটে এই স্তরের Certificate কে মাধ্যমিকের সমতুলতা দান করা হয়। আধুনিকীকরণ ও উৎকর্ষতার চরম শিখরে মাদ্রাসা শিক্ষা আজ স্বীকৃত। এ সবের শুরু ২০০০ সাল থেকে প্রাক্তন সভাপতি ডঃ আবদুস সাত্তার ও SCERT'র প্রাক্তন অধিকর্তা ও মাদ্রাসা পর্ষদের প্রাক্তন সচিব ও মাদ্রাসা পর্ষদের UNICEF প্রকল্পের প্রাক্তন অধিকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ রেফাতুল্লার যৌথ মিলন জুটির অক্লান্ত পরিশ্রম ও কর্মোদ্যোগের ফলে। কলিকাতা মাদ্রাসা সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ কলেজের ধর্মীয় শিক্ষাকে অটুট রেখে ডঃ এ আর কিদোয়াই কমিটির সুপারিশ ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে যৌথ পরামর্শভিত্তিক ঐ প্রতিষ্ঠানকে প্রথমে কলেজ ও পরে ডিম্‌ড বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উন্নীত করার পক্ষপাতী। ঐ কলেজে এই সর্বপ্রথম Computer শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহিলাদের ধর্ম বিষয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য মহিলাদের UG এবং PG স্তরে সকাল বিভাগে নতুন বিভাগ খোলা হয়েছে।

আজ অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার নানাস্তরে চলছে গঠন, পুনর্গঠন, নতুন নির্মাণ ও গুণগত উৎকর্ষতার দুর্দাম গতি। প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান, কারিগরী ও নানা ক্ষেত্রেও নতুন নতুন বিষয় ও গবেষণার ঢেউ কিংবা ইতিবাচক কর্মপ্রচেষ্টা। সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি থেকে মুক্ত হয়ে এ রাজ্য যাতে ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি, গণতান্ত্রিকতা, বিজ্ঞানচেতনা ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ বিকাশে দেশীয় স্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং সর্বোপরি, সাধারণ ও মেহনতী দরিদ্র মানুষের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের কল্যাণে শিক্ষাকে ইতিবাচক স্তরে উন্নীত করতে পারে তার নিরন্তর প্রয়াস চলছে। যুগধর্ম ও যুগের প্রয়োজনে সর্বস্তরে বিশেষত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরী প্রযুক্তি স্তরে পঠনপাঠন চলে তার দিকে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, তবে জনসাধারণের সংযুক্তিকে উপেক্ষা করে নয়। বলতে কোন দ্বিধা নেই পশ্চিমবঙ্গ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল নিদর্শন যেটা পূর্বতন কংগ্রেস আমলে অভাব ছিল। এই শান্তি ও সমৃদ্ধির আবহাওয়ায় আজ শিক্ষার নতুন চাহিদা ও বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। জাতপাতের দিক প্রায় নেই এখানে। শ্রেণিকক্ষ গমগম করছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও জনসাধারণ গুণগত শিক্ষার সদা সক্রিয় ও সচেষ্ট। সরকারের জনদরদী দৃষ্টিভঙ্গী মানুষের ঐ আশা আকাঙ্ক্ষা মেটাতে সদা বদ্ধপরিকর। সব মিলিয়ে শিক্ষার প্রসার, উন্নয়ন, উৎকর্ষতা, গবেষণা বিষয়ে এ রাজ্য ঈর্ষার পাত্র অন্যান্য রাজ্যের কাছে। তবে পাশাপাশি বয়স্ক নিরক্ষরতা দূরীকরণে সরকার ও বঙ্গীয় সাক্ষরতা মিশন শতকরা হারকে প্রায় ২৫ ভাগ বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং বহু জেলা পূর্ণ সাক্ষরতার মান লাভ করেছে। প্রায় ৭২ ভাগ মানুষ সাক্ষর হয়েছেন এ রাজ্যে। এখনও চলার ও করার কাজ অনেক বাকি। আত্মসন্তুষ্টির কোন জায়গা নেই। আগামী সপ্তম বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাক্ষেত্রে যে সার্বিক উন্নতি ঘটবে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিদ্যাসাগর, রামমোহন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ ও নজরুলের আদর্শে গড়ে ওঠা পশ্চিমবঙ্গে চলে এক স্বতন্ত্র শিক্ষা ও সংস্কৃতির পরিবেশ যা সারা ভারতে দুর্লভ। আগামী শিক্ষার উন্নতি রাজ্য সরকারের জনদরদী শিক্ষার নীতি ও মহাপুরুষদের আদর্শের যৌথ সংমিশ্রণে এগিয়ে যাবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার অনন্যতা

ডঃ আবদুস সাত্তার

১৭৮০ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম সরকারীভাবে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার পত্তন করেন। সাধারণভাবে এই মাদ্রাসা শিক্ষাকে বলা হয় মাদ্রাসা-ই-আলিয়া। এই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়ে মুসলমানদের প্রশাসনিক এবং বিচারের কাজে উপযুক্ত করে তোলাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮২৬ সালে ভারতের ডাক্তারী শিক্ষাব্যবস্থার সর্বপ্রথম প্রচলন শুরু হয় কলকাতা মাদ্রাসায়। ১৯১৫ সালে এই মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার প্রাচীন ধারার সঙ্গে নতুন ধারার সংযোজন ঘটে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে এক অনন্যনজির হিসাবে আজও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা। একবিংশ শতাব্দীর চাহিদানুযায়ী সংস্কারের পথে যে পরিবর্তন এসেছে তথ্যপ্রযুক্তি এবং আধুনিক চিন্তন ও মননে, মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাও তারই অনুপন্থী।

'মাদ্রাসা' শব্দটি একটি আরবী শব্দ, যার অর্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বিদ্যালয়। যেখানে ধর্ম, লিঙ্গ, জাতপাত নির্বিশেষে সকল ছাত্রছাত্রীকে শিক্ষা প্রদান করা হয়। সংবিধানে প্রণীত সাম্য, স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের নীতিগুলি পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পশ্চিমবঙ্গই হল একমাত্র রাজ্য যেখানে মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক। ২৮ জুন, ১৯৯৪ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় West Bengal Board of Madrasah Education Act, 1994 পাশ করার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া হয়। এই আইনের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য শিক্ষা পর্ষদ/কাউন্সিলের সমমান ও সুযোগ সুবিধা মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদকে দেওয়া হয়েছে। এই পর্ষদের ক্ষমতা আছে সকল অনুমোদিত হাই, জুনিয়র হাই ও সিনিয়র মাদ্রাসাকে সময়োপযোগী শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করার।

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন ঃ

মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি

বর্তমানে মোট মাদ্রাসার সংখ্যা ৫০৮। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতাসীন হওয়ার পর আজ অবধি ২৭০টি মাদ্রাসাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বাজেট বৃদ্ধি

১৯৭৭ সালে বাজেট ছিল ৫·৬০ লক্ষ টাকা।

২০০৬ সালে তা বেড়ে হয় ১২৫ কোটি টাকা।

প্রায় ২২৩২ গুণ বাজেট বৃদ্ধি করা হয়েছে।

★ অন্যদিকে, মাদ্রাসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট ৮৩·৯২ কোটি টাকা।

শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৭৭ সালে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ছিল ১১২৫জন।

২০০৬ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯২৯৮ জন।

★ মোট বৃদ্ধির পরিমাণ ৮,১৭৩ জন।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ নিয়োগ, বেতন, ভাতা ও অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবেন।

বহিঃপরীক্ষায় (মাধ্যমিক স্তর) পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি

১৯৭৭ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৪,০২৩ জন।

২০০৬ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৭,৭১৮ জন।

● মোট বৃদ্ধি হয়েছে ২৩,৬৯৫ জন।

মোট ছাত্রছাত্রী

বর্তমানে মাদ্রাসায় মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩,৬১,৯১৫ জন।

● তার মধ্যে অ-মুসলিম ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাদ্রাসায় ৪% এবং জুনিয়র হাই মাদ্রাসায় ৮%, যা অন্যান্য কোনো জায়গায় লক্ষ্য করা যায় না।

উন্নীতকরণ

● ৪২টি জুনিয়র হাই মাদ্রাসাকে এই বছরে হাই মাদ্রাসাতে উন্নীতকরণের জন্য তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮টি জুনিয়র হাই উন্নীতকরণের অনুমোদন লাভ করেছে।

● ১৯৭৭-এর পূর্বে একটিও মাদ্রাসা উচ্চমাধ্যমিক ছিল না। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের অধীনে উন্নীতকরণ করা হয়েছে ৫০টি হাই মাদ্রাসাকে।

কম্পিউটার শিক্ষার অন্তর্ভুক্তিকরণ

● ৩৩টি হাই মাদ্রাসাকে কম্পিউটার শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বেশি সংখ্যক মাদ্রাসাকে আনা হবে।

● একুশ শতকের মূল লক্ষ্যে পৌঁছোনোর ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা ও সকল ধরনের প্রশিক্ষণই হল উন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। তাই এই ধরনের আধুনিক প্রযুক্তিসমন্বিত শিক্ষার চাহিদা মেটাতে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ 'Intel' অথবা IIIM-এর মতো সংস্থার সহযোগিতায় মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করেছে। যাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই সকল শিক্ষক মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের আগামীদিনে প্রযুক্তিবিদ্যা মেটাতে পারেন।

সমমর্যাদা

● মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের শিক্ষা পর্ষদের মতো সমমর্যাদা প্রদান।

ভবন নির্মাণ

● বিধাননগরে ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পর্ষদের অত্যাধুনিক মূল প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। ভবনটি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নামে চিহ্নিত।

পাঠ্যপুস্তক

● আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রথম প্রজন্মের মাদ্রাসা পড়ুয়াদের জন্য বাজার থেকে ১/২ গুণ কম দামে বই সরবরাহ করা হচ্ছে।

● সিনিয়র মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাথমিক বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের আরবী পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য পাঠ্যপুস্তকেরও সুবিধা প্রদান।

অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান

● ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য মিড ডে মিলের ব্যবস্থা, পঞ্চায়েত দপ্তরের সাহায্যে পরিশ্রুত পানীয় জল ও নিষ্কাশনী ব্যবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আধুনিকীকরণ

● মাদ্রাসা শিক্ষার ঐতিহ্যকে বজায় রেখে সমস্ত স্তরের মাদ্রাসায় আধুনিকীকরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ক. মাদ্রাসায় বিদ্যালয়ের মতোই আধুনিক পঠন-পাঠন, পরিচালনা পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতি।

খ. একমাত্র ইন্দোনেশিয়া ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে কিংবা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা মাদ্রাসায় স্থানান্তরিত হয়ে পড়াশুনা করতে পারে না ; যা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের অনুমোদিত মাদ্রাসাতেই সম্ভব।

গ. এখানকার অনুমোদিত মাদ্রাসাতেই অ-মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠন, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের চাকুরিকরণ, পরিচালন ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা আছে।

ঘ. মাদ্রাসাতেও বিদ্যালয়ের মতোই সমযোগ্যতাপূর্ণ ও একই বেতনভাতা, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা, সর্বোপরি, বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগের সুপারিশক্রমে একই প্যানেল থেকে শিক্ষক নিয়োগ, এমনকি আরবী ভাষা ও ধর্মতত্ত্বের শিক্ষক নিয়োগও করা হয়।

ঙ. জাষ্টিস আমীর আলি, নবাব আবদুল, লতিফ থেকে শুরু করে জাষ্টিস কে এম ইউসুফ, সরকারী বহু আমলা, অধ্যাপক, সংস্থার অধিকর্তা ও মাদ্রাসা শিক্ষার আলোকে আলোকিত। বহু ছাত্র-ছাত্রী শুধু দেশেই নয়, বিদেশেও কর্মরত তথা গবেষণারত।

চ. এমনকি মাদ্রাসায় গড় ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কোনো অংশেই কম নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশিই।

ছ. জাতীয় স্তরে পর্ষদ প্রদত্ত শংসাপত্রের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

SSA/DPEP প্রকল্প

● মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার গুণগত মানোন্নয়নে মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রারম্ভিক শিক্ষা উন্নয়ন সংস্থার অধীনে SSA / DPEP প্রকল্পের সহায়তায় বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের উপর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তার জন্য অভিমুখীকরণ কর্মশালার আয়োজন করা।

● এই প্রকল্পের থেকে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তায় মাদ্রাসাগুলির বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নের কাজ যেমন বাড়িঘর নির্মাণ, লাইব্রেরীর জন্য অনুদান প্রভৃতি সম্পন্ন হয়।

● এমনকি এই প্রকল্পের সহায়তায় পাঠ্যপুস্তক রচনার ও প্রস্তুতিকরণ করা হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষার সামাজিকীকরণ

ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশে শারীরিক, মানসিক, নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ উৎকর্ষ বৃদ্ধির প্রকাশ। স্বাধীনতা ভোগ ও দায়িত্ববোধের উপর সামাজিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। তাই শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও চরিত্রগঠনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও জনসচেতনতামূলক কাজে লিপ্ত করার উদ্দেশ্যে ইউনিসেফের সহযোগিতায় মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ পোলিও রোগ নির্মূলীকরণ ও নিয়মিত টিকাকরণ প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হয়ে মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পরিচালক সমিতির সদস্য, মৌলবীগণ, প্রশাসনিক তথা সমাজের

সর্বস্তরের জনগণকে এই মহান কর্মযজ্ঞে সামিল করেছে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে পর্ষদের সম্মান

- Council of Boards of School Education in India (COBSE)'র সদস্যপদ লাভ।
- NCERT, NIEPA, NCPUL-এর মতো সর্বভারতীয় শিক্ষা সংগঠনের অনুমোদন লাভ।
- পশ্চিমবঙ্গের মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদকে 'মডেল' রূপে গণ্য করা।
- ইউনিসেফের আর্থিক সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গকে পোলিও-মুক্ত করতে মাদ্রাসাগুলির দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা বিশ্বে নজিরবিহীন।

কলকাতা মাদ্রাসা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নে ৫ই মার্চ, ২০০১-এ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বর্তমানে হরিয়ানার মাননীয় রাজ্যপাল ডঃ এ আর কিদোয়াই-এর নেতৃত্বে সাত সদস্যের কমিটি গঠন করে। ৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০০২-এ কমিটি তার প্রতিবেদন পেশ করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেই প্রতিবেদন ৩০শে জুলাই ২০০৩-এ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পেশ করে।

জমিয়ত উলামা-বাংলা, ফুরফুরা মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্র সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার পর সরকারের কাছে তাঁদের মতামত পেশ করে। সেখানে কলকাতা মাদ্রাসা ও সিনিয়র মাদ্রাসার সিলেবাস সংক্রান্ত বিষয়ে জমিয়ত কিদোয়াই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সিলেবাস প্রণয়ন করে সরকারের কাছে সুপারিশ করে বাস্তবায়িত করার। সরকার জমিয়তের সুপারিশকে মান্যতা-দান করে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

- কলকাতা মাদ্রাসা ভারতের প্রথম সরকারী প্রতিষ্ঠান-রূপে ২২৫ বছরে পদার্পণ করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতিকে সভাধ্যক্ষ করে ২২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে। উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহোদয়।
- এতোদিন কলকাতা মাদ্রাসা উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যালয় শিক্ষাবিভাগের দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় ছিল। এখন থেকে উচ্চশিক্ষার আয়ত্বাধীন হবে।
- কলকাতা মাদ্রাসাকে 'কলেজ'-রূপে স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। সমস্ত শিক্ষক পদকে অধ্যাপক পদে উন্নীত করা হচ্ছে। নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়নে কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যাপক পদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা হবে।
- ফাজিল, কামিল ও এম এম-কে যথাক্রমে উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর-এর সমতুল বলে ঘোষণা করার জন্য বোর্ড অফ স্টাডিজ সরকার গঠন করেছেন ডি পি আই-এর নেতৃত্বে।
- এরপর থেকে কলকাতা মাদ্রাসা সহ বেলডাঙা, বাটনা ও ফুরফুরা সিনিয়র মাদ্রাসার কামিল ও এম এম ডিগ্রি প্রদান করবে ডি পি আই, উচ্চশিক্ষা দপ্তর ও কলকাতা মাদ্রাসা কলেজ ; পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ নয়।
- ইলিয়ট হোস্টেলকে পুনরায় মৌলানা আজাদ কলেজ থেকে কলকাতা মাদ্রাসার তত্ত্বাবধানে আনা হচ্ছে।
- কলকাতা মাদ্রাসা কলেজ-রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে, স্বভাবতই তার স্থানাভাব হবে। সেই কথা ভেবে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর অ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র ভবন নির্মাণের ব্যবস্থা করেছে। সেই অনুযায়ী বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নতুন ভবনের শিলান্যাস করেন। ভবন নির্মাণের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।
- কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত পঠনকেন্দ্র অনুমোদিত হয়েছে। অবিলম্বে তার সূচনা হবে।
- স্নাতক স্তরে কম্পিউটার শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির কারণে Computer Centre-এর উদ্বোধন করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ এই Computer Centreটি তৈরি করে দিয়েছে।
- ঐতিহ্যবাহী কলকাতা মাদ্রাসার চলমান ইতিহাস সম্পর্কে সকলকে জ্ঞাত করতে কলকাতা মাদ্রাসার নিজস্ব ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।
- ২২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে স্যুভেনির ও মেমেন্টো প্রকাশ করা হয়েছে।

পাকিস্তানের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পারভেজ মুশারফ মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারসাধনে আজ যা বলেছেন বা করতে চাইছেন, তা অখন্ড বলে বামফ্রন্ট সরকার বহু পূর্বে তা বাস্তবায়িত করেছে।

'অন্ধজনে দেহ আলো' ঃ শালপিয়ালের দেশে ঐ আলো কতখানি পৌঁছাল, তার কিঞ্চিৎ খতিয়ান

অরুণ চৌধুরী

পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্টের ত্রিশ বছরের শাসনকালে লেখাপড়ার ব্যাপারটা নাকি গোল্লায় গিয়েছে। আহা! স্বাধীনতার পরে এরাজ্যে কংগ্রেস দল একটানা কুড়ি বছর শাসন করেছে। প্রথমে রাজ্য সরকারের কর্ণধার ছিলেন অভয় আশ্রম-এর ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ। ধপধপে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবি পরিধানে বেঁটেখাটো কালো মানুষটি। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল এককালে, তারপর স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ করলেন। গান্ধীজীর অহিংস মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে স্বদেশ সেবা-ব্রতী হন। তাঁর রাজত্বকাল ছিল আগস্টের পনেরো (১৯৪৭) থেকে জানুয়ারির ২৯শে পর্যন্ত (১৯৪৮)। বিড়লাজির অনুরোধে গান্ধীজী শিষ্যকে সরিয়ে রাজ্যের সরকারী দায়িত্বে বসালেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে, প্রখ্যাত চিকিৎসক। প্রফুল্ল ঘোষ শিক্ষা নিয়ে বিশেষ ভাবনাচিন্তা করেননি। তবে, তিনি রবীন্দ্র- ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত করেছিলেন। বাংলা ভাষার বিষয়ে ভাবনা করার জন্য রাজশেখর বসুকে শিরোমণি করে এক 'ভাষা সংস্কার কমিটি' তৈরি করেছিলেন।

বিধানবাবু রাজ্যের কর্ণধার ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। তারিখটা হলো, তাঁর কড়া হাতের শাসনের ঠেলায় বীণাপাণির অবস্থার বিশেষ কোনো উন্নতি হলো না। প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার কমিটি করলেন। কিন্তু তা আঁতুড়ঘরেই মরে গেল বা জীবন্মৃত হয়ে রইল। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মুদালিয়র কমিশন গঠন করলেন কিন্তু ডঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রের সুপারিশের এক হাঁসজারু শিক্ষাব্যবস্থা চালু করলেন। শিক্ষকরা 'বুনো রামনাথে'র মতো তিন্দিড়ি পাতার ঝোল খেয়ে পরিতৃপ্ত নন। যুদ্ধের সময় থেকে বাজারে আগুন লেগেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তর, কালোবাজারি ও সর্বক্ষেত্রে মুনাফাবাজদের কালো লোমশ হাতের থাবা, তারপর হিন্দু পুঁজিপতিদের ও জমিদারদের স্বার্থরক্ষাকারী তথা পাহারাদার কংগ্রেস ধর্মের ভিত্তিতে দেশের বুকে মুসলিম লীগের হাতে হাত মিলিয়ে ধারালো ছুরি বসাল। লাখ লাখ উদ্বাস্তুর স্রোত এলো খণ্ডিত নবজাত পশ্চিমবাংলায়। আবার কয়েক হাজার মুসলিম পরিবার গেল নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত পূর্ব পাকিস্তানে। একটা নাকি 'হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দেশ'। আরেকটা মুসলিমদের। ভাগ হল কৃত্তিবাস আলওয়াল-মাইকেল মধুসূদন-দীনবন্ধু মিত্র-বঙ্কিমচন্দ্র-মীর মোশারফ হোসেন, কায়কোবাদ-রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-জীবনানন্দ-সুকান্ত ভট্টাচার্য-বিভূতিভূষণ, শৈলজানন্দ-তারাশঙ্কর-রমেশচন্দ্র সেন-অদ্বৈত মল্লবর্মণ-দীনেশচন্দ্র সেন- দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার-উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের বরেণ্য সন্তানদের বাংলা।

ভাগ হল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-আবদুল্লা রসুল-অশ্বিনী কুমার দত্ত-বাঘাযতীন-বিপিনচন্দ্র পাল-দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-ফজলুল হক-সুভাষচন্দ্র-মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-আবদুল হালিম-গোপীনাথ সাহা-সূর্য সেন-মণি সিং-রেবতী বর্মণ-সোমনাথ লাহিড়ী-রতনলাল ব্রাহ্মণ-রূপনারায়ণ রায়-এর বাংলা বিভক্ত হল। বিভক্ত হল তেভাগার গৌরবময় সংগ্রামের ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বাংলা।

তার পরিণতিতে বিপর্যস্ত হল বাংলার দুই খন্ড। তবে উদ্বাস্তুর স্রোত তুলনামূলক ভাবে বেশি হল এই বাংলায়। কত শিক্ষাব্রতী ও তাঁদের পরিবার ভিড় করল এখানে। তাদের যে শিক্ষার সুযোগ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম নগরে, তার অভাব ঘটল দারুণভাবে।

নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যে শিক্ষার হারও কম। স্মরণীয় যে তখন সারাভারতেই শিক্ষার হার ছিল মাত্র শতকরা দশ। তাও নারীদের মধ্যে আরও কম।

এখানে যে শিক্ষকসমাজ দীপায়নের দায়িত্ব পালন করছিলেন, তাঁদের কথা লিখেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সন্দীপন পাঠশালা'য়। তাঁদের চরম দুর্গতির ছবি এঁকেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অনুবর্তন' নামক উপন্যাসে। গল্প লিখেছেন দুর্ভিক্ষপীড়িত দুর্দশাগ্রস্ত প্রাথমিক শিক্ষক পরিবার নিয়ে। আশরাফ সিদ্দিকি লিখেছেন তালসোনাপুরের তালের মাষ্টারের জীবন নিয়ে কবিতা।

শিক্ষা যে জাতীয় জীবনের অগ্রগতির সর্বশ্রেষ্ঠ উপাদান সে কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩০ সনে সমাজতান্ত্রিক

সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি লিখলেন যে ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়েছে ওরা শিক্ষার জোরে।

কিন্তু এদেশের রাষ্ট্রনায়করা তাঁরা আদৌ বুঝলেন না। অথবা বুঝেও অন্যপথ ধরলেন। বড়লোকদের সমৃদ্ধ করা, তাদের স্বার্থরক্ষার পথ। এককথায় এদেশে ধনতন্ত্র গড়ে তোলার পথ।

তাই দেখা যায়, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দুই বছর পরে নিজেদের দেশকে বহু রক্তের বিনিময়ে মুক্ত করল যে চীনের জনগণ, তাঁদের দেশে এখন শিক্ষিত মানুষের হার পঁচানব্বুই ছাড়িয়েছে। আর ভারতে শতকরা বাষট্টি।

এর কারণ রাজনৈতিক। তাই দেখা গেল নিরঙ্কুশভাবে বিশ বছর পশ্চিমবাংলায় তিনজন কংগ্রেস দলীয় মুখ্যমন্ত্রীর, যাঁদের দুইজনের কথা আগে উল্লেখ করেছি, তৃতীয় জন হলেন প্রফুল্লচন্দ্র সেন। নেতৃত্ব কংগ্রেস সরকার রাজ্যশাসন করলেও শিক্ষার দুর্গতি মোচন হল না। শিক্ষায়তনের অঙ্গনে জ্ঞানের দীপ যাঁরা জ্বালান ১৯৫৪ সনে বারোদিন সংগ্রাম করার পর সাতটি প্রাণের বিনিময়ে সাড়ে সাত টাকা মহার্ঘভাতা পেলেন পশ্চিমবাংলার শিক্ষক সমাজ। তাও শর্তাধীনে।

তারপরও চুয়ান্ন থেকে সাতষট্টি, বহু সংগ্রামের কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করেছেন এরাজ্যের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সংগ্রামী শিক্ষক সমাজ। শত শত শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী কারাবরণ করেছেন। ভারতরক্ষা আইনে বিনাবিচারে বন্দীজীবন যাপন করেছেন। অবশেষে দুর্যোগের কালোরাত্রি ভোর হল। এরাজ্যের বহু সংগ্রামের ঐতিহ্যের গৌরবমন্ডিত কংগ্রেসকে পরাস্ত করে কায়েম করলেন প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার।

শিক্ষা ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজের দুর্গতিমোচনের শুভ সূচনা হল। এরপরে বহু সংগ্রাম — সত্তরের দশকের আধা-ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস, কমরেড সন্তোষ ভট্টাচার্য ও কমরেড বিমল দাশগুপ্ত সহ বাইশ জন শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর জীবনের বিনিময়ে নতুন যুগের দরজা খুলল। সেদিন সহস্রাধিক শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীকে বিদ্যালয়গুলি থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। এলাকা-ছাড়াও হয়েছিলেন তাঁরা। তবু, অন্ধকার যখন চিরস্থায়ী হতে পারে না, নিশীথের পরে আসে ভোরের ইঙ্গিত। তাই এলো।

এই পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে লেখাপড়ার দিকটা নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাচ্ছি। তবে, আমার ঐ আলোচনার লক্ষ্মণরেখা রাজ্যের একটি পিছিয়ে পড়া জেলার মধ্যেই আবদ্ধ রাখব। জেলার নাম বীরভূম। ১৯৮১ সনে এ জেলায় সাক্ষর নরনারীর সংখ্যা ছিল ৪২·৫৮% ২০০১ সনে তা বেড়ে হয়েছে ৬২·১৬%। বিশ বছরে বৃদ্ধির হার ১৯·৫৮%।

ব্লকওয়ারি হিসাবটাও এসাথে দেওয়া হল — সারণি 'ক'। তাতে দেখা যাচ্ছে যে সব থানায় সমানতালে এগোয়নি। ঐ বৃদ্ধির পিছনে অনেকগুলি বিষয় কার্যকরী থাকে। যেমন, যেখানকার অধিবাসীদের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থা, সেখানকার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার রাজনৈতিক পরিচয়। জনগণের উদ্যোগ ও সেই উদ্যোগ সৃষ্টিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও সরকারী প্রশাসনিক সহায়তা। ঐ এলাকার জনগণের মাথাপিছু আয়। এলাকায় ভূমিসংস্কারের অবস্থা — এইসবও গণ্য।

সর্বোপরি, ঐ এলাকায় রাজনৈতিক প্রভাব কোন্ রাজনৈতিক দলের তাও দখতে হবে। বামফ্রন্ট বিরোধীদের প্রভাব বেশি হলে, পঞ্চায়েতগুলোতে আনুপাতিক হারে বামফ্রন্ট বিরোধীদের আধিপত্য বেশি থাকলে, বামফ্রন্ট সরকার কায়েম হবার পূর্ববর্তী আর্থ-সামাজিক পশ্চাদ্‌পদতা, নিরক্ষরতার হার তুলনামূলক ভাবে বেশি থাকলে তার প্রভাবও অনিবার্যভাবে পড়তে বাধ্য। কার্যত পড়েছেও। অন্যদিকে বামফ্রন্টের রাজনৈতিক শক্তি যদি এলাকায় বেশি হয়, তাহলে পঞ্চায়েতগুলোর কার্যকারিতা, তার গতিশীলতা, পরিচ্ছন্নতা ও জনমুখীনতা তুলনামূলকভাবে বেশি হওয়ায় সেখানে উন্নয়নের গতি বেশি। আর উন্নয়নের অন্যতম দিক যে শিক্ষা তারও অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে বেশি।

সারণি 'ক'-কে সামনে রেখে তার সাংখ্যিক হিসাবে চোখ বুলালে দেখা যায় যে মুরারই-১ ও ২নং ব্লকের শিক্ষার অগ্রগতি, সাক্ষরতার অগ্রগতি সিউড়ি -১নং, ২নং ইলামবাজার-বোলপুর-শান্তিনিকেতনের চেয়ে তুলনায় বেশ পিছিয়ে আছে। প্রথমোক্ত ব্লকগুলিতে সাক্ষরতার অগ্রগতি জেলার সামগ্রিক অগ্রগতির বৃদ্ধির হার যেখানে ১৯·৫৮%, সেখানে মুরারই ১নং ও ২নং ব্লকের সাক্ষরতার বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৬·০৮% ও ১৬·৪৮%। কিন্তু শেষোক্ত ব্লকগুলিতে সাক্ষরতার বৃদ্ধির হার জেলার হারের সাথে তুলনামূলকভাবে বেশি। যেমন, সিউড়ি ১নং ও ২নং ব্লকের সাংখ্যিক হার যথাক্রমে ২১·৭২% ও ২নং-এ ২৩·০২%। ঐ রকমই ইলামবাজারে ২২·৪০%, বোলপুর-শ্রীনিকেতনে ২২·৫১%।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যানেও দেখা যাবে একই অবস্থা। মুরারই ১নং ও ২নং ব্লকে জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি। কিন্তু সেখানেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৭৮ (১৯৭৮-এর মার্চে বিদ্যালয় তদর্থক কমিটি দায়িত্ব নিয়েছিল। ঘটনাচক্রে বর্তমান লেখকই এগারো বছর ১৯৮৯ সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব বহন করেছেন)-এর

আগে জেলার অন্যান্য অংশের সাথে তুলনামূলকভাবে খুবই কম ছিল। এই মুহূর্তে সেদিনের অবস্থার সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাব আমার হাতের কাছে না থাকায় তা তুলে ধরতে পারলাম না। কিন্তু ঐ দুই ব্লকে যে সাক্ষরতার হার আজও কম, তার ঐ ঘটনারই পরিণতি। মুরারই ১নং ব্লকে আবার নারীদের সাক্ষরতার হার ১৯৮১ সনে ছিল মাত্র ১৫·২৫%। ২০০১-এ ঐ ঘাটতি কিছুটা পূর্ণ হয়েছে। ঐ সময়ে ঐ হার দাঁড়িয়েছে ৩৭·৬%, বৃদ্ধির হার ২১·৩৫%। স্বাধীনতার পরবর্তী ৪৪ বছরের যে হার তারচেয়েও বেশি বেড়েছে বামফ্রন্ট সরকারের কুড়ি বছরে।

নলহাটি ২নং ব্লকের নারীশিক্ষার হার ছিল ১৯৮১-তে ২০·৬৫%। ২০০১ সনে তা উন্নীত হয়েছে, ৫২·৭%। বৃদ্ধির হার ৩১·০৫%।

রামপুরহাট ১নং ও ২নং-এ নারীশিক্ষার হার ১৯৮১-তে ছিল যথাক্রমে ২৫·০২% এবং ২৫·৬১%। ২০০১ সনে তা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫১·৩% এবং ৫৩·২%-এ। বিশ বছরে বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ২৫·৭৮% এবং ২৭·৫৯%।

পূর্বোক্ত পাঁচটি ব্লকে জনসংখ্যা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের গরিষ্ঠতা বর্তমান। তাঁদের আর্থ-সামাজিক পশ্চাদ্‌পদতা ঐ সব ব্লকে কাজ করেছে। ভূমিসংস্কারও ঐ পাঁচটি ব্লকে আনুপাতিক হারে কম হয়েছে। মুরারই ১নং ও ২নং ব্লকে কংগ্রেসের নেতাদের হাতে এখনও অনেক জমি রয়ে গেছে। তাঁদের মধ্যে একজন ১৯৭২ সন থেকে ২০০১ সনের আগে পর্যন্ত একটানা বিধায়ক ছিলেন। সত্তরের দশকে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। আরেক পরিবারের একজন বীরভূম লোকসভার আসনে একাধিকবার কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। প্রথম ব্যক্তির নাম ডাঃ মোতাহার হোসেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম বৃন্দাবন সাহা। মামলা-মোকদ্দমা করে ঐসব জমি এখনও তাঁরা ভোগ করছেন। ১নং ব্লকের চাতরার বিশ্বাস পরিবারও কংগ্রেসের স্থানীয় নেতা। ঐ পরিবারের হাতে এখনও সিলিংবহির্ভূত কয়েকশ বিঘা জমি আছে।

বর্গাদারদের নথিভুক্তি বা রেকর্ডও এখানে জেলার অন্যান্য অংশের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম। এরও প্রভাব পড়েছে জনসমষ্টির আর্থ-সামাজিক অবস্থায়। পঞ্চায়েতেও কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস প্রভৃতির প্রভাব রয়েছে। মুরারই ১নং ও ২নং ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতিতে একটানা না হলেও কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকেছে। আর সমাজের কর্তৃত্বও অনেকাংশে এখনও গ্রামের সামন্ততান্ত্রিক শক্তির হাতে। এই দুই এলাকায় ক্রাইমের সংখ্যাও জেলায় শীর্ষস্থানীয়। এরই মধ্যে দাঁড়িয়ে বামফ্রন্ট সরকার যে অশিক্ষার অন্ধকার দূরীকরণে বিশেষত নারীসমাজের মধ্যে জ্ঞানের আলো অনেকখানি পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে, এই বার্তা নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। এই দুই ব্লকে এখন স্কুলবিহীন গ্রাম নেই আর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষাকেন্দ্র দিয়ে অতীতের ঘাটতি পূরণ করা অনেকাংশে সম্ভবপর হয়েছে। রুদ্ধ দুয়ার খুলেছে। প্রভাত রবির কিরণ পৌঁছাতে সুরু করেছে।

মহম্মদবাজার ব্লকে জনসংখ্যার প্রায় বিশভাগ উপজাতীয়, তাছাড়া আছেন তপশীলভুক্ত জাতির নরনারীরা। তাঁদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে সাক্ষরতার হার কমছিল, বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লক যেখানে রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বভারতী' অবস্থিত, সেখানেও জনসংখ্যার শতকরা কুড়িভাগের কিছু বেশি সাঁওতাল উপজাতির মানুষরা বাসিন্দা। তাছাড়া তপশীলভুক্ত জাতির মানুষরাও আছেন। যেমন মহম্মদবাজার ব্লকে মোট জনসংখ্যা (১৯৯১ সনের হিসাবে) ১,১৬,৩১৯। তাতে মোট তপশীল জাতির জনসংখ্যা ৩২,৮৮৪ জন। আর উপজাতি ২৩,২১০ জন। দুই-এ মিলিয়ে ৫৬,০৯৪ জন। বোলপুর- শ্রীনিকেতন ব্লকের জনসংখ্যা (১৯৯১) ১,৫২,০৪৮। তাতে তপশীলভুক্ত জাতির জনসংখ্যা (১৯৯১) ১,৫২,০৪৮। তাতে তপশীলভুক্ত জাতির জনসংখ্যা ৪৬,৬৫৫। আর উপজাতীয় জনসংখ্যা ২৯,০৪৩।

১৯৮১-তে মহম্মদবাজারে সাক্ষরতার হার ছিল মোট ২৯.০৪%। ২০০১ সনে ৫৫.১০%। বৃদ্ধির হার ২৬.০৬% আর বোলপুর-শ্রীনিকেতন ব্লকে সাক্ষরতার হার ১৯৮১ সনে ৩১.৬১%। ২০০১ সনে তা হয়েছে ৬০%। বৃদ্ধির হার ২৮.৩৯%। আর উদারহণ বাড়াচ্ছি না।

এবার জেলার প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে ডঃ অমর্ত্য সেনের ভূমিকা-সম্বলিত প্রতীচীর প্রতিবেদনের (প্রথম প্রকাশ ১৪১১, জুলাই ২০০৪) বীরভূম সম্পর্কিত কিয়দংশ তুলে দিচ্ছি।

মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে ৩১ শতাংশ এবং ১০ শতাংশ তপশীল জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ পশ্চিমবঙ্গের ১৮টি জেলার মধ্যে সাক্ষরতায় এই জেলা ১৪ নম্বর স্থানে। ২০০১ সনে সাক্ষরতার হার ৬২.১৬ শতাংশ। ১৯৯১-২০০১ সনের সময়সীমার মধ্যে সাক্ষরতা বৃদ্ধির হার ১৩.৬ শতাংশ।

এই জেলায় ৭,৬৭০ শিক্ষকসহ ২,৩৩৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। মহিলা শিক্ষিকা মোট শিক্ষকের মাত্র ১৪.৯৮ ভাগ। (২০০৫ সনে শিক্ষক-শিক্ষিকা সংখ্যা আরও

বেড়েছে।) ২০০১-২০০২ সনের শিক্ষাসংক্রান্ত জেলাতথ্য ব্যবস্থা (ডি আই এস ই) রিপোর্ট অনুযায়ী প্রাথমিক শ্রেণিতে (প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণি) ভর্তির সংখ্যা ছিল ৩,৫৭,৫৪৭ জন। যারমধ্যে ৪৮.৪৩ শতাংশ ছিল বালিকা বিদ্যালয় পিছু ভর্তির গড়পড়তা সংখ্যা যথেষ্ট উঁচু। বিদ্যালয় পিছু ১৫৩.১৯ জন শিশু। মোট শিক্ষার্থীদের শতকরা ৩৪ ও ৭ শতাংশ যথাক্রমে তপশীল জাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের। ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ৪৬ ঃ ১। অঙ্কটি রাজ্যের চেয়ে ভাল হলেও অন্য দু'টি সমীক্ষাকৃত জেলার থেয়ে খারাপ (ঐ দুই জেলা হল অবিভক্ত মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া-অ.চ.)। জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের সভাপতি স্বীকার করেছেন, শিক্ষক বন্টনে এই জেলায় সমস্যা আছে। জেলার ১৭৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় চলে একজন করে শিক্ষক নিয়ে। শিক্ষক সমস্যা ছাড়াও স্কুলবাড়ি সংক্রান্ত সমস্যা আছে। ১৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোনও বাড়িই নেই। (পৃষ্ঠা-৩৪)

ঐ প্রতিবেদন প্রকাশের পরে বাড়ির সমস্যা সামগ্রিকভাবেই সমাধান হয়েছে। ডি পি ই পি, জেলা পরিষদ, অনগ্রসর সমাজ কল্যাণ বিভাগ, বিধায়কদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল, সাংসদদের এলাকা উন্নয়ন তহবিল, বিদেশবাসী একব্যক্তির ব্যক্তিগত তহবিল প্রকৃতির আর্থিক অনুদানে ঐ সমস্যার সমাধান সম্ভবপর হয়েছে। ডি পি ই পি ও এস এস এ ঐ বাবদ, গৃহহীন বিদ্যালয়ের নতুন গৃহ নির্মাণ, গৃহ সংস্কার, একাধিক কক্ষ নির্মাণ প্রভৃতি বাবদ সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত খরচ হয়েছে ৪০ কোটি টাকা। আর অনগ্রসর সমাজ কল্যাণ বিভাগ ব্যয় করেছে ১২ কোটি ৭৭ লক্ষ ৫ হাজার। অন্যান্য অংশের হিসাব পাইনি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিপূরক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র। প্রতীচীর প্রতিবেদন আবার তুলে দিচ্ছি।

"প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও ১৯৯৭-৯৮ সন থেকে এই জেলা শিশু শিক্ষাকেন্দ্র চালু করেছে এবং এখানে ৭৫৬টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র আছে। (বর্তমানে ঐ সংখ্যা আরও বেড়েছে-অ.চ.) শিশু শিক্ষাকেন্দ্র কর্মসূচির দেখাশোনার ভার পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়নের দপ্তরের হাতে। প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির মধ্যে শিশু শিক্ষাকেন্দ্রগুলিতে মোট ১৩,৬০৮ জন শিশু ভর্তি হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উপর যেখানে বিশাল সংখ্যক ছাত্রের বাড়তি বোঝা রয়েছে সেখানে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র পিছু গড়পড়তা ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ১৮ জন এবং ছাত্র-শিক্ষিকা অনুপাত ১৮ঃ১। বিদ্যালয়পিছু গড়ে একজন করে শিক্ষিকা। যেহেতু কিছু শিশু শিক্ষাকেন্দ্র আছে যেখানে কোনও শিক্ষিকা নেই। আমরা যে পাঁচটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে ঘুরেছি তার সব ক'টিতেই একাধিক শিক্ষিকা আছেন।"

(ঐ পৃষ্ঠা ৩৪)

সকলেই জানেন যে, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের পড়ুয়াদের জন্য এখন মধ্যাহ্নকালীন খাবার দেওয়া হচ্ছে, যার ফলশ্রুতিতে পড়ুয়ার সংখ্যা সর্বত্র বাড়ছে। এটা গোটা রাজ্যেরই ছবি। বীরভূমে তার অন্যথা হবে কেন? খুব বেশিদিনের ফারাক নয়, ১৯৯৭-৯৮ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ার সংখ্যা ছিল ৩,৪৭,৫৯২। তিনবছর পরে বীরভূমের ২৩৭০টি বিদ্যালয়ে ঐ সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩,৫৭,৫৪৭। ওর সাথে ৭৫৬টি শিশু শিক্ষাকেন্দ্রের পড়ুয়ার ১২,৬৩৮। বেসরকারী বিদ্যালয়ে (সংখ্যা ১২৮টি) ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ২০,৪৮০ জন। সব মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে ৩,৯০,৬৬৫ জনে। তা হলে বর্ধিত পড়ুয়ার সংখ্যা হচ্ছে ৪৩,৪৩৩ জন। বৃদ্ধি খুবই উল্লেখযোগ্য। এই বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান। বর্তমানে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স বালক-বালিকাদের মধ্যে স্কুলে যায়নি এ সংখ্যা দুই হাজারের চেয়ে কম।

এই ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার মধ্যে আরও উল্লেখযোগ্য হল যে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের অনুপাত প্রায় সমান সমান। তপশীলভুক্ত জাতির ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার হার মোট পড়ুয়ার ৩৩.৯৫%। উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের আনুপাতিক হার মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা ৭.২৩%। এ সংখ্যাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

লেখাপড়ার ব্যাপারে একেবারে কোনো সমস্যা নেই, একথাতো বলা যাবে না। সমস্যা আছে এবং থাকবে।

উনিশ শতকের শেষার্ধে (১৮৭৫) কার্ল মার্কস গোথা প্রোগ্রামের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে শ্রেণি বিভক্ত সমাজে সর্বজনীন শিক্ষা কখনও পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। আমাদের মত আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ধনতান্ত্রিক এক সমাজে এবং বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রব্যবস্থার কথাও এখানে বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার। আরও মনে রাখা দরকার যে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের সন্তানদের সর্বজনীন অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির বয়স ছাপ্পান্ন বছরে পড়লেও আজও সেই কাজ অসম্পূর্ণ। দেশের কুড়ি কোটি ঐ বয়সী সন্তান আজও স্কুলের বাইরে রয়েছে। তাছাড়া, ২০০১ সনে সংবিধানের পরিবর্তন ঘটিয়ে শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত হলেও ঐ অধিকার রক্ষার দায়ভাগ রাষ্ট্র রাজ্যের হাতে চাপিয়ে দিতে সচেষ্ট। তার ব্যবস্থাও পাকাপাকি করা হয়েছে। সর্বশিক্ষার ব্যয়ভারের বর্তমানে শতকরা পঁচিশভাগ রাজ্যের ঘাড়ে চেপেছে।

এই রাষ্ট্রীয় বাতাবরণে দাঁড়িয়েই বামফ্রন্ট পরিচালিত পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার গণমুখীন শিক্ষানীতিকে কার্যকরী করার জন্য সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষার ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। শিক্ষার অগ্রগতির সূচক কোন্ রাজ্য থেকে ক'জন আই এ এস বা আই পি এস তথা সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় প্রথম হল তাই নয়, অনেকদিন আগে (প্রায় শতবর্ষ) রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার হেরফের নামক প্রবন্ধে লিখেছিলেন— "জীবনের সঙ্গে সঙ্গে জীবনের আশ্রয়স্থলটি গড়িয়া তোলাই রীতিমতো শিক্ষা। মানুষ একদিকে বাড়িতেছে আর তাহার বিদ্যা আর একদিকে জমা হইতেছে, খাদ্য একদিকে ডাক্তারকে ভারাক্রান্ত করিতেছে পাকযন্ত্র আর একদিকে আপনার জারকরসে আপনাকে জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে—আমাদের দেশে এই প্রকার অভূতপূর্ব কান্ড চলিতেছে।"

জীবনের ঐ আশ্রয়স্থলটি খুঁজতে গেলে প্রাথমিক শিক্ষার দিকটাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। ঐ ভিৎ দুর্বল বা অপ্রসারিত হলে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থাও নড়বড়ে ও দুর্বল হয়ে যেতে বাধ্য। আমাদের দেশের বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের কর্ণধাররা এ কথা বুঝতে ও এ নিয়ে ভাবতে স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে নারাজ ছিলেন। আজও তাঁদের শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গীর বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। উল্টোভাবে বলা যায় যে বৃহৎ বুর্জোয়া পরিচালিত বুর্জোয়া-জমিদার শ্রেণির ঐ দৃষ্টিভঙ্গীর ধারটা বিশ্বায়নিক উদারনীতির তাড়নায় ও প্রেরণায় তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে তীক্ষ্ণতমের দিকে যেতে আগ্রহী। যার জোর কোপটা পড়ছে শিক্ষাব্যবস্থার শীর্ষস্থানে—উচ্চশিক্ষা তথা কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে। ক্রমশ তা নিম্নগামী হচ্ছে। মাধ্যমিক ও প্রাথমিকে যাবারও দুর্দম আকাঙ্ক্ষা। ভারতের প্রায় সবরাজ্যে ঐ নিম্নাবতরণের লক্ষ্মণও সুস্পষ্ট। শিক্ষায় বেসরকারি পুঁজির নিয়োগ ও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ তথা শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার কাজ প্রায় সুসম্পন্ন। বাধা এই ব্রাত্য পশ্চিমবাংলা ও ত্রিপুরায়। কেরলে ঐ ব্যবস্থা বহুদিনের। তাই, সেই ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নিয়েছে বর্তমান কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকার।

যাক, আবার ফিরে আসা যাক বীরভূমে। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম আলোয় আজ বীরভূম জেলা বহুলাংশে আলোকিত ও উদ্ভাসিত। নিঃসন্দেহে তার কৃতিত্ব বামফ্রন্ট সরকার ও তার গণমুখীন শিক্ষানীতির। ঐ নীতির বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক উদ্যোগী। আর সে-উদ্যোগের সহায়ক শক্তি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও জনগণের অংশগ্রহণ। বীরভূমে সব গ্রামেই এখন এক বা একাধিক গ্রাম শিক্ষা কমিটি বা ভি ই সি গঠিত হয়েছে। বড় গ্রামে একাধিক গ্রাম সংসদ থাকায় সেখানে একাধিক ভি ই সি গঠিত হয়েছে। সরকারী নিয়মানুযায়ীই তা গঠিত হয়েছে। কাজেই, তার একটা প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক স্বীকৃতিও আছে।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রাথমিক শিক্ষার ঐ অভূতপূর্ব সাফল্যকে পাদপীঠ করে মাধ্যমিক শিক্ষারও প্রভূত অগ্রগতি ঘটেছে। এখন মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিহীন কোনো গ্রাম পঞ্চায়েত নেই। অনেকগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতে একাধিকও আছে। বড় গ্রামগুলিতে তো আছেই। ছোট গ্রাম পঞ্চায়েত, যার জনসংখ্যা ২০০১-এ হাজার এগারো, সেখানেও দুটো, এমনকি তিনটি হাইস্কুল ও ১টি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র হয়েছে। আমার শিক্ষক-জীবন যেখানে সুরু ও শেষ সেই নগরী গ্রাম পঞ্চায়েতের কথা বলছি। তিনটি হাইস্কুলের একটি তপশীলভুক্ত উপজাতি ও তপশীলভুক্ত জাতির ছাত্রীদের জন্য আবাসিক ১৯৭৯ সন থেকে চলছে। ছাত্রীসংখ্যা ১৮০। হাইস্কুলের একটি উচ্চমাধ্যমিক আবার। এক সিউড়ি থানাতেই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পঁচিশটি নতুন হাই হয়েছে। এবছর ঐ থানার সবকটিতে অবশিষ্ট ২টি জুনিয়র হাই হাইস্কুল স্তরে উন্নীত হয়েছে।

১৯৭৭-এর পূর্ববর্তী সংখ্যাতত্ত্বটা হাতের কাছে নেই। থাকলে তুলনামূলক পরিসংখ্যান দিতে পারতাম। তা না থাকায় দেওয়া গেল না। তবে সংখ্যার চেয়ে বাস্তব তো অনেক বড়।

আমার এ নিবন্ধে মুরারই ১নং ও ২নং ব্লক নলহাটি ২নং ব্লকের প্রাক্-বামফ্রন্টীয় আমলে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার দুর্গতির কথা বলেছি। ঐ তিনটি ব্লক তথা রামপুরহাট মহকুমার সব ব্লকেরই প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে এক বা একাধিক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাইকর ১নং গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি উচ্চমাধ্যমিক ও একটি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়। দুটোতেই ছাত্র-ছাত্রী উপচে পড়ছে। বালিকা বিদ্যালয় হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে।

রাজনগর জেলার ক্ষুদ্রতম থানা। জনসংখ্যা ১৯৯১-এ ছিল ৬১,৫৩৯। জনবসতির ঘনত্ব প্রতি কিলোমিটারে মাত্র ২৭৮। জেলায় সবচেয়ে কম। ২০০১-এ জনসংখ্যা কিছু বেড়েছে। তবে, সত্তর হাজার হয়নি। ঐ জনসংখ্যার মধ্যে (১৯৯১) তপশীলভুক্ত জাতি ২১,৫৬৬ জন, উপজাতি ৯৩৯৯ জন। দুই-এ মিলে ৩০,৯৬৫। অর্থাৎ প্রায় অর্ধেক। ঐ ব্লকে এখন হাইস্কুল ৭টি। তাদের মধ্যে একটি হায়ার সেকেন্ডারি, একটি দশম শ্রেণিযুক্ত বালিকা বিদ্যালয়। ঐসাথে

যুক্ত হবে দুটি গার্লস জুনিয়র হাই। তাদের মধ্যে আবার একটি তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতির বালিকাদের জন্য আবাসিক। এইসব বিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রাক্-বামফ্রন্টীয় আমলে মাত্র তিনটি হাইস্কুল স্তরে ছিল আর তিনটি ছিল জুনিয়র হাই স্তরে। বর্তমানে দশম শ্রেণিতে উন্নীত আরেকটি হাইস্কুল সামগ্রিকভাবেই ১৯৭৭-এর পরে প্রতিষ্ঠিত। বর্তমানে জুনিয়র হাইস্তরের ২টি বালিকা বিদ্যালয় একটি নব্বুই-এর দশকের আর একটি ২০০৬-এ প্রতিষ্ঠিত। এছাড়া গোটা ব্লকে আরও তিনটি মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

আলোচ্য ব্লকের জনসংখ্যার (১৯৯১-তে ৬১,৫৩৯) শতকরা ১২.০৮ ভাগ কৃষক আর কৃষিমজুর ১২.৬৯%। কর্মরত নরনারী ৩৩.৫৪%। কাজেই এটা সহজেই বলা যায় যে এই ব্লকের অধিকাংশ মানুষ সাধারণ অবস্থার।

ঐ এলাকাতেও প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার আলো যে বামফ্রন্ট সরকার পৌঁছে দিতে পেরেছে ঐ তথ্য তারই প্রমাণ।

এবার উচ্চশিক্ষার কথা বলে এ নিবন্ধ শেষ করব। 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র অনেকটা জায়গা নিয়ে ফেললাম। এ জেলায় বিশ্বভারতী আছে। তার অধীনস্থ কলেজ আছে, ২টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এগুলি ১৯৭৭-এর আগেকার। ১৯৭৭-এ ডিগ্রি কলেজ ছিল পাঁচটি। সাতাত্তরোত্তর পর্বে নতুন হয়েছে আরও পাঁচটি। মোট ১০টি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ২টি। আরেকটি ডিগ্রি কলেজের পরিকল্পনা হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী শিক্ষাবর্ষে চালু হবে। বি এড কলেজ ছিল ১টি। এখন ২টি। একটি বিশ্বভারতীর অধীন।

তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতীয়দের জন্য আবাসিক উচ্চবিদ্যালয় ১টি। জুনিয়র হাই ১। সেন্ট্রাল হোস্টেল (ছাত্রীনিবাস) ২টি। প্রাথমিক স্তরে আশ্রমিক ছাত্রাবাস ১১টি। মাধ্যমিক স্তরে ২২টি। এবছর একলব্য বিদ্যালয় হচ্ছে ১টি। ছাত্র ও ছাত্রীদের সেন্ট্রাল হোস্টেল ২টি হচ্ছে। একটি ছাত্রদের একটি ছাত্রীদের।

স্কুলকেন্দ্রিক ছাত্রাবাসে তপশীল উপজাতির থাকার ব্যবস্থা ৮৮০ জন। তপশীল জাতির ১০২০ জন। এবছর আসন সংখ্যা আরও বেড়েছে।

এবার ইতি টানছি। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে 'শিক্ষা গোল্লায় গিয়েছে' বলে যাঁরা তারস্বরে চিৎকার করেন, তাঁরাতো অন্ধের হস্তিদর্শনে পারঙ্গম। গ্রামে একটা কথা চালু আছে যে মার্জারের মূত্রের অঞ্জনে দৃষ্টিক্ষেপ হয়। কথাটা এখানে প্রযোজ্য কিনা, তার বিচারের ভার পাঠকবর্গকেই দিচ্ছি। যাঁরে দেখতে নারি, তাঁর চলন বাঁকা। অলমিতি।

শোক

বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত লছমনপুর পরমহংস যোগানন্দ বিদ্যাপীঠের তরুণ শিক্ষক ধীরেন্দ্রনাথ ডাঙ্গর গত ১০ই মার্চ আকস্মিক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

●

বীরভূম জেলার কেন্দ্রগড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষাকর্মী কামিনীকান্ত অধিকারী দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে গত ২২শে অক্টোবর প্রয়াত হন। তিনি আজীবন সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।

●

বর্ধমান জেলার জগদাবাদ-শশীভূষণ উচ্চবিদ্যালয়ের সহ-শিক্ষক নিতাই দত্ত গত ৬ই মার্চ এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি সমিতির সদস্য ছিলেন।

●

হাওড়া জেলার অন্তর্গত জগাছা হাইস্কুলের প্রাক্তন সহ-প্রধান শিক্ষক ও জগাছা আঞ্চলিক শাখার সদস্য গৌরীশঙ্কর মান্না গত ৫ই মার্চ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

●

কলকাতা জেলার কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশন (মেন) (বালক)-এর শিক্ষক অশোক চক্রবর্তী আকস্মিকভাবে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

এদের মৃত্যুতে সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং প্রয়াতদের প্রিয় পরিজনদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও 'অন্তর্জলি যাত্রা'

দীননাথ সেন

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার নিন্দা ও বিরোধিতা যাঁহার প্রধান চিন্তা তিনি পুনরায় তাঁহাদের পত্রিকায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার অন্তর্জলি হইতেছে। তাঁহাকে সমর্থন করিয়া পরের পক্ষের সংখ্যায় একটি পত্রও প্রকাশিত হইয়াছে যাহাতে অন্তর্জলির তথ্যকে জোরদার করা হইয়াছে।

ইঁহারা যখন অন্তর্জলির আয়োজনে ব্যস্ত তখন কিন্তু অমর্ত্য সেন দেখাইতেছেন — পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক ঠিক পথে চলিতেছে। কিন্তু কে না জানে অমর্ত্য সেনের প্রতীচী ট্রাস্ট অপেক্ষা সুনন্দ সান্যালদের 'দেশ' অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য।

আমরা অন্তর্জলিবাদীদের চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে চাহি যে এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাত লাখের মতো। বলিতে পারেন তাহাদেরও কি অন্তর্জলির পথ লইতেছে না?

ইঁহারা যাহা ইচ্ছা লিখিতে ও বলিতে পারেন কিন্তু আমাদের হিসাব স্বতন্ত্র। আমরা অবশ্যই দেখিতে পাই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার অগ্রগতি। ইহাও আমাদের চোখ এড়ায় না যে সাক্ষরতা ভরা কোটাল যে উচ্ছ্বাস জাগিয়াছিল তাহার বিপুলতায় রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে ছাত্র বিস্ফোরণ ঘটাইয়াছে। মাধ্যমিক স্তরে ও অনুরূপ সংখ্যাধিক্য বিদ্যালয়গুলিতে স্থানাভাব ও শিক্ষকের অপ্রতুলতা সরকারের ও সমাজের দুশ্চিন্তা বাড়াইয়া দিয়াছে।

একদিকে বিপুল বৃদ্ধি, আবার অন্যদিকে জুনিয়র হাই ও হাই মিলিয়া ১৫০টির বেশি বিদ্যালয় ছাত্রাভাবে উঠিয়া গিয়াছে। আবার দেখি এবছর (২০০৬ সালে) মাধ্যমিক রেগুলার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে ছয় লক্ষ ছাপাইয়া গিয়াছে।

এই বৈপরীত্যেই ঘটিবার কথা। কেননা সংখ্যাবৃদ্ধির সমস্যা মানবৃদ্ধির সমস্যাকেও বাড়াইয়া তোলে। ইহা ছাড়া সমাজের শিক্ষাচেতনায় ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পরিবর্তনের শর্ত মিটাইতে শিক্ষাকে রাতারাতি বদলানো যায় না।

সমাজের একটি ছোটো অংশে পয়সা বিস্তর। এই অংশ মনে করে উত্তম শিক্ষার লক্ষ্য বিদেশে চাকুরি, মোটা মাহিনা, ঝকঝকে জীবনমান। (তাঁহাদের তালিকায় শিক্ষকগণেরও একটি অংশ হয়ত পড়িয়া যাইবেন) তাঁহারা ইহাও দেখেন পুঁজিবাদ আজকের শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করিয়াছে মল ও বিগবাজারের ন্যায় অনেক দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ী শিল্পপতি বিদ্যাবিপণি খুলিয়া দিয়াছেন। মোটা মাসিক বেতনের বিনিময়ে তাঁহারা 'সর্বাধুনিক' শিক্ষার বিজ্ঞাপনে বাজার ছাইয়াছে। প্রলুব্ধ অভিভাবকের আর তর সহিতেছে না, পড়ি-মরি করিয়া ছুটিতেছেন বিদ্যার ওই সমস্ত বিগবাজারে।

বিগবাজারকে একমাত্র আদর্শ বিদ্যাস্থান বলিয়া তুলিয়া ধরিতে হইলে রাজ্যের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্জলি যাত্রার কথাই শতমুখে প্রচার করিতে হইবে। পুঁজিবাদ অবশ্যই এইরূপ প্রচারকে পুষিবেন এবং সুনন্দ সান্যালও এ বি পি গ্রুপ এইরূপই প্রচার করিবেন স্বভাবতই। তবে ইহাও আমরা না বুঝিয়া পারি না যে রাজ্যে যে একটি বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা মাথা তুলিতেছে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করিবার প্রযুক্তি সচেতনতার অভাব রহিয়াছে। তাঁহারা বুঝিতে চাহিতেছেন না এই যুদ্ধে জয়পরাজয় শিক্ষকদের অস্তিত্বের সঙ্কট।

এই প্রসঙ্গে আমরা আমাদের আত্মসমীক্ষা বিষয়েও সচেতন হইতে চাই। আমরা জানি প্রাথমিক শিক্ষার সম্প্রসারণে আমাদের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য। প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, শিশুশিক্ষা মিশন, বেসরকারি উদ্যোগ, সর্বশিক্ষা অভিযান প্রভৃতি বহুমুখী ব্যবস্থাপনায় পশ্চিমবঙ্গে ৮৫ ভাগ স্কুলবয়সি শিশু প্রাথমিক শিক্ষায় আসিয়া গিয়াছে। বাকি ১৫ ভাগকেও আনিবার জন্য তোড়জোড়ের বিরাম নাই।

এই বিষয়টি লইয়া যাঁহারা ভাবিত তাঁহারা যে সকল সঙ্কট হাড়ে হাড়ে টের পাইতেছেন সেগুলির কয়েকটি এই প্রকার —

সংখ্যার বাড়-বাড়ন্তকে গুণগত মানে রূপান্তরিত করা

মুখের কথা নহে। প্রতি মুহূর্তে অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা ও সামাজিক জড়তা কাটাইয়া শিশুদের স্কুলমুখী করা পর্বতকে সচল করার মতো দুঃসাধ্য। অবিরত ইংলিশ মিডিয়াম, ঝকঝকে স্কুল বাড়ি, গলায় টাই, ফিটফাট পোষাকের আকর্ষণ লোভ দেখাইয়া বলিতেছে —এই পথেই পাইবে আসল শিক্ষার স্বাদ। মূলস্রোতের বিদ্যালয়গুলিও কি এইপ্রকার হইতে পারে না? তাহা হইলেই তো......। উত্তর হইতেছে, না, পারে না। কারণ প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষা মুনাফা অর্জনের ব্যবসা যাহা সরকার করিতে পারে না। সমাজের অতি নগণ্য অংশই বেসরকারি আওতায় আসিতে পারে, বাকিদের নির্ভর সরকারি ব্যবস্থা। সকল বিদ্যালয় ইংরেজি মাধ্যম করা যায় না? তাহা হইলে তো সারা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা একটা ইংরেজি ইংরেজি সৌরভে ভরিয়া উঠিবে। ঘরে ঘরে ইংরেজির ফুল ফুটিবে। দারুণ ইংরেজি-জানা ছেলেমেয়েরা টুকটুক করিয়া চাকুরি পাইতে থাকিবে, সুখশান্তির বান ডাকিয়া যাইবে সারা রাজ্যে। এইরূপ উন্নততর শিক্ষার জন্য উপদেশ প্রযুক্তি পরামর্শ বিদেশ হইতেও আমদানি করিলে ক্ষতি কী?

ক্ষতি অন্য কিছু নাই। কেবল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মহৎ উত্তরাধিকারের অপমৃত্যু হইবে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শবযাত্রার হরিধ্বনি শোনা যাইবে। ইংরেজি জানিলেই যদি চাকুরি পাওয়া যাইত তাহা হইলে ইংলন্ডে আমেরিকায় ৯৫ লক্ষ বেকার ঘুরিয়া বেড়ায় কেন? কেন উন্নত দেশে অতি উন্নত ব্যক্তি সংখ্যায় অনেক কমই থাকেন। ইংরেজি কায়দায় শিক্ষার দ্বারা যদি সভ্য হওয়া যাইত তাহা হইলে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য স্বাধীনতার সংগ্রাম করিতে হইল কেন? আফগানিস্তান, ইরাক, ল্যাটিন আমেরিকা, কিউবা, ভিয়েতনামে আমেরিকা একটা ঘৃণ্য শব্দে পরিণত হয় কেন? সুতরাং ইংরেজিতে আমাদের শিক্ষার সুরাহা হইবার নহে।

কিন্তু বিদ্যালয়গুলি এখন যেরূপ চলিতেছে তাহা হইতে দশগুণ ভালো চলিতে পারে যদি শিক্ষকগণ এখন যেরূপ আছেন তাহা অপেক্ষা দশগুণ ভালো হইয়া উঠিতে পারেন। হওয়া যে সম্ভব তাহা আমাদের শত শত ভালো শিক্ষককে দেখিলেই বুঝা যায়। তাঁহাদের চেষ্টায় যত্নে নিষ্ঠায় শ্রমে গড়িয়া উঠিয়াছে পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে নামকরা কয়েক শত স্কুল। নিজের ছেলেমেয়েদের জন্য যে মানের শিক্ষা চাই, অন্যের ছেলেমেয়েদেরও সেই মানের শিক্ষা দিব — কেবল এই অঙ্গীকারই একজন শিক্ষককে সফল সার্থক করিয়া তুলিতে পারে। প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ওরিয়েন্টেশনের সুযোগও এখন অঢেল।

শিক্ষার প্রক্রিয়াকে বেশ ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে-হইলে আমাদের এভাবে দেখিতে হবে —

এক) ইনপুট

এই স্তরে থাকিবে পরিবেশ, পরিকাঠামো, উপকরণ, শিক্ষক।

দুই) প্রসেসিং

এই স্তরে থাকিবে শেখা-শেখানোর কাজ, ভিত জরিপ ও চিহ্নিত ঘাটতি পূরণ করিয়া নির্ধারিত পাঠগ্রহণের সামর্থ্য অর্জন, মৌখিক ও লিখিত কাজ (অবশ্যই সামর্থ্যভিত্তিক) হাতে কলমে লার্নিং একটিভিটি।

তিন) আউটপুট

১ম ও ২য় ধাপের সাফল্যের পরিমাপ। যে শিশুটিকে মূল্যবান মানবসম্পদে রূপান্তরিত করিবার জন্য আমার পাঠক্রম, আমার পাঠ উপকরণ, আমার পাঠ পরিকাঠামো, আমার গৃহীত পদ্ধতি প্রকরণ কতখানি সাফল্যলাভ করিল তাহা আমি মূল্যায়ন করিয়া পাইব আমার আউটপুট — শিক্ষার্থী। মানবশিশু, মানবসম্পদ কতখানি হইতে পারিল তাহার হিসাব। শিক্ষার এই ছকটির গোড়ার কথাই হইল সামর্থ্য। যে শিশুটিকে আমি ১ম বা ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে পাইয়াছিলাম সে কী কী করিতে পারিত তাহা জানিবার জন্য ছিল আমার ভিত জরিপ, বেসলাইন সার্ভে। মাধ্যমিক পর্বের অন্তে শিশুকে কী কী সামর্থ্যের অধিকারী হইতে হইবে তাহা পূর্ব পরিকল্পিত, পূর্ব নির্ধারিত। সময় ও সমাজের চাহিদামতো সামর্থ্যের যোগ-বিয়োগ রদবদল হয়।

তদনুযায়ী ১ম হইতে ১০ম পর্যন্ত সামর্থ্যসূচিকে ক্রমোন্নত স্তরে বিন্যস্ত করিয়া বিভিন্ন শ্রেণি নাম দেওয়া হইয়াছে। নির্ধারিত সামর্থ্য অর্জিত হইলে তবেই বলা যাইবে শিশুটি ওই শ্রেণির উপযুক্ত। পাশ-নম্বর-প্রমোশন-ফেল প্রভৃতি ছাপ মারার রীতি ইংরেজ আমলের ঔপনিবেশিক অভ্যাস। আমি স্বাধীন বলিয়া বড়াই করিব। আবার ঔপনিবেশিক শিক্ষার দাসত্ব মানিয়া লইব — ইহা হইবার নহে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে নম্বর-ফম্বর দেওয়া নেওয়া হাস্যকর, শিক্ষার আবর্জনার মতো বর্জ্য মনে হইবে যদি সামর্থ্য অর্জনের ধারণা ও প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকে।

এই মুহূর্তে যে কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগা দরকার তাহা—

১. ৫ম শ্রেণি অবধি সামর্থ্যগুলির একটি তালিকা দিল্লির কেন্দ্রীয় সংস্থা করিয়া দিয়াছেন, পশ্চিমবঙ্গে তাহার সম্পাদিত রূপ অনুসারে পাঠক্রম পাঠ্যোপকরণ করাও হইয়াছে।

৬ষ্ঠ-১০ম শ্রেণির সামর্থ্যগুলি বিষয় অনুসারে চিহ্নিত করা জরুরি। এই কাজটি প্রতিটি শিক্ষককে হাতেকলমে করিয়া সামর্থ্যের স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করিতে হইবে। ইহার জন্য কয়েকটি বিনিদ্র রজনী কাটাইতে হয় তো হোক।

রপ্ত করিতে হইবে ভিত জরিপ প্রক্রিয়া। কে কোন্ সামর্থ্যের স্তরে আছে তাহা না জানিলে শ্রেণির পঠনপাঠন জলে যাইবে।

ভিত জরিপের যে ঘাটতি পাওয়া গেল তাহা পূরণ করিবার কর্মসূচিও শিক্ষককেই তৈয়ার করিতে হইবে। প্রতি স্কুলের প্রতি পড়ুয়ার সামর্থ্যের বৈশিষ্ট্য স্তর ভিন্ন ভিন্ন।

এইবার সামর্থ্যভিত্তিক শেখা-শেখানো। সবই বলিয়া দিবেন, বুঝাইয়া দিবেন, গিলাইয়া দিবেন — ইহা দায়সারা কাজ মাত্র। শিখিবার দায়িত্ব শিক্ষার্থীকেই দিন। এমন কাজে তাহাকে নামাইয়া দিন যাহা সে করিতে আনন্দ পাইবে। নিজে করিতে করিতে, ভুল করিতে করিতে একবার সফল হইলে সে আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হইবে। শিখনের কাজে গতিবেগ পাইয়া যাইবে।

কেবল একা কেন, সহপাঠীর দল গড়িয়া দিন। আপনি যাহা শিখাইতে পারেন না সহপাঠীরা সহজেই তাহা পারে। কীভাবে ইহা করিবেন তাহা আপনাকেই উদ্ভাবন করিতে হইবে। শিক্ষার্থীদের মতো শিক্ষকও করিতে করিতে শিখিবেন — প্রত্যেকের শিখিবার শিখাইবার ধাঁচ ধরন আলাদা।

সামর্থ্য বিষয়ে ভালো করিয়া যখন বুঝিয়া গেলেন তখন সামর্থ্য মূল্যায়ন করিবার জন্য প্রশ্নপত্র রচনাও কষ্টসাধ্য হইবে না।

প্রশ্নের উত্তর মূল্যায়ন করিয়া নম্বর/গ্রেড/মন্তব্য দেওয়াও বিজ্ঞানসম্মত হইবে।

সামর্থ্যের ক্রমোন্নতির ধারা একবার বহাইয়া দিতে পারিলে আমরা পাইব আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মানের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা। আসুন আমরা প্রত্যেকে আমাদের প্রতিটি ক্লাসকেই করিয়া তুলি সামর্থ্যভিত্তিক পঠন-পাঠন মূল্যায়নের কর্মশালা — হ্যান্ডস অন ট্রেনিং। আসুন এইভাবে আমরা হইয়া উঠি উন্নততর শিক্ষক, গড়িয়া তুলি উন্নততর মাধ্যমিক শিক্ষা। এবং আমরা প্রশস্ত করিয়া দিই শিক্ষাবিরোধীদের বিরোধিতার অন্তর্জলি যাত্রার পথ।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ও 'দেশ'-এর অন্তর্জলি আখ্যান

'শিক্ষার অন্তর্জলি যাত্রা', 'দেশ' পত্রিকার (যাহা সাপ্তাহিক হইতে পাক্ষিক, পাক্ষিক হইতে (শোনা কথা) মাসিকে এবং মাসিক হইতে...। ক্রমশই অন্তর্জলির দিকে অগ্রসর না হউক ইহাই 'দেশ' প্রেমিকরা কামনা করিবেন তাহাতে সন্দেহ কী) এই শিরোনামের প্রারম্ভিক চমক কাটাইয়া উঠিবেন যদি নিবন্ধটির রচয়িতার নামটি দেখেন। আপনি মুচকি হাসিয়া বলিয়া উঠিবেন — ওঃ! ইনি! ইনি তো এ বি পি গ্রুপের বামফ্রন্টের শিক্ষা নিন্দা সেল-এর কর্তা। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা নিন্দায় ইহার পাণ্ডিত্য ও পারদর্শিতার জন্য বিশেষ আনন্দখ্যাতি প্রাপ্ত।

এই খ্যাতিবানের লেখায় যাঁহারা আমোদ বোধ করিয়া থাকেন তাঁহারা সে কী। এই রাজ্যে এইরূপ হইতেছে! — বলিয়া ঢোক গিলিতে থাকিবেন হয়ত। কিন্তু তাঁহাদের চোখে সে সময়কার আরও একটি সংবাদ শিরোনাম পড়িবে ঃ 'পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা ঠিক পথে চলিয়াছে।' অন্তর্জলি যাত্রা যিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন তিনি একজন শ্রী সুনন্দ সান্যাল। ঠিক পথের কথা যিনি বলিতেছেন তিনি অমর্ত্য সেন।'

অমর্ত্য সেন বা তাঁহার প্রতীচী ট্রাস্ট বলিলে কী হইবে, কে না জানে অমর্ত্য সেন অপেক্ষা সুনন্দ সান্যাল অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। আমরা এই মুহূর্তে একগুচ্ছ তথ্য প্রমাণ দিতে পারি উক্ত নির্ভরযোগ্য মহাশয় কতটা অসত্যবাদী ও কী পরিমাণ শিক্ষাবিরোধী। সেইসব কর্দম নিক্ষেপে আমাদের আগ্রহ কিংবা রুচি নাই, আমরা যাহারা 'দেশ'-এর মুখে ঝাল খাইয়া নিজের চোখ কানকে মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে পারি না।

কালের সংলাপ

উৎপল রায়

—মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মুখে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন ডাকা হয়েছে যে......

—শুধু তা কেন? ক্লাশ ইলেভেনের, ইস্কুলের ফাইভ-টু-নাইন অ্যানুয়াল এক্সামও রয়েছে একই সময়ে। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের, কলেজ-ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাগুলো পিছিয়ে দেওয়া হল!

—খুব ক্ষতি হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের। তবু বামফ্রন্ট বিরোধীরা এভাবে নির্বাচন হওয়ায় খুব পুলকিত ।

—হ্যাঁ, দেওয়াল লেখা যাচ্ছে না, পোস্টার সাটা যাচ্ছে না তাতেও বিরোধীরা পুলকিত।

—আরে দেওয়াল লেখা যাচ্ছে না যে আইনে সেটা তো সাতাত্তরের আগের আইন। তখন তো কালো দিন! কালো দিনে দেওয়াল লেখা যেতো না।

—বিরোধীরা হয়তো ভাবছে এইসব নিষেধাজ্ঞায় কালো দিন ফিরে আসবে।

—হয়তো নয়, সেটাই ভাবছে। মিডিয়াও তাদের সেভাবে ভাবাচ্ছে। তবে কালো দিন আর ফিরবে না।

—তিনটি দশক ধরে বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যজুড়ে যে আলো জ্বালছে তাতে মানুষ ভুল করবে না বলেই মনে হয়। তবু মিডিয়া মরিয়া.....

—মিডিয়া তো বাজার-নিয়ন্ত্রিত। লগ্নীপুঁজি যা চাইছে তাই তো বলছে। তারা চায় খোলা বাজার।

—পশ্চিমবঙ্গে কি বাজার নেই?

—পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ত্রিশ বছর ধরে যে উন্নয়ন তাতে তো বাজার গড়ে উঠবেই।

—উন্নয়নের সরকার বলতে তো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বোঝে মনমোহন -চিদাম্বরমের সরকারকে। আগে বুঝতো বাজপেয়ী সরকারকে।

—দুই সরকারই ঢালাও উদারীকরণ আর বেসরকারীকরণ করে বিদেশী পুঁজিকে ঢুকতে দিয়েছে, তাই ওদের খুব পছন্দ।

—তবু তো মনমোহন সিংদের চাপের মুখে ফেলে বামপন্থীরা কিছুটা হুঁশিয়ারি দিচ্ছে।

—তাতেই তো সাম্রাজ্যবাদীরা তো বটেই, কংগ্রেসও বামপন্থীদের উপরে বিরক্ত। শুধু সাম্প্রদায়িকতা নয়, জনবিরোধী অর্থনীতি রূপায়ণের ফলেই যে বাজপেয়ীদের পতন তা কংগ্রেস বুঝতে চাইছে না।

—খুনি বুশের হাততালি পাচ্ছে, মনমোহন সিংরা তাতেই খুশিতে ডগোমগো!

—কিন্তু জনগণ খুশি নয়। সাস্টেনেইবল গ্রোথ তো নয়ই, দেশে চলছে জবলেস গ্রোথ। বলা ভাল রুথলেস গ্রোথ। আর এই বাজারে— মানে তিরিশ কোটি উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত ক্রেতার বাজারে বিদেশী পুঁজির বিনিয়োগ, মুনাফা। বাকি প্রায় আশি কোটির কী হবে?

—পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়ন সাধারণ মানুষের জন্য নির্ধারিত।

—একদম প্রথম থেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গি। এই জন্যই তো বামফ্রন্ট খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের সরকার, বারে বারে ফিরে আসে, এতদিন ধরে টিঁকে আছে।

—হ্যাঁ, খেটে খাওয়া মানুষের সরকার। কিন্তু শুধুই রাজ্য সরকার নয়। রাজ্য সরকারের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে গ্রামে শহরে নির্বাচিত স্বায়ত্তশাসনগুলো। সেগুলোর মাধ্যমে মানুষ রাজ্য সরকারের কর্মসূচিগুলো রূপায়ণে অংশ নিচ্ছে।

—ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থা তো বিশ্বের বিস্ময়। মানুষের, বিশেষ করে মেয়েদের অংশগ্রহণ একটা যুগান্তকারী ব্যাপার।

—শুধু আলাদা করে পঞ্চায়েতের কথা বললে হবে না। ভূমিসংস্কার আর সাক্ষরতা আন্দোলন গ্রামবাংলার বৃহত্তর সমাজকে নাড়িয়ে দিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিক্ষাকে প্রসারিত করার বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী।

—প্রচুর ছেলেমেয়ে প্রত্যন্ত গ্রামেও এখন ইস্কুলে আসছে।

—আসলে প্রায় তিরিশ বছর ধরে যে পরিস্থিতিটা তৈরী হয়েছে রাজ্যে তা বোঝা দরকার। ভূমিসংস্কার, ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ফলে তৈরি হওয়া গ্রামীণ পরিবেশে

জমিকে তিন ফসলীতে পরিণত করার বামফ্রন্ট সরকারের নীতি সাফল্য পেল কৃষিতে। উৎপাদনে নানা বৈচিত্র্যও এলো।

—এখন তো ধান, মাছ, ফল, নানারকম সবজি চাষে এরাজ্য দেশে প্রথম স্থানে।

—এবিষয়ে শিক্ষার একটা বড় ভূমিকা আছে। নতুন গ্রামীণ পরিবেশ আরো সক্ষমতা অর্জনের জন্য মানুষকে ব্যাকুল করে তুলল আর এই জায়গা থেকেই শিক্ষার অঙ্গনে পা রাখার জন্য মানুষের ঢল নেমেছে। শিক্ষা তো এখন পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে অনুঘটকের কাজ করছে।

—সংখ্যালঘু, তপশীলি উপজাতি পরিবারগুলোর মেয়েরা পর্যন্ত এখন ইস্কুলে আসছে।

—ব্যাপার হচ্ছে, নারীর ক্ষমতায়নের ভিতটা তৈরী হচ্ছে এভাবে। এটা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

—হ্যাঁ, সম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে নারীর ক্ষমতায়নে এ রাজ্যে শিক্ষার ভূমিকা ঐতিহাসিক।

—এরাজ্যে শিক্ষার ভূমিকাকে উজ্জ্বলতা দিচ্ছে ব্যাপক সংখ্যায় শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদের দায়বদ্ধতা। প্রকৃত মানবসম্পদ এভাবেই গড়ে উঠছে। একটা হিসাবের কথা বলি, পশ্চিমবঙ্গই একমাত্র রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩·৭ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ হয়। অথচ জাতীয় গড় ২·৮ শতাংশ। দৃষ্টিভঙ্গিটা পরিষ্কার।

—বছরে দশ হাজার শিক্ষক নিয়োগ এ রাজ্যের মতো আর কোথাও হয় না। এ বছর তো প্রায় বাইশ হাজার টিচার এস এস সি'র মাধ্যমে নিযুক্ত হচ্ছেন।

—উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদের ছেলেমেয়েদের আগ্রহ দারুণ বেড়েছে। ওদের বাইরের রাজ্যগুলোতে দৌড়াতে হচ্ছে না। এখানেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক বিষয়গুলো পড়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

—আধুনিক বিষয়গুলো ছেলেমেয়েরা পড়ছে রাজ্যে ব্যাপক শিল্প সম্ভাবনার কথা ভেবেই।

—কৃষির উন্নয়নকে ভিত্তি করেই তো শিল্প গড়ে ওঠার বাস্তবতা।

—দেশি, বিদেশি লগ্নীকারীরা এখন এ রাজ্যে আসছে। আই টি সেক্টার তো দেশের মধ্যে আমাদের রাজ্য এখন সবচেয়ে আকর্ষণীয়।

—বাজার না থাকলে তো আর লগ্নীকারীরা ছুটে আসতো না।

—হ্যাঁ, তৈরী বাজার। বাজার মানে তো মানুষের ক্রয়ক্ষমতা। এখন পশ্চিমবঙ্গে বছরে ১৭/১৮ হাজার কোটি টাকার বাজার।

—তবু লগ্নীপুঁজির, সাম্রাজ্যবাদের দাসানুদাস মিডিয়া বামফ্রন্টকে আক্রমণ করছে।

—দাসানুদাস বলেই আক্রমণ! লগ্নীপুঁজি চাইছে একদম খোলা বাজার। বামফ্রন্ট সরকার শর্ত আরোপ করছে।

—ঠিকই। মূল কথা, লগ্নী করতে চাও তো উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে হবে, উন্নততর প্রযুক্তি লাগাতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি হওয়া চাই।

—কিছু রাজ্য তো কেন্দ্রীয় সরকারের ইঙ্গিতে সাম্রাজ্যবাদী শর্ত মেনে বাজেট তৈরী করছে।

—বামফ্রন্ট সরকার দৃঢ় অবস্থান নিয়ে এইসব শর্ত না মানার কথা ঘোষণা করেছে।

—এটাই তো রাগের কারণ। তৈরী বাজার রয়েছে। নিঃশর্তে দখল নিতে হবে। বামফ্রন্ট শর্ত আরোপ করছে। বামফ্রন্টের ফিরে আসা দেখতে চায় না, তাই মিডিয়ার প্রচার চলছে।

—মিডিয়ার প্রচারের তালে কংগ্রেস-তৃণমূল-বি জে পি নাচছে। কিন্তু এবারেও ওদের আশায় ছাই।

—রাজ্যের ক'টা জেলায় এরাই মাওবাদের মুখোশ পরে গরীব মানুষ মারছে। তবে মানুষও প্রতিরোধ করছে।

—রাজ্যের মানুষ নির্বোধ নন। সপ্তম বারের জন্য বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবেই।

— মিডিয়ার মিথ্যার বিরুদ্ধে প্রচার করা দরকার। শিক্ষকদেরই এই দায়িত্ব নিতে হবে। বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে।

—বাংলার জাগ্রত শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীরা মানুষের সপক্ষে দাঁড়িয়ে আবারো ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবেই।

—হ্যাঁ, উন্নয়নের গতিকে, শিক্ষার প্রসারের, মান উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবেই।

—তিমিরবিনাশী মানুষই সর্বশক্তিমান।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাচিত্র — তখন ও এখন

২০০৬

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার চতুর্দশ নির্বাচন আসন্ন। রাজ্যে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার গঠন করার প্রত্যয়সিদ্ধ অঙ্গীকার নিয়ে বামফ্রন্ট রাজ্যবাসীর নিকট উপস্থিত হয়েছে। শুধু অঙ্গীকার নয়, উনত্রিশ বছরে বামফ্রন্ট সরকার ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে আজ উন্নয়নের শীর্ষে অবস্থান করছে। এই শীর্ষের শিরোপায় একটি উজ্জ্বল পালক শিক্ষায় এই রাজ্যের নজিরবিহীন সাফল্য। দেশের সর্বাধিক ঘনবসতি-পূর্ণ রাজ্য এখন পশ্চিমবঙ্গ। সাংবিধানিক, আর্থিক ও প্রশাসনিক নানাবিধ প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে সমস্যাসংকুল এই রাজ্য আজ শুধু ভারতের তাবৎ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে তাই নয়, আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনগুলিতে বারে বারে এই রাজ্যের একাধিক অগ্রগতির দৃষ্টান্তকে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্ব জনসংখ্যার মাত্র ১.৩ শতাংশের বাস যে রাজ্যে, সেই রাজ্য আজ বিশ্ব মানচিত্রে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করতে সমর্থ হয়েছে। এই অগ্রগতিকে তরান্বিত করার মহতী উদ্দেশ্য নিয়ে আজ বামফ্রন্ট মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনের প্রত্যাশা করছে। এই সাফল্যকে আড়াল করার জন্য মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে বিরোধী পক্ষ ভিত্তিহীন, মনগড়া, অসার যুক্তির জাল বিস্তার করার চেষ্টা করছে। তারই অঙ্গ হিসাবে এই রাজ্যের শিক্ষার সাফল্যকে আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হিসাবে তারা বেছে নিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অগ্রগমনের তাৎপর্য বুঝতে হলে একটু পিছনে দিকে তাকাতে হবে।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ

১৮২৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর পরাধীন ভারতে আধুনিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট দাবি প্রথম উত্থাপন করেছিলেন রাজা রামমোহন রায় লর্ড আমহার্স্ট-এর কাছে। সারা দেশে এই দাবিপত্রকে ভারতের আধুনিক শিক্ষার 'ম্যাগনা কার্টা' হিসাবে গণ্য করা হয়। কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শিক্ষা সম্পর্কে 'কাউন্সিল অব এডুকেশন'-এর নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, তার উত্তরে ১৮৫৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত কাউন্সিলের নিকট যে সুবিন্যস্ত প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, ভারতে আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে তা অমূল্য সম্পদ হিসাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। বঙ্গভঙ্গের পরের বছরই সরকারী শিক্ষাব্যবস্থায় সমান্তরাল বে-সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ১৯০৬ সালে বঙ্গপ্রদেশে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়, পরে তা অন্য রাজ্যে সম্প্রসারিত হয়। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ শিক্ষাজগতে যে অবদান রেখে গেছেন, সমগ্র দেশ তা সসম্মানে স্মরণ করে। ১৮৮৩ সালে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এবং চন্দ্রমুখী বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে গোটা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে প্রথম মহিলা গ্রাজুয়েট হয়েছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলার গৌরবমন্ডিত অতীতের অনেক কথাই আজ স্মরণ করা যেতে পারে।

স্বাধীনতা-উত্তরপর্ব — (প্রাক্-১৯৭৭)

স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে জাতীয় নেতৃবৃন্দ শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, আশ্চর্যের বিষয় স্বাধীন ভারতে শিক্ষার প্রতি সেই আগ্রহ কোনো ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হলো না। ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের তালিকায় শিক্ষার স্থান হলো না। নির্দেশাত্মক নীতির মধ্যে সংবিধান কার্যকরী হওয়ার দশ বছরের মধ্যে চৌদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত সকলের জন্য অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষার প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও তার ছাপান্ন বছরেও সেই লক্ষ্যে পৌঁছানো গেল না। শিক্ষার প্রতি সীমাহীন উপেক্ষাই এর জন্য দায়ী। সেজন্য ডজন ডজন শিক্ষা কমিশন/কমিটির সুপারিশগুলির ভাগ্যে জুটছে চরম অবহেলা।

পশ্চিমবঙ্গে কয়েক মাসের যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকা ছাড়া ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত ছিল কংগ্রেসি শাসন। শিক্ষার প্রতি শুধু অমার্জনীয় অবজ্ঞা দেখিয়েই কংগ্রেসি জমানা বাংলার অতীতের প্রতি চরম অবমাননা করেছে তাই নয়, ১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত এই রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত করে দেওয়ার জন্য অকল্পনীয়-অভাবনীয় সুসংগঠিত আক্রমণ চালিয়ে সারা দেশের শিক্ষার ইতিহাসে এক কলঙ্কময় নিকৃষ্টতম অধ্যায় রচনা করা হয়েছে। ১৯৭০ সালের ১৬ই মার্চ দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করা হয়। ১৯৭৭ সালের ২১শে জুন বাংলার মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাত বছরে রাজ্যের শিক্ষাজগতের লোমহর্ষক কাহিনির বিবরণ দিতে হলে সুবিশাল গ্রন্থ রচনা করতে হবে। সে দিকে না গিয়ে দু-একটি বিষয়ের শুধু উল্লেখ করা হচ্ছে।

'আনন্দবাজার' (৬ই জুন, ১৯৭০) লিখছে — "সর্বশ্রী সত্যেন বোস, ডি এম বসু, ফণীভূষণ চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুরজিত লাহিড়ী, সৌরীন্দ্রমোহন সরকার প্রমুখ শিক্ষাবিদ্গণ এক বিবৃতিতে বলেন, সম্প্রতি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা গ্রহণ নিয়ে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে তাতে সকলেই বিচলিত বোধ করেন। ছাত্ররা শিক্ষাকেন্দ্রে অসৎ উপায় অবলম্বন

করছে। শিক্ষকরা প্রহৃত হচ্ছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে, হিংসার আশ্রয় নেওয়া হচ্ছে।" তদানীন্তন মন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষের পরিবার পরিচালিত পত্রিকা 'যুগান্তর', ১৯৭০-এর ৩০শে মে সংখ্যা, আনন্দবাজার, ১৯৭১-এর ১৩ই সেপ্টেম্বরের সংখ্যা, ১৯৭২-এর ১৫ই জানুয়ারীর সংখ্যা, ১৯৭৬-এর ৩রা সেপ্টেম্বরের সংখ্যা, বসুমতীর ১৯৭৪ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারির সংখ্যা থেকে ঐ সময়ের সকল পত্র-পত্রিকার পাতা খুললে দেখা যাবে রাজ্যের শিক্ষাজগৎকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার জন্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তা ও সরকারী দলের ব্যবস্থাপনার কী সর্বগ্রাসী হিংসাত্মক কাজকর্ম চলছে। ১৯৭০ সালের ৩০শে ডিসেম্বর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে উপাচার্য গোপাল সেন নৃশংসভাবে খুন হলেন। বিশ্বে নজিরবিহীন কালিমালিপ্ত দৃষ্টান্ত তৈরী হলো। ঐ সময় হাওড়ার অধ্যাপক সত্যেন চক্রবর্তী, শিক্ষক নেতা মুর্শিদাবাদের সন্তোষ ভট্টাচার্য, দুর্গাপুর এম এ এম সি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বিমল দাশগুপ্ত, ছাত্রনেতা অসীম গাঙ্গুলী সহ বহু শিক্ষক ও শিক্ষা আন্দোলনের নেতা, ছাত্র আন্দোলনের নেতা এই পাষণ্ড জল্লাদদের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছিলেন। বাংলার ছাত্র আন্দোলনের যে গৌরবময় অতীত আছে, তাকে কলঙ্কিত করে গোটা ছাত্র সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে খান-খান করে দেওয়ার জন্য রাজ্যব্যাপী পরীক্ষাকক্ষে গণটোকাটুকি ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল। বর্তমানের অনেক কংগ্রেস নেতা তখনকার ছাত্রনেতা এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এক বৎসরের মধ্যে কোনো পরীক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি। বহু বিদ্যালয়গৃহ আগুন ধরিয়ে পুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তির শিরচ্ছেদ করা হয়েছিল, কংশাল নামধারীরা শিক্ষাবিধ্বংসী এই কাজে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কংগ্রেস দলের বিধায়ক তুহিন সামন্ত ১৯৭৪ সালের ১৭ই মার্চ বিধানসভায় বক্তৃতায় বলেছিলেন — "আজকে শিক্ষাজগতে এত বড় নৈরাজ্য, এত বড় হতাশা জীবনে বোধহয় কোনো দিন আসেনি।"

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির শুভলগ্নে সাক্ষরতার বিচারে পশ্চিমবঙ্গ ছিল দেশের দ্বিতীয় স্থানে — কেরলের পরেই। ঐ জমানায় সাক্ষরতায় দেশের সবথেকে নিচের নয়টির মধ্যে স্থান হলো পশ্চিমবঙ্গের। এই অমার্জনীয় অপরাধের কোনো ক্ষমা নেই।

বামফ্রন্ট সরকারের আমল

এই শ্বাসরোধকারী নৈরাজ্যের দুঃসহ অবস্থার অবসান ঘটিয়ে শিক্ষার ক্ষেত্রকে কলুষমুক্ত করা এবং শিক্ষা প্রদান ও গ্রহণের অনুকূল পরিমণ্ডল গড়ে তোলা ছিল প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের প্রথম এবং প্রধান কাজ। রাজ্যের সকল শিক্ষাপিপাসু মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থনপুষ্ট হয়ে দৃঢ়তার সাথে এই কাজ অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়।

শিক্ষা-ইমারতের' ভিত্তি প্রাথমিক শিক্ষা। তার উপযুক্ত সংস্কারসাধন এবং প্রাথমিক শিক্ষার অঙ্গনে সকল শিশুকে আনার বাস্তবানুগ কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে ডঃ হিমাংশু বিমল মজুমদার কমিটির সুপারিশ নিষ্ঠার সাথে বাস্তবায়িত করা হয়। পরবর্তী সময়ে রাজ্যে শিক্ষার যে সাফল্য তার ভিত্তিভূমি প্রকৃতপক্ষে তৈরী হয় প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই। সারা বিশ্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে প্রাথমিক স্তরে ভাষা হিসাবে একমাত্র মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার যথার্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিদ্যালয় স্তরে ছাত্রছাত্রী বৃদ্ধির হার বিবেচনায় আজ দেশের মধ্যে প্রথম পশ্চিমবঙ্গ, তার অন্যতম প্রধান কারণ প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের এই বাস্তবানুগ শিক্ষানীতি। যে হতদরিদ্র, সামাজিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ উপেক্ষিত বিশালসংখ্যক পরিবারে পূর্বে কখনও শিক্ষার আলোর রশ্মি পৌঁছয়নি, তাদের কাছে শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বকে অস্বীকার করে কোনো লোকায়ত সরকার তার শিক্ষানীতি রচনা করতে পারে না। এই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারও তা করেনি। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের শিশুদের ৭০শতাংশ বিদ্যালয়ে যেত ১৯৭৭ সালে, এখন যায় ৯৯ শতাংশ। শিক্ষার মানোন্নয়নে যতখানি না গুরুত্ব প্রথম সময় দেওয়া হয়েছিল, তার থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া ছিল সঠিকভাবে শিক্ষাকে সর্বজনীন করার দিকে। প্রথম বামফ্রন্ট সরকার প্রথমে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করে, পরে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করে সমগ্র ভারতে একটি নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ভূমি সংস্কারের কর্মসূচি, পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা, গ্রামীণ উন্নয়নের প্রকল্প এই কাজে সাহায্য করেছে। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত, কিউবা, চীন প্রমুখ দেশের দৃষ্টান্তও তাই। বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর প্রতিবেদনে আজ তাই কবুল করা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার মানের বিচারে দেশের শীর্ষস্থানীয় রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম পশ্চিমবঙ্গ, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেরালারও উপরে। একাধিক সর্বভারতীয় সমীক্ষাতেও এই সত্যের উল্লেখ আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে প্রকাশ, ঐ দেশে যে সকল ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি আছেন তার মধ্যে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী। লক্ষ্য করা যেতে পারে, এদের সকলেরই প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়েছিল বামফ্রন্ট সরকারের জমানায়।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিবেদন 'এলিমেন্টারী এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া-২০০৪-এ উল্লেখ করা হয়েছে — প্রারম্ভিক শিক্ষার স্তরে (প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি) দেশের মধ্যে একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে সেখানে জনসংখ্যার নারী-পুরুষের হারের তুলনায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ছাত্রীদের হার বেশি। কেরালার জনসংখ্যার ৫১.৪ শতাংশ নারী, আর বিদ্যালয় স্তরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে

ছাত্রীদের হার ৪৮.৮৫ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যার ৪৮.২ শতাংশ নারী, আর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৪৯.১ শতাংশ ছাত্রী। দেশের মোট ছাত্রীদের ৯শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭.৮ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে। আর দেশের মোট ছাত্রছাত্রীর ৮.৭শতাংশ এই রাজ্যে। কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশেষ তথ্যে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পে এই রাজ্যের সাফল্যের সপ্রশংস উল্লেখ আছে।

কলেজে শিক্ষক নিযুক্ত হন সারা দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের ঠিক করে দেওয়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্র থেকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নাম এনে লিখিত পরীক্ষা নিয়ে কম্পিউটারের সাহায্যে মেধাতালিকা তৈরী করে শিক্ষক নিযুক্ত হন একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় শিক্ষক নিয়োগ করা হয় স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাহায্যে একমাত্র এই রাজ্যে, আর কোথাও নয়। নিরপেক্ষভাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে এইভাবে শিক্ষক নিয়োগের জন্য সমস্ত রাজ্য থেকে এই রাজ্যকে অভিনন্দিত করা হয়েছে।

আর্থিক সংকটের কারণে গত ৩ বছর ধরে, কোথাও ৪ বছর ধরে বিদ্যালয়ে শূন্যপদে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ আছে, উড়িষ্যা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ সহ অধিকাংশ রাজ্যে। ব্যতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। শুধু শূন্যপদ পূরণ করাই হচ্ছে তা নয়, মাধ্যমিক স্তরে ২১,১৩৪টি, মাদ্রাসায় ১২০টি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০,২১৪টি অতিরিক্ত সর্বক্ষণের শিক্ষকের পদ মঞ্জুর করা হয়েছে। সারা দেশে অতীতে কোনো বৎসরে, কোনো রাজ্যে এক বৎসরে শিক্ষকের এতগুলি অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হয়নি। কলেজে অতিরিক্ত অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি হয়েছে ৫০০টি।

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে প্রতিষ্ঠানগত শিক্ষার সুযোগ যারা নানা কারণে গ্রহণ করতে পারবেন না, তাদের জন্য শিক্ষার চাহিদা দূর করতে এক অনন্যসাধারণ ব্যবস্থা হয়েছে।

সাক্ষরতা, সমাজ সচেতনতা এবং বিজ্ঞানমনস্কতা আন্দোলনে গতি সঞ্চার করার জন্য যে উদ্যোগ বামফ্রন্টের আমলে গ্রহণ করা হয়েছে, রাজ্যে সাক্ষরতার হার বৃদ্ধির সাথে সর্বক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়েছে। বর্তমানে রাজ্যে ২৬,৮৬৭টি কেন্দ্রে প্রবহমান শিক্ষার কর্মসূচি চলছে।

বাণীপুরে সরকারী আবাসিক ক্রীড়া বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। নিখরচায় এখানে সম্ভাবনাময় ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা ও ক্রীড়া অনুশীলন করার সুযোগ পাচ্ছে। বিদ্যালয় স্তরে সর্বভারতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রতিবারে পশ্চিমবঙ্গ বার্ষিক সাফল্যের বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান পাচ্ছে এবং সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্রছাত্রী জাতীয় বৃত্তি পাচ্ছে।

কিদোয়াই কমিটির সুপারিশ মেনে মাদ্রাসার স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রেখে কম্পিউটার সহ আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। ভারতের অধিকাংশ রাজ্য, কেন্দ্রীয় সরকার, ইউনিসেফ এবং ইউনেস্কো এই ব্যবস্থাকে অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত বলে উল্লেখ করেছে।

বামফ্রন্ট সরকারই এই রাজ্যের শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমাজকে যথোচিত মর্যাদা দিয়েছে। শিক্ষার অঙ্গনে যে ত্রুটি-দুর্বলতাগুলি এখনও আছে, তাকে সঠিকভাবে দূর করতে তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা অতীতে পাওয়া গেছে, ভবিষ্যতেও পাওয়া যাবে বলে বামফ্রন্ট মনে করে

উচ্চশিক্ষার শুধু সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়েছে তাই নয়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক পরিচালন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়েছে, শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে, অত্যাধুনিক অনেক বিষয় যেমন কম্পিউটার বিজ্ঞান, বায়োটেকনোলজি, ইনফরমেশন টেকনোলজি, মলিকুলার বায়োলজি প্রভৃতি বিষয়গুলি প্রবর্তন করা হয়েছে, যেখানে থেকে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা গ্রহণ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বীয় যোগ্যতার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ তারা, কল্যাণী এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় তিন তারার সম্মানে ভূষিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আজ সগৌরবে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় আজ বাঙ্গালোরকে পিছনে ফেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে কলকাতা। বাংলার ছেলেমেয়েদের বিশাল অর্থ ব্যয় করে ভিন রাজ্যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি প্রভৃতি শিক্ষালাভের জন্য ছুটতে হচ্ছে না, নিজ রাজ্যে স্বল্প ব্যয়ে সেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ তারা পাচ্ছেন। উচ্চশিক্ষার মান এই রাজ্যে যে উন্নত তার অন্যতম প্রমাণ নেট, স্লেট পরীক্ষায় এই রাজ্যের প্রার্থীর উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হচ্ছেন, কিন্তু শিক্ষান্তে কাজের সংস্থান যদি না করা যায়, এদের জীবন হতাশায় আক্রান্ত হবে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা হচ্ছেও। জাতীয় আর্থ-সামাজিক কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাজ্য সরকারের নেই। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকেও এই রাজ্য সরকার বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা পরিষদ। তাদের পরিচালনায় রাজ্যে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত সমিতির অধীনে যাতে অন্তত একটি করে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা যায় তার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আসন্ন শিক্ষাবর্ষ থেকে তার অনেকগুলি চালু হয়ে যাবে। পলিটেকনিক ও আই টি আই পাশাপাশি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চলবে।

এই রাজ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যের নতুন উদাহরণ রচনা

করেছে, তাতে কোনো সংশয় নেই। কিন্তু তাতে আত্মপ্রসাদ লাভ করার কোনো অবকাশ নেই, আত্মসন্তুষ্টির কোনো স্থান নেই। যা করা হয়েছে তা যেমন অনেক, এখনও যা করা যায়নি, করার অপেক্ষায় আছে, তাও তেমনি অনেক। একাধিক কারণে এই রাজ্যের কাছে অবশিষ্ট ভারতের আকাঙ্ক্ষা একটু বেশি। সঙ্গত কারণে পশ্চিমবঙ্গের কাছে তাদের প্রত্যাশার মাত্রা একটু অধিক। এটা পশ্চিমবঙ্গের গর্ব। রাজ্যবাসী এবং ভারতবাসীর কথা মনে রেখেই রাজ্যে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার সাফল্যের নবদিগন্ত রচনা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সর্বজনীন প্রারম্ভিক শিক্ষার আওতায় সকলকে আনা, বিদ্যালয়-ছুট সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা, সকল স্তরে শিক্ষার মানকে উন্নত করা, বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করা, বেশি বেশি সংখ্যায় অত্যাধুনিক বিষয় শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা, উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রকে আরো প্রশস্ত করার দৃঢ়প্রত্যয়কে মূলধন করেই বামফ্রন্ট ব্যাপক মানুষের সমর্থন নিয়ে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার অগ্রগতির চিত্র

বিদ্যালয় শিক্ষা

	১৯৭৭	২০০৬
প্রাথমিক শিক্ষা		
বিদ্যালয়	৪১,০০০	৫০,২৫৫
শিশু শিক্ষাকেন্দ্র	—	১৬,০৭৯
ছাত্রছাত্রী	৫২,০০,০০০	১,০৫,০০,০০০
শিক্ষক	১,২৬,০০০	১,৭৮,০০০
শিক্ষা সহায়ক	—	৪১,৮৯৩
মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক		
জুনিয়র হাইস্কুল	৩,২০১	১,৩৭৮
হাইস্কুল	৩,৬৬৬	৯,৫১৪
হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল	৯৬৭	৩,৮৯১
মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র	—	১,৫৯৩
শিক্ষা সম্প্রসারক	—	৬,১৯৮
মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী	২,০৫,০০০	৭,৬৪,২৩২
পাশের হার	৪৩%	৭০.৫%
উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী	৫৮,০০০	৪,৩৪,৫৭১
পাশের হার	৫১.৪%	৬৮%
শিক্ষক	৭৪,৯৬৪	১,৫১,৮৫৬
রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের নথিভুক্ত শিক্ষার্থী	—	১,৯২,৬১৩
স্কুল সার্ভিস কমিশন (আইন হয় ১৯৯৭ সালে) থেকে পাঠানো শিক্ষক	—	৬৪,২৭৩
প্রধান শিক্ষক	—	৫,২৭৩
মাদ্রাসা শিক্ষা		
সিনিয়র মাদ্রাসা	৭৫	১০৩
জুনিয়র মাদ্রাসা	৭১	৮৭
হাই মাদ্রাসা	৯২	৩৬২
উচ্চমাধ্যমিক-সম্পন্ন মাদ্রাসা	—	৭৯
পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	৩,৯৯৩	২৭,৭১৮
শিক্ষক/শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা	১,৭৮৫	৭,৭৬৩
বাজেট	৫.৮ লক্ষ টাকা	১৮৮ কোটি টাকা

উচ্চশিক্ষা	১৯৭৭	২০০৬
কলেজ	২৪৪	৩৭৫
ছাত্রছাত্রী (আন্ডার গ্রাজুয়েট)	৪৬,০০০	২,৩১,০৩৯
পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কলেজ	—	৬৪
বি এড কলেজ	৪৮	৮৪
শারীর শিক্ষার কলেজ	৯	১৭
আইন কলেজ	৭	১৯
ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ	৯	৫৬
ইঞ্জিনিয়ারিং আসন	১,৭২৪	১৪,৩১৯
ম্যানেজমেন্ট কলেজ	৫	২৭
এম সি এ কলেজ	২	২৬
বিশ্ববিদ্যালয়	৭	১৪
নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিভুক্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা (১৯৯৭ সালে স্থাপিত)	—	৭৫,০৩৩

গ্রন্থাগার

	১৯৭৭	২০০৬
সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার	৭৬২	২,৪৮০
বে-সরকারী গ্রন্থাগারগুলিকে আর্থিক অনুদান	—	২৪৬
মোট কর্মচারী	১,৮০১	৫,৪৩১

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বাজেট

	১৯৭৭	২০০৬
শিক্ষাখাতে মোট ব্যয় বরাদ্দ	১১৪ কোটি	৫,৮৮২কোটি টাকা

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কত অংশ সরকারী আর্থিক সাহায্যবিহীন বিদ্যালয়ে পড়ে

	প্রাথমিক	মাধ্যমিক
বিকাশমান দেশের গড়	১০.৯%	১৪.৯%
বিশ্বের গড়	৭.২%	১১.৭%
ভারতের গড়	১৫.৫%	৪২%
পশ্চিমবঙ্গের গড়	৪.৩%	৫%

তথ্য কথা বলে ঃ

আয়বৃদ্ধির শীর্ষে পশ্চিমবঙ্গই

১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৩-০৪ সাল পর্যন্ত প্রধান রাজ্যগুলির উন্নয়ন চিত্র

রাজ্য	শতকরা হারে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনজনিত আয়ের গড় বার্ষিক বৃদ্ধি	শতকরা হারে মাথাপিছু আয়ের গড় বার্ষিক বৃদ্ধি
	(১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৩-০৪)	(১৯৯৯-২০০০ থেকে ২০০৩-০৪)
অন্ধ্রপ্রদেশ	৫·৪৪	৪·৪২
গুজরাট	৬·৭১	৪·৪০
কর্ণাটক	৫·৮৮	৪·৫৩
মহারাষ্ট্র	৪·৯২	৩·১৬
তামিলনাড়ু	৩·৩১	২·৩৫
পশ্চিমবঙ্গ	৭·০৬	৫·৬৬

তথ্য কথা বলে ঃ

দ্রুত বাড়ছে শিল্প বিনিয়োগ

উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ (কোটি টাকায়)

	এপ্রিল ২০০০	এপ্রিল ২০০১	এপ্রিল ২০০২	এপ্রিল ২০০৩	এপ্রিল ২০০৪	এপ্রিল ২০০৫
মোট বিনিয়োগ	৫১৯৪৬·৮৮	৫২৫৬৬·২১	৫৬৬৫০·৯৭	৬৩৩৮৫·৯৮	৭৩৮৩৫·৫২	৯৯০২২·১৯
উৎপাদক শিল্প	৭৯৫৯·৭০	৭৯১৬·৯৫	১০৪৬৪·৪৪	৬৮১৩·৮৫	৬০৫৯·০৬	২৩৭৩৩·০০
খনন শিল্প	২১১৬·৯২	২৪৩৬·০২	১৮৪৫·৭৫	১৪৭৪·৬০	২৯৬১·৩৭	২৬২৮·৮৯
বিদ্যুৎ	২৪০৩৩·০১	১৯১৩০·০১	২১৩৩৯·০৯	২৮১৩৭·০৯	৩০৬৭৫·৭৩	৩৬০৩৬·২৯
পরিষেবা	১৬৩৪৩·৩৮	১৯৯৫৪·৮৭	১৯৭২৫·৬৬	২২৩৪৬·৯৭	২৮৮৬৭·৯০	২৮৪৯৮·১৮
সেচ	১০৭৭·৩৭	১০৭৭·৩৭	১০৭২·৪৬	১০৭২·৪৬	১০৭২·৪৬	১০৫৫·৮৯
নির্মাণ শিল্প	৪১৬·৫০	২০৫০·৯০	২২০৩·৫৭	৩৫৪১·০১	৪১৯৯·০০	৭০৬৯·৯৪
রূপায়িত হচ্ছে এমন প্রকল্প	১৭০১৬·৯৭	২০১৭১·৬০	১৮৮৪২·৯৯	২০২৫৯·৮১	২৫৬৮৩·৮৬	২৬৬৫৬·৫০

উৎস : অ্যানুয়াল রিভিউ অব ওয়েস্টবেঙ্গল ইকনমিক সেন্টার ফর মনিটরিং, ইন্ডিয়ান ইকনমি ২০০৪-০৫

তথ্য কথা বলে ঃ

শ্রমশক্তির বৃদ্ধির চেয়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার বেশি

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থানে গড় বার্ষিক যৌগিক বৃদ্ধির হার—১৯৯৯-২০০০ (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৫৫ তম পর্ব) এবং ২০০৩ (জাতীয় নমুনা সমীক্ষা ৫৯ তম পর্ব)-এর মধ্যে

	পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চল		পশ্চিমবঙ্গের শহরাঞ্চল	
	শ্রমশক্তি	কর্মসংস্থান	শ্রমশক্তি	কর্মসংস্থান
পি এস	১·৭৬	২·০৯	১·৩১	১·৯৮
পি এস + এস এস	২·২৮	২·৫২	১·৭৮	২·৫২

তথ্য কথা বলে ঃ

শিক্ষার আওতায় আরো শিশু

সর্বশিক্ষা অভিযানের ফলে বিদ্যালয়ের আওতার বাইরে থাকা শিশুর সংখ্যা কমেছে দ্রুত হারে। আগে এই সংখ্যা ছিলো যেখানে ৩৫ লক্ষ ২ হাজার, সেখানে বর্তমানে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮ লক্ষ ৯৬ হাজার। শুধু তাই নয়, স্কুলছুটদের সংখ্যা হ্রাস এবং বিদ্যালয়ে নথিভুক্তির সংখ্যা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। বর্তমানে প্রাথমিকস্তর এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এই নথিভুক্তির হার যথাক্রমে ৯৮ শতাংশ এবং ৭৪·৬ শতাংশ।

তথ্য কথা বলে ঃ

স্বনির্ভরগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে সাড়ে ৩ লক্ষ

রাজ্যে বর্তমানে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩লক্ষ ৪৭ হাজার। এদের সদস্য সংখ্যা প্রায় ৩৫ লক্ষ, যার মধ্যে ৮৮ শতাংশই মহিলা। এই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার গোষ্ঠী ইতোমধ্যেই নিজেদের সঞ্চয়ের ভিত্তিতে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। ৯১ শতাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা সেই ঋণ পরিশোধও করেছেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির পর্যালোচনার ভিত্তিতে দেখা গেছে যে, এরাজ্যে স্বনিযুক্তি প্রকল্পগুলি রূপায়ণের মাধ্যমে বর্তমান বছরে অন্তত ২ লক্ষ ৪২ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি হতে পারে যার সমস্তটাই হবে বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্প এবং পরিষেবার বিকাশের মাধ্যমে।

তথ্য কথা বলে ঃ

আনারসেও এবার প্রথম

ধান, মাছ, সবজি উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ গোটা দেশের মধ্যে নজির সৃষ্টি করেছে আগেই। কিন্তু এঁখন আনারস উৎপাদনেও এরাজ্য প্রথম। লিচু উৎপাদনে দ্বিতীয়। আমের উৎপাদনে এরাজ্য অষ্টম স্থান অধিকার করেছে গোটা দেশের মধ্যে। শস্য বৈচিত্র্যকরণের যে কর্মসূচী রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছিলো তার সুফল মিলছে।

তথ্য কথা বলে ঃ

সামাজিক সুরক্ষায় নির্মাণকর্মীরাও

এখনো পর্যন্ত অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রকল্পে নথিভুক্ত হয়েছেন প্রায় ৬ লক্ষ ৬৭ হাজার শ্রমিক। আর নির্মাণকর্মীদের জন্য যে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু হয়েছে তার ফলে প্রায় ২০ লক্ষ নির্মাণকর্মী উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে মূলত নির্মাণ সংস্থার কাছ থেকে নির্মাণ খরচের ১ শতাংশ হারে সেস সংগ্রহ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে গঠিত তহবিল থেকে প্রতি শ্রমিককে অবসরকালীন ভাতা, চিকিৎসার খরচ, গৃহনির্মাণ ঋণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে।

উৎস ঃ গণশক্তি, ১০ই মার্চ, ২০০৬

তথ্য কথা বলে ঃ

সারণি-১১

মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ফলাফল (শতকরা হারে)

	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২
প্রথম বিভাগ	১৮·৯৪	২০·২১	১৮·৫৩	১৯·৮৬	২০·৩৮	২৭·৮৮
দ্বিতীয় বিভাগ	৩৩·৮১	৩৬·৭০	৩৬·০২	৩৭·৭০	৩৮·০৪	৫৮·২৫
তৃতীয় বিভাগ	১৫·৩৯	১২·৫৫	১৪·৩৯	১২·৮৮	১১·৮০	১৩·৮৬
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	৬৮·১৪	৬৯·৪৬	৬৮·৯৪	৭০·৪৪	৭০·২২	৭০·১৯

সৌজন্যে ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত — পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন চিত্র একনজরে

তথ্য কথা বলে ঃ

সারণি-১২

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ফলাফল (শতকরা হারে)

	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩
প্রথম বিভাগ	১১·৭১	১৫·২৩	১৭·৪৭	২০·১১	১৮·১৮	১৯·৭৬	২১·৯১
দ্বিতীয় বিভাগ	৪৪·৪৪	৪৭·৪২	৪৭·৭৯	৪৭·৫৯	৪৮·৫০	৪৯·৪৪	৪৯·৩১
তৃতীয় বিভাগ	৪৩·৮৫	৩৭·৩৬	৩৫·৭৪	৩২·৩০	৩৩·৩৩	৩০·৮০	২৮·৭৯
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	৫১·৩৪	৬০·৩৬	৬৪·৭৭	৬৪·৩০	৬৬·৪৫	৬৫·৩২	৬৪·৬৫

তথ্য কথা বলে ঃ

সারণি-১৩

হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ফলাফল (সংখ্যায়)

	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩
প্রথম বিভাগ	১৫৩	১৯০	৫০৩	৫৬৩	৮৭৯	১০৫৯	১২২৫
দ্বিতীয় বিভাগ	২১৫৭	২৫০৪	৩২৩৪	৩৮৭৯	৪৯৩২	৫৭৩৭	৬১৪৯
তৃতীয় বিভাগ	৮১৬৮	৩৭৭৬	২৯৮০	৩১৮৬	৩০২৪	৩২৭৬	৩১৬৮
উত্তীর্ণ পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	৬০৯৫	৭১০৪	৭২৪৮	৮৩১২	৯৫৮৬	১০০২০	১০৫৪২

সৌজন্যে ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত — পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়ন চিত্র একনজরে

আসন্ন চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাজ্যের আটটি বামপন্থী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের আহ্বানে

যৌথ নির্বাচনী কনভেনশন

প্রিয় বন্ধু,

আসন্ন চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাজ্যের আটটি বামপন্থী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের আহ্বানে আগামী ১৬ই মার্চ, ২০০৬ নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতির রাজ্য দপ্তর সত্যপ্রিয় ভবনের রবিকক্ষে (পি-১৪, গণেশচন্দ্র এভেনিউ, কলকাতা-১৩) বেলা ৪টেয় একটি যৌথ নির্বাচনী কনভেনশন অনুষ্ঠিত হবে।

ঐ কনভেনশনে বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্য বামফ্রন্টের সভাপতি মাননীয় বিমান বসু এবং পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় কান্তি বিশ্বাস।

কনভেনশনটি সফল করতে সকল সংগঠনের সদস্যবন্ধুদের ফেস্টুন সহ ঐদিন যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে আহ্বান জানাচ্ছি।

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
সাধারণ সম্পাদক
নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

রাজকুমার রাহা
সাধারণ সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ

অমিয় বসু
সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গীয় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমিতি

তড়িৎ ব্রহ্মচারী
সাধারণ সম্পাদক
সারা বাংলা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি

প্রদীপ বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক
নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

সুকুমার চক্রবর্তী
সাধারণ সম্পাদক
প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ (পশ্চিমবঙ্গ)

জওহরলাল চ্যাটার্জী
সাধারণ সম্পাদক
বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

সুদীপ নারায়ণ গোস্বামী
সাধারণ সম্পাদক
সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

২৮.০২.২০০৬

আসন্ন চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাজ্যের আটটি বামপন্থী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের আহ্বানে

যৌথ নির্বাচনী কনভেনশন

সত্যপ্রিয় ভবন (রবিকক্ষ)

১৬ই মার্চ, ২০০৬

গৃহীত প্রস্তাব

পশ্চিমবঙ্গে চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচন হবে ১৭ই এপ্রিল থেকে পাঁচটি পর্যায়েঃ ১৭, ২২ ও ২৭শে এপ্রিল এবং ৩রা এবং ৮ই মে। ১৯৭৭ সালে অষ্টম বিধানসভা নির্বাচন থেকে গত ত্রয়োদশ নির্বাচন পর্যন্ত উপর্যুপরি ছ'বার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বামফ্রন্টের পক্ষে তাঁদের অবিচল আস্থা জ্ঞাপন করে বিশ্বে সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শত প্রতিকূলতা ও সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকার শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষের স্বার্থে কাজ করে চলেছে দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে। বামফ্রন্ট সরকারকে রক্ষা করতে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে নিহত হয়েছেন সাড়ে চার হাজারের বেশি বামপন্থী-কর্মী-সমর্থক-নেতা ও দরদী বন্ধু। সন্দেহ নেই, পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে ব্যর্থ করে চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে এ রাজ্যে সপ্তমবারের জন্য বামফ্রন্ট সরকার গঠন করবে।

দেশের আর্থিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-বৈদেশিক-অভ্যন্তরীণ নীতির প্রশ্নে কেন্দ্রের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের সঙ্গে বামপন্থীদের মৌলিক পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো রক্ষার স্বার্থে ন্যূনতম সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারকে বামপন্থীরা বাইরে থেকে শর্তসাপেক্ষে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই জোট সরকার নয়া উদার অর্থনীতি অনুসরণ করে দেশের শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ-বিরোধী কাজ করে চলেছে। কৃষিসহ বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে ভর্তুকি হ্রাস, পেট্রোপণ্যের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিলগ্নীকরণ, গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক পরিষেবার বেসরকারীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলছে। এরা স্বাধীন বৈদেশিক নীতির থেকে দূরে সরে গিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের অনুকূলে কাজ করছে। কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের এই জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে লাগাতার সংগ্রামকে শক্তিশালী করতে এ রাজ্যে গঠন করতে হবে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার।

বামপন্থীরাই গোটা দেশে গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করতে এবং একে রক্ষা করার জন্য সংগ্রাম করছেন। তাই এ রাজ্যে চাই বামফ্রন্ট সরকার।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়ন ও উদারনীতির বিরুদ্ধে এবং মৌলবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রামকে আরও শক্তিশালী করতে এ রাজ্যে চাই বামফ্রন্ট সরকার।

সর্বনাশা নয়া উদার অর্থনীতির একটি বিকল্প গড়ে তোলার জন্য এ রাজ্যে চাই বামফ্রন্ট সরকার।

গত ২৯ বছরে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার জনমুখী নীতি নিয়ে কৃষি ও গ্রামীণ ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন এনেছে। এ রাজ্যে ৭৮ শতাংশ জমিই এখন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের হাতে যেখানে সারা দেশে ৬০ শতাংশ কৃষিজমি রয়েছে ১৫ শতাংশ মানুষের হাতে। মোট পাট্টাপ্রাপক ২৮ লক্ষ।

রেকর্ডভুক্ত বর্গাদারের সংখ্যা ১৫ লক্ষ। ১৯৯১-এ চাষযোগ্য জমি ছিল ১ কোটি ২৫ লক্ষ হেক্টর, ২০০১-এ তা বেড়ে হয়েছে ১ কোটি ৩৭ লক্ষ হেক্টর।

১৯৯৫-৯৬ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদনশীলতা ছিল হেক্টর প্রতি ১৯৬০ কেজি, ২০০৩-০৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৪২১ কেজিতে। এখন লক্ষ্য, কৃষির নিবিড়তা ১৯০ শতাংশ করা। ফল ও সবজি চাষ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে গ্রামীণ সমাজে রাজনৈতিক-সামাজিক কর্তৃত্বের ভারসাম্যের বদল ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

১৯৭৭ সালে যখন বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখন ৫০ শতাংশেরও অনেক বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতেন এ রাজ্যে। আজ সে পরিস্থিতি নেই। গত ২৯ বছরে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা এ রাজ্যে কমেছে দ্রুতহারে। এখন ২৪ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করেন অর্থাৎ রাজ্যের ২৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে এসেছেন। গ্রামাঞ্চলে অ-কৃষি কাজে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, শহরে-গ্রামে সর্বত্রই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বেড়েছে। গরিব অংশের মানুষ, বিশেষত অনগ্রসর গরিব মহিলাদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠী গড়ে তোলার অভিযানে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। রাজ্যে প্রায় তিন লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে প্রায় ৩৫ লক্ষ গরিব মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। এর মধ্যে ৮৮ শতাংশই মহিলা।

বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে নতুন শিল্প গড়ে তোলার ও পুরানো ঐতিহ্যশালী শিল্পগুলি রক্ষার কাজকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। বিনিয়োগই শুধু নয়, প্রতিষ্ঠিত শিল্প ইউনিটের সংখ্যার দিক থেকেও শিল্পে উন্নত রাজ্যগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গ। ১৯৯৪ সাল থেকে লাগাতার প্রচেষ্টার ফলে এ রাজ্যে শিল্পে পশ্চাদপদতা কাটছে। ১৯৯২-৯৩ সালে এ রাজ্যে গড় বার্ষিক বিনিয়োগ ছিল ৪৫০ কোটি টাকা। ২০০৪-০৫-এ বার্ষিক গড় বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ২২০০ কোটি টাকায়।

ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষির বিকাশ ঘটায় এ রাজ্যে গ্রামোন্নয়ন ঘটে গ্রামীণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। ফলে বেড়েছে শিল্পদ্রব্যের চাহিদা। তাই শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ছে। সবচেয়ে গুরুত্ব বেড়েছে কৃষির সঙ্গে যুক্ত খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে। এমন ১৮৭টি ইউনিট গড়ে উঠেছে।

তথ্যপ্রযুক্তিতে রাজ্যে বৃদ্ধির গড় হার ৮৮ শতাংশ যা জাতীয় গড়ের দ্বিগুণ। তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের অন্যতম লক্ষ্যই পশ্চিমবঙ্গ। তথ্যপ্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি সহায়ক পরিষেবার ২৩৫টি ইউনিট গড়ে উঠেছে পশ্চিমবঙ্গে। তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা, সহায়ক পরিষেবা ক্ষেত্রের দ্রুত বিকাশে কর্মসংস্থানে গতি বেড়েছে।

লৌহ, ইস্পাত, পেট্রোরসায়ন, টেক্সটাইল শিল্পেও বিনিয়োগ বাড়ছে। রাজ্যের উদ্যোগে গড়ে উঠছে শিল্পভিত্তিক শিল্পতালুক।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পেও এই সময়কালে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেছে।

রাজ্যের মধ্যবিত্ত পরিবারের শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের তথ্য-প্রযুক্তি এবং তৎসংক্রান্ত পরিষেবার ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা পূরণের জন্য এই সময়কালে ইঞ্জিনীয়ারিং, পলিটেকনিক ও অন্যান্য পেশাগত শিক্ষাদানের কেন্দ্র উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে উঠেছে। সম্প্রতি সরকার একটি পৃথক কাউন্সিল গঠন করেছেন কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য। দ্রুত নগরায়নের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে রাজ্যে কলকাতা ও শহরতলি ছাড়া বড় বড় জেলা ও মহকুমা শহরগুলিতে আবাসন, উপনগরী ইত্যাদি গড়ে উঠছে। এই সব নির্মাণ কাজে অসংখ্য শ্রমিক যেমন কাজ পাচ্ছে, তেমনি এগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও বহুগুণ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বিরাজ করছে।

পশ্চিমবঙ্গ দেশের একমাত্র রাজ্য, যেখানে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৩·৭ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করা হয়, যেখানে জাতীয় গড় ২·৮ শতাংশ। শিক্ষা বাজেটের ৮৬ শতাংশ ব্যয়িত হয় বিদ্যালয় শিক্ষাখাতে।

প্রাথমিক স্তরে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র সহ এখন বিদ্যালয় সংখ্যা ৬৮,১৩৮।

মাধ্যমিক স্তরে মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র সহ বিদ্যালয় সংখ্যা ১২,০৮৬।

১৯৯১ সালে সাক্ষরতার হার এ রাজ্যে ছিল ৫৭·৭ শতাংশ। ২০০১ সালে তা হয়েছে ৬৮·৬০ শতাংশ। গত এক দশকে ১০·৯০ শতাংশ সাক্ষরতার হারে বৃদ্ধি ঘটেছে। মহিলা সাক্ষরতার হার ৪৬·৫৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬০·২২ শতাংশ। বৃদ্ধির হার ১৩·৬৬ শতাংশ। ১৯৭৬ সালে ড্রপ আউটের হার ছিল ৭০ শতাংশ। ২০০২

সালে তা কমে হয়েছে ৩৬·৪১ শতাংশ। ড্রপ আউট রুখতে সর্বত্র চালু হয়েছে মিড-ডে মিল এবং সর্বশিক্ষা অভিযান কর্মসূচির বাস্তবায়ন। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের ৬টি ভাষায় ৮৪ ধরনের প্রায় সাড়ে তিন কোটি পাঠ্যপুস্তক প্রতি বছর বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে প্রাথমিক বিদ্যালয় বেড়েছে ৩০ শতাংশের বেশি। পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। তফসিলী জাতি ও উপজাতিদের মধ্যে ভর্তির হার প্রায় ৯০ শতাংশ।

উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীনে রয়েছে ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৪৫০টি ডিগ্রি কলেজ, ২৯টি আই টি আই, ৪৩টি পলিটেকনিক কলেজ ও ৬৭টি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ। এছাড়া ২৩টি ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট ও ২৯টি শারীর শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সঙ্গীত ও কলাশিক্ষা বিষয়ক কলেজ আছে।

গত ২৯ বছর ধরে অনুসৃত শিক্ষানীতি শুধু যে ব্যাপক অংশের সাধারণ মানুষকে শিক্ষার আওতায় এনেছে তা নয়, শিক্ষার মানকেও উন্নত করতে সফল হয়েছে। শহরকেন্দ্রিক মেধা পরিচিতির পরিবর্তে জেলাকেন্দ্রিক মেধা পরিচিতি প্রমাণ করে যে, সারা রাজ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার সমদৃষ্টি প্রদান করেছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থানকারী পরিবার থেকেও ছাত্র-ছাত্রীরা মেধাতালিকায় শীর্ষে নিজেদের স্থান করে নিচ্ছে। মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা এবং উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান।

বিশ্বব্যাঙ্ক প্রাথমিক শিক্ষার মান নির্ণয় করতে সারা ভারতে যে সমীক্ষা করে নব্বই দশকের মাঝামাঝি, তাতে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বোচ্চ মানের রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ স্থান পেয়েছে। এন সি ই আর টি'র মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনামূলক সমীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র-ছাত্রীরা শীর্ষস্থান লাভ করে। ১২টি মাতৃভাষায় পরীক্ষা দেবার সুযোগ রয়েছে এ রাজ্যে।

সময়ের সঙ্গে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক পাঠক্রমে নতুন নতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বিদ্যালয় স্তরে কম্পিউটার শিক্ষার প্রচলন ছাড়া বিজ্ঞানশাখার স্নাতক স্তরেও মাইক্রোবায়োলজি, সেরিকালচার এনভেরনমেন্টাল সায়েন্স ; কারিগরি শিক্ষায় অ্যাপ্লায়েড ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল ইঞ্জিনীয়ারিং, ফুড টেকনোলজি প্রভৃতির প্রচলন বামফ্রন্ট সরকারের দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কলকাতা, যাদবপুর, বর্ধমান, কল্যাণী, বিদ্যাসাগর, উত্তরবঙ্গ ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়কে মানসম্পন্ন সংস্থা হিসাবে নির্বাচন করে এ রাজ্যের শিক্ষার মান যে উন্নত তা প্রমাণ করেছে। বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে যাঁরা সঠিক যোগ্যতায় গড়ে তুলেছেন সেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সম্মান দক্ষিণা বৃদ্ধি করে অন্যান্য চাকুরির সমতুল সামাজিক অবস্থানে উন্নীত করেছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকতার কাজে যোগ দিতে পারছেন সম্মানের সঙ্গে। প্রতি বছর এস এস সি'র মাধ্যমে গড়ে ১০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হচ্ছেন। এইভাবে এ বছর ২২ হাজার শিক্ষক নিযুক্ত হতে চলেছেন এ রাজ্যে। সারা দেশে এর নজির নেই। শত আর্থিক সীমাবদ্ধতা ও সংকটের মধ্যেও ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৭২১ জন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের নিয়মিত পেনসন, গ্র্যাচুইটি ইত্যাদি প্রদান করে চলেছে বামফ্রন্ট সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার নয়া উদারনীতি গ্রহণ করার ফলে তার প্রভাব পড়েছে শিক্ষাব্যবস্থার ওপর। শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ব্যয় কমছে। জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ ব্যয় করার কোনো উদ্যোগ নেই বর্তমান ইউ পি এ সরকারের। উপরন্তু শিক্ষাকে পণ্য হিসাবে গণ্য করে, গ্যাটস্ চুক্তি, ২০০০-এর শর্ত রক্ষা করতে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। অবাধে বিদেশী পুঁজি ঢুকে পড়ছে আমাদের দেশে শিক্ষাক্ষেত্রে। শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের ফলে শিক্ষা বেচে মুনাফা করার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার বেসরকারীকরণের সুযোগ নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে মৌলবাদী শক্তিরও অনুপ্রবেশ ঘটছে। তাই শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ও বেসরকারীকরণ রুখতে এ রাজ্যে চাই বামফ্রন্ট সরকার।

শিক্ষাতত্ত্ব থেকে শুরু করে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন পর্যন্ত সব কিছুই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা বামফ্রন্ট সরকারের একটি বিশেষত্ব। শিক্ষাতত্ত্ব বা শিক্ষাবিজ্ঞান সংক্রান্ত সব পরিবর্তনই শিক্ষা কমিটি ও কমিশনের পরামর্শে সম্পন্ন হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসারে বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আধুনিক শিক্ষার আওতায় আনার জন্য ১৯৯৫ সাল থেকে মাদ্রাসার পাঠক্রম মাধ্যমিক পাঠক্রমের সমতুল করা হয়েছে। এ আর কিদোয়াই কমিটির মূল্যবান পরামর্শ গ্রহণ করে

মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও উন্নতমানে পৌঁছে দেবার চেষ্টা অব্যাহত আছে।

রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় চালু করে বিদ্যালয়-ছুট্ ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে এ রাজ্যে। রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট প্রথাগত বিদ্যালয়ের সমতুল বলে ঘোষিত হয়েছে। কংগ্রেস আমলে ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত শিক্ষার হাল কী ছিল তা মানুষের অজানা নয়। পরীক্ষা কবে হবে কেউ জানত না। ফল প্রকাশ ছিল সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, গণটোকাটুকি চলত অবাধে, শিক্ষায় ছিল সমাজবিরোধীদের কর্তৃত্ব। শিক্ষকদের খুন করা, বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে পুড়িয়ে মারা, বিদ্যালয়ে অগ্নিসংযোগ, শিক্ষককে পাড়াছাড়া করা ছিল এ সময়ের প্রতিদিনের ঘটনা। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং শিক্ষাকে নৈরাজ্যের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য তাঁদের আত্মত্যাগ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাদরদী বামফ্রন্ট সরকার গঠনে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছে।

বৃহৎ ধনী বা তাদের রাজনৈতিক উকিল, বাজার-দায়বদ্ধ বুদ্ধিজীবী এবং সংবাদমাধ্যমের মহাজোট যতই কুৎসা করুক, পশ্চিমবাংলার শিক্ষাদরদী জনগণ বামফ্রন্টের ওপর গভীর আস্থা রাখেন। বামফ্রন্ট বিরোধী সকল প্রকার চক্রান্তকে ব্যর্থ করে নীতিহীন, কর্মসূচিহীন কংগ্রেস-তৃণমূল কংগ্রেস-বি জে পি'র সুবিধাবাদী আঁতাতকে পশ্চিমবাংলার জাগ্রত জনগণ পরাস্ত করবেই।

আজকের এই কনভেনশন পশ্চিমবাংলার চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করার জন্য জনগণের কাছে আবেদন করছে এবং তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সমর্থনে এ রাজ্যে যে উন্নততর সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবেই, এ বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করছে।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি
পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ
বঙ্গীয় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমিতি
সারা বাংলা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সমিতি

নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি
প্রাথমিক শিক্ষক সংঘ (পশ্চিমবঙ্গ)
বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি
সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

প্রতিবেদন

আটটি বামপন্থী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের আহ্বানে যৌথ নির্বাচনী কনভেনশন

স্থান ঃ সত্যপ্রিয় ভবন। রবিকক্ষ

তারিখ ঃ ১৬ই মার্চ, ২০০৬

আসন্ন চতুর্দশ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ১৬ই মার্চ, ২০০৬, সত্যপ্রিয় ভবনের রবিকক্ষে ঘরঠাসা শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীদের উপস্থিতিতে রাজ্যের ৮টি বামপন্থী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের আহ্বানে যৌথ নির্বাচনী কনভেনশন হয়ে গেল। সভার অন্যতম বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট কমিটির সভাপতি বিশিষ্ট জননেতা মাননীয় বিমান বসু ও পশ্চিমবাংলার মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস। শুভ্রা ঘোষের সংগীতের মধ্যদিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। সভায় ৮টি শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংগঠনের পক্ষ থেকে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। সভায় নির্বাচনী কনভেনশনের পক্ষে প্রস্তাব পাঠ করেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বিশিষ্ট জননেতা বিমান বসু তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সমর্থন জানান এই প্রস্তাবকে এবং বলেন, কনভেনশনের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রায় সমস্ত কথাকেই ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছে এই প্রস্তাবে। নির্বাচন যে সময় হচ্ছে সে সময়টা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই ৫টি পর্বের এ নির্বাচনকে নির্বাচন কমিশন আপনাদের প্রস্তাবের ভাষা অনুযায়ী 'পর্যায়' বলেনি। বলেছে ১ম নির্বাচন, ২য় নির্বাচন ইত্যাদি। আমি এ ব্যাপারে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ভারতবর্ষে সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি মেনে ১৯৫২ সাল থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু



হয়। কিন্তু কখনোই ভারতবর্ষে এবং অবশ্যই আমাদের রাজ্যে ৫টি পর্যায়ে নির্বাচন হয়নি। This is the first time. যখন ৫টি পর্যায়ে নির্বাচন হচ্ছে এবং এমন একটি রাজ্যে যার নাম পশ্চিমবঙ্গ। সবচেয়ে বেশি অতীতে যে নির্বাচন হয়েছে তা হয়েছে ৪টি পর্যায়ে। হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরে ৪টি পর্যায়ে। তার একটি বিশেষ কারণ ছিল। একদিকে রক্তক্ষয়ী কাশ্মীর, অন্যদিকে বরফে ঢাকা একটি অঞ্চল ছিল যেখানে পরবর্তী পর্যায়ে নির্বাচন হয়েছিল। ৪টি পর্যায়ে হয়েছে পাঞ্জাবে। রক্তক্ষয়ী খালিস্তানী আন্দোলনের প্রেক্ষিত সেখানে ছিল। অতি সম্প্রতি বিহারে যে নির্বাচন হয়ে গেল তা ৪টি পর্যায়ে। পশ্চিমবঙ্গে অতীতে যে একটি পর্যায়েই নির্বাচন হয়েছে তা কিন্তু নয়। ১৯৭১ সালে ২টি পর্যায়ে। ১৯৭৭ সালে ২টি পর্যায়ে। ১৯৯৬ সালে ২টি পর্যায়ে। কিন্তু এবারে কেন ৫টি পর্যায় ? এ প্রশ্নের জবাব আমরা চাইনি। আমরা বামফ্রন্টের সভা করে বলি নির্বাচন কমিশনের এই নির্বাচনী নির্ঘন্ট আমরা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমরা মনে করি This sort of decision by the E.C. is unwanted, unnecessary and impresidented. এ মন্তব্য করার কারণ একটাই, পশ্চিমবাংলার আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতি এমন নয় যে, সেখানে ৫টি পর্যায়ে নির্বাচন করতে হবে। ভারত সরকারের যে crime report আছে সেখানেও আদিবাসী মানুষের উপর যে নির্যাতন, সর্বশেষ ২০০৪ সালের রিপোর্ট অনুসারে পশ্চিমবাংলা সবার নিচে। মাত্র ১৪টি ঘটনা। কিন্তু একই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, রাজস্থান কিংবা ছত্তিশগড়ে এই নির্যাতনের পরিমাণ সবচেয়ে কম কোথাও ৩৫০, সবথেকে বেশি এক হাজারের ওপর। এখানে যে সময় নির্বাচন, উচ্চমাধ্যমিক শেষ হবে ১৩ই এপ্রিল আর নির্বাচন শুরু হবে ১৭ই এপ্রিল। নির্বাচনে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সমস্ত দলেরই প্রচার করার অধিকার আছে। কিন্তু আমরা ঘোষণা করেছি প্রচারে যাতে কারো কোনো অসুবিধে না হয় তার জন্য ছোট ছোট কর্মীসভা, চারদিক ঘিরে শব্দ যাতে বাইরে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করে ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে নির্বাচনের কাজ আমরা পরিচালনা করব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যখন ৫টি ধারায় নির্বাচন ঘোষণা করা হলো, আমাদের

যারা বিরোধী তারা এই নির্বাচনী নির্ঘন্টকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু কার স্বার্থে তাঁরা স্বাগত জানালেন ? যখন পশ্চিমবাংলার সমস্ত স্তরের ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা মিলে ৬৫-৬৬ লক্ষ যুক্ত আছেন সাম্প্রতিক পরীক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে। তাহলে কার স্বার্থে স্বাগত জানালেন তাঁরা ? ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে ? অভিভাবক-অভিভাবিকাদের স্বার্থে ? শিক্ষার স্বার্থে ? শিক্ষার পরিবেশকে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ রাখার স্বার্থে ? এ প্রশ্নটা সবসময় আমাদের মনে জাগরূক থাকা উচিত। কিন্তু আমরা নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে মেনে পালা। বহু মানুষ যারা কাজের সন্ধানে, ধান কাটা, রোয়ার কাজে এধার ওধার যান চলছে তাদের নাম বাদ দেবার চক্রান্ত। দেশি-বিদেশি চক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে বাধা সৃষ্টি করছে। প্রতিবার নির্বাচন কমিশনের দেওয়া অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের শংসাপত্রকে এরা অন্য চোখে দেখছে। পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলেও নির্বাচনকে জটিল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নইলে একটি জেলার রিটার্নিং অফিসার কী করে বলেন তাঁকে ১ লক্ষ ২০ হাজার নাম কাটতেই হবে ? তাই আমাদের দায়িত্ব আজ অনেক বেশি।



নিয়েছি। নির্বাচন ৫ পর্যায়েই হোক আর ৭ পর্যায়েই হোক আমরা যদি দায়িত্ব পালন করি , পশ্চিমবাংলার ৮টি বামপন্থী শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী সংগঠন যদি দায়িত্ব নেয় তাহলে নির্বাচন ১দিন আগে ঘোষিত হলেও পশ্চিমবাংলার অগণিত গণতন্ত্রপ্রিয় দেশপ্রেমিক মানুষ ৭ম বারের জন্য বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করবেই এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। তথাপি অনেক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। চলছে নির্বিচারে ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দেবার সেই দায়িত্বকে মাথায় নিয়ে আমাদের অভিযানে ব্রতী হতে হবে। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে। আমাদের সাফল্য-অসাফল্যের কথা মননশীল মানুষদের কাছে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। বামপন্থীরাই ৩৬৫ দিন সাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। ইলেকট্রনিক মিডিয়ারা আজ ওদের প্রচারক। তাই মানুষের কাছে বারে বারে আমাদের যেতে হবে। জনশিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা চলছি কিনা তা ভাবতে হবে। শিক্ষা আগে ছিল

রাজ্য তালিকায়। জরুরী অবস্থায় আসে যুগ্ম তালিকায়। আজ রাজ্যে গণতন্ত্রীকরণের প্রক্রিয়াকে পুষ্ট করা হয়েছে। দৃঢ় প্রতীতি ও প্রত্যয় নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষায় বামফ্রন্ট সরকারের যে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী ও সাফল্য সে কথা সকলের সামনে তুলে ধরতে হবে। রাজ্যের অন্য যেসব শিক্ষক সংগঠন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, ইরাক-আফগানিস্তান আক্রমণের বিরুদ্ধে তারা মুখ খোলেনি। ডব্লিউ বুশকে ভারত থেকে পুশ করার প্রশ্নেও তারা নীরব। ইরানকে আক্রমণের প্রশ্নে তারা কথা বলেনি। আপনারা, আপনাদের সংগঠন নীরব থাকেনি, প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে বারেবারে। তাই আগামীতে যে লড়াই এর ময়দানে ৭ম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আপনারা অগ্রণী ভূমিকা নেবেন ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ যাতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে তার একমাত্র প্রচারক হয়ে, সংগঠক হিসাবে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকার এই কনভেনশন থেকে আপনারা নিয়ে যাবেন।

সভার পরবর্তী বক্তা পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস তাঁর সহজাত ভঙ্গীতে বলেন, আজকের দিনটি নতুন করে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। কারণ ১৯৭০ সালের ১৬ই মার্চ তারিখে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন হয়েছিল। শুরু হয়েছিল পশ্চিমবাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক অন্ধকারময় রাজত্ব। গণতন্ত্রের ওপর নেমে এসেছিল আঘাত। তছ্‌নছ্‌ হয়ে গিয়েছিল মানুষের স্বাভাবিক জীবন। আর আজ সেই ১৬ই মার্চে দাঁড়িয়ে অনেক প্রতিকূলতার মাঝে পশ্চিমবাংলার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সামনে গণতন্ত্র টিকিয়ে রাখার লড়াই নতুনভাবে দেখা দিয়েছে। পশ্চিমবাংলার বুকে সেই সন্ত্রাসের রাজত্ব যাতে ফিরে না আসে সেই অঙ্গীকারকে পাথেয় করে শপথ নেবার দিন আজ। আমাদের ভূমিকা ও দায়িত্বকে আজ যেন সঠিকপথে পরিচালিত করে রাজ্যে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যেতে পারি। আজ একটু পিছিয়ে গিয়ে ১৭ই মার্চ ১৯৭৪, কংগ্রেস দলের এম এল এ তুহিন সামন্ত সেদিন বিধানসভায় যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাঁর কথায় আজকের শিক্ষাজগতে এতখানি নৈরাজ্য, এতখানি হতাশা তা বোধহয় কখনও আসেনি। ১৯৭০ সালের ৬ই জুন আনন্দবাজার পত্রিকা লিখছে ঐ একইভাবে পশ্চিমবাংলার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ যাঁদের মধ্যে সত্যেন বোস, ডি এন বসু, শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এক যৌথ বিবৃতিতে লিখছেন, সম্প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরীক্ষাগ্রহণ নিয়ে যে অব্যবস্থা চলছে তাতে সকলেই বিচলিত বোধ করছেন। শিক্ষকরা প্রহৃত হচ্ছেন, পরীক্ষার্থীরা অসৎ উপায় অবলম্বন করছে। ১৯৭০ সালের ৩০শে মে যুগান্তর পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলিতে যে অসৎ উপায় অবলম্বন করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরীক্ষা পরিদর্শকদের উপর যে ধরনের আক্রমণ চালানো হচ্ছে তাতে পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপক ও অন্যান্যদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিচ্ছে। অধ্যাপক পি সি ভট্টাচার্য, বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক যখন তাঁর নিজেরই ঘরে ছুরিকাহত হন, ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ আনন্দবাজার তার সম্পাদকীয়তে লিখছে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিছু ছাত্রের আবদার কিংবা হুমকির নিকট যেভাবে আত্মসমর্পণ করছে, নির্দিষ্ট দিনের পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থাকে যেভাবে তামাশায় পরিণত করেছে তা সত্যই বিরল। তৎকালীন প্রায় সমস্ত পত্রপত্রিকাতেই এ ধরনের লোমহর্ষক খবর প্রকাশিত হয়েছিল। বিমল দাশগুপ্ত, দুর্গাপুর এম এ এম সি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় চলাকালীন চেয়ারে বেঁধে গায়ে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। সন্তোষ ভট্টাচার্য, শিক্ষক আন্দোলনের নেতা বহরমপুরে নৃশংসভাবে তিনি খুন হয়েছিলেন। আপনাদের মনে থাকবার কথা, ১৯৭০ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য গোপা সেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই খুন হলেন। সর্বত্র গণটোকাটুকির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বাংলার ছাত্রসমাজ যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা আজও সর্বত্র উল্লেখিত হয়। সেই ছাত্রসমাজ-এর মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার জন্য গণটোকাটুকির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আজ যারা কংগ্রেসের নেতা সেই সময় তাঁরা ছাত্র আন্দোলনের কর্তৃত্ব করতেন। তাঁরা জানেন সেই সময় তাঁদের কী ভূমিকা ছিল। ১৯৭০-১৯৭৭ পর্যন্ত যে নারকীয় ঘটনার সাক্ষী হয়েছিলেন পশ্চিমবাংলার মানুষ, তা ভাবলে গা শিউরে ওঠে। সেই নারকীয় ঘটনার মূল হোতা যারা, তারা আজ পশ্চিমবাংলার মানুষের সমর্থন চাইছেন। শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রসমাজ আজ তাদেরকে ক্ষমা করবেন কিনা এইকথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। সেই সঙ্গে আমাদের যথার্থ ভূমিকা পালন করার কাজে অবতীর্ণ হতে হবে। ১৯৭৭ সালের ২১শে জুন তারিখে পশ্চিমবাংলায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত

হয়। কী আমাদের সাফল্য, কতখানি আমরা পেরেছি না পেরেছি তা নিশ্চয়ই মূল্যায়িত হবে। যারা শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী তাদের ক্ষেত্রে এই সরকার কী করেছে না করেছে তার দু'একটি দৃষ্টান্ত আপনাদের দিচ্ছি। ১৯৭৭ সালে শিক্ষণবিহীন প্রাথমিক শিক্ষক, ম্যাট্রিকুলেট বেতনভাতা মিলে মাসিক হাতে পেতেন ১৭৬ টাকা। ১৯৯৮ সালে বেতনহার সংশোধনের পরে তাঁরা পান ৪৪১৬ টাকা। শিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যাট্রিকুলেট প্রাথমিক শিক্ষক ১৯৭৭ সালে পেতেন মাসিক ২৮৬ টাকা। ১৯৯৮ সালে বেতনহার সংশোধনের পর পান ৪৬৯০ টাকা। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ১৯৭৭ সালে পাশ কোর্সের গ্রাজুয়েট পেতেন ৩৩২ টাকা। বেতনহার সংশোধনের পর পান ৬৪৭১ টাকা। অনার্স গ্রাজুয়েট ১৯৭৭ সালে মাসিক পেতেন ৩৮২ টাকা। ১৯৯৮ সালে বেতনহার সংশোধনের পরে পান ৭৬৩৫ টাকা। মাষ্টার ডিগ্রি হোল্ডার শিক্ষক ১৯৭৭ সালে পেতেন ৪২২ টাকা। ১৯৯৮ সালে বেতনহার সংশোধনের পরে পান ৮৩০০ টাকা। সার পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোনো রাজ্য নেই যেখানে এই ধরনের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে।

একথা একাধিক প্রবন্ধে আমি অনেকবার উল্লেখ করেছি। পেনসনের ক্ষেত্রে গত ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত পাওয়া হিসেবে প্রাথমিক শিক্ষকদের ১ লক্ষ ৪ হাজার ৫১জন পেনসন পাচ্ছেন। আর মাধ্যমিক শিক্ষকদের ৭৮ হাজার ৬৭০ জন। দুই-এ মিলে ১ লক্ষ ৮২ হাজার ৭২১ জন পেনসন পাচ্ছেন। ভারতবর্ষের দ্বিতীয় কোনো রাজ্য নেই যেখানে এই পরিমাণ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়মিত পেনসন পান। প্লানিং কমিশনের ২০০১-০২-এর রিপোর্টে কোন্ রাজ্য তার নিজস্ব আয়ের কত অংশ পেনশন ও স্যালারি বাবদ ব্যয় করে তার একটি হিসাব দিয়েছে। তাতে গুজরাট সরকার করে নিজস্ব আয়ের ৫৭ শতাংশ। হরিয়ানা সরকার করে ৫৭ শতাংশ। কর্ণাটক সরকার করে ৬৫ শতাংশ। মহারাষ্ট্র সরকার করে ৬৭ শতাংশ। পাঞ্জাব সরকার করে ৭৬ শতাংশ। তামিলনাড়ু করে ৮৯ শতাংশ। অন্ধ্রপ্রদেশ করে ৬৮ শতাংশ। কেরালা করে ১০৭ শতাংশ। পশ্চিমবাংলা করে ১৫০ শতাংশ। একমাত্র রাজ্য পশ্চিমবাংলা যেখানে নিজস্ব আয়ের দেড়গুণ পরিমাণ টাকা পেনসন ও আর্থিক সুবিধা দিতে ব্যয় হয়। এর মধ্যদিয়ে এই সরকারের



দায়বদ্ধতার চিত্রটিই ফুটে ওঠে। পশ্চিমবাংলার ২০০৫-০৬ সালের শিক্ষাবাজেটে ৫৮৮২ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। এর মধ্যে বেতনবাবদ আমাদের ব্যয় হয় ৫৫৯০ কোটি টাকা। বাকি থাকে ২৯২ কোটি টাকা। যা আমরা অন্যান্য খাতে, পরিকাঠামো ইত্যাদিতে ব্যয় করতে পারি। বিধানসভায় এ পর্যন্ত আমি ২৩টি বাজেট পেশ করেছি। বিরোধীপক্ষ থেকে সমালোচনা করা হয়। ১৯৭৭ সালের শিক্ষায় বাজেট বরাদ্দ ছিল ১১৪ কোটি টাকা। আর এখন ৫৮৮২ কোটি টাকা। বিরোধীরা বিধানসভায় এ সত্যতা মেনে নিয়েও বলেন, এর সবটাই তো ব্যয়িত হয়েছে বেতনে। আমি সবিনয়ে উত্তর দিয়েছি, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের অভুক্ত রেখে শিক্ষার মান উন্নয়ন করা সম্ভব নয়। পেটে ক্ষুধা থাকবে। আলো জ্বলবে না। শিক্ষার অঙ্গন সম্প্রসারিত হতে পারে না। CMIE রিপোর্টে যা কিনা খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদরা তৈরি করেন তাতে বলা হচ্ছে আমরা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ম্ভর ছিলাম না। সারা ভারতবর্ষে যত আবাদী জমি আছে তার ৩ শতাংশ আছে পশ্চিমবাংলায়। ভারতবর্ষে যত জনগণ আছে তার ৭·৮ শতাংশ বসবাস করে পশ্চিমবাংলায়। এও আপনারা জানেন, বিশ্বের ১ বর্গকিমি জায়গায় বসতি সারা বিশ্বে ৪৭জন। ভারতবর্ষে বাস করে ৩২৩জন। পশ্চিমবাংলায় ৯০৮জন। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সারা ভারতবর্ষে যত চাল তৈরি হয় তার ১৬ শতাংশ চাল তৈরি হয় পশ্চিমবাংলায়। CMIE রিপোর্টে যে কথা আছে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পশ্চিমবাংলা এক নজির সৃষ্টি করেছে। পশ্চিমবাংলায় ৭৩-৭৪ সালে দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ছিল ৬৩ শতাংশ। বর্তমানে তা নেমে এসে দাঁড়িয়েছে ২৭ শতাংশে। পশ্চিমবাংলায় মোট জনসংখ্যার ৪৮·২ শতাংশ নারী, অথচ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ৪৯·১ শতাংশ নারী। যে সাফল্য আর কোনো রাজ্য দাবী করতে পারেনি। আর সে কৃতিত্ব দাবী করতে পারে একমাত্র মহামনীষী বিদ্যাসাগর। সাম্প্রতিক সময়কে উপলব্ধি করে বিশেষত পরীক্ষারত ছাত্র-ছাত্রী, পরীক্ষা পরবর্তী মূল্যায়ন ইত্যাদির কাজকে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে আমাদের পালন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচনের দায়িত্ব এবং ৭ম বামফ্রন্ট সরকার গঠনের কাজে আপনারা নিজেদের ব্রতী করবেন সে আশা পোষণ করছি। যে দায়িত্ব বারেবারে আপনারা যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে পালন করে এসেছেন, ৮টি বামপন্থী শিক্ষক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের কাছে সে অভিমত পোষণ করছি। ছয় বছরের শিক্ষায় যে সাফল্য এসেছে, আমরা অর্জন করেছি সেই ধারাকে আমরা অব্যাহত রাখব। বাকি ভারতবর্ষের সামনে পশ্চিমবাংলার সুনামকে অক্ষুণ্ণ রাখার কাজে আমরা সচেষ্ট হব।

প্রতিবেদক ঃ অশোক অধিকারী

পর্যালোচনা

মানবতা ও গণতন্ত্রের পয়লা নম্বর শত্রু মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের ভারত সফর

গত ১লা মার্চ ও ২রা মার্চ, ২০০৬ মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশের ভারত সফরের বিরুদ্ধে বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণজমায়েত হলো। দেশজুড়ে বুশবিরোধী বিক্ষোভের ঢেউ উত্তাল হলো। বুশ প্রশাসন আইন লঙ্ঘনকারী। বুশ সরকার কোনো আন্তর্জাতিক আইন মানে না। দখলদারি চালিয়ে কেবল ইরাকেই গত তিন বছরে ১ লক্ষ মানুষকে হত্যার জন্য দায়ী বুশ প্রশাসন। উপসাগরীয় যুদ্ধের নামে ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ শুরু করে ১৯৯১ সালে। ঐ সময় বাগদাদে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে মার্কিন বাহিনী। পরবর্তী ১২ বছরে ইরাকে মার্কিন-ব্রিটিশ বাহিনী যে পরিমাণ বোমাবর্ষণ করেছে তার মোট পরিমাণ হিরোশিমায় ফাটা আণবিক বোমার ক্ষমতার সাতগুণেরও বেশি। শুধু তাই নয়, ইরাকে যে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল তাতে অন্তত পাঁচ লক্ষ শিশু এবং দশ লক্ষ পূর্ণবয়স্ক মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। ইরাকের সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট করে তাদেরই আকাশ সীমার মধ্যে মার্কিন প্রশাসন যে উড়ান-নিষিদ্ধ এলাকা তৈরি করেছিল সেখানে মার্কিন যুদ্ধবিমান চলাচল করতে পারত, কিন্তু ইরাকী বিমান সেখানে উড়তে পারত না। মার্কিন প্রশাসন নির্লজ্জভাবে ইরাকের কুর্দ বিদ্রোহীদের প্রকাশ্যে মদত দিয়েছে। তার সঙ্গে বিরামহীনভাবে হামলা চালিয়েছে ইরাকের শিল্প, তেল উৎপাদন ও যোগাযোগের পরিকাঠামোর ওপর। উদ্দেশ্য ঃ ইরাকের অর্থনীতির ধ্বংসসাধন। এছাড়া ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর ইরাকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনল মার্কিন প্রশাসন এই বলে যে, ইরাক ২০০১-এর ১১ই সেপ্টেম্বর মার্কিন ভূখণ্ডে আক্রমণের সঙ্গে জড়িত এবং ইরাকের প্রশাসনের সঙ্গে আলকায়দার যোগাযোগ আছে। মারাত্মক যে অভিযোগটি আনা হল ইরাকের বিরুদ্ধে তা হলো — ইরাকের হাতে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে। আসলে ইরাকে সামরিক আগ্রাসন চালিয়ে







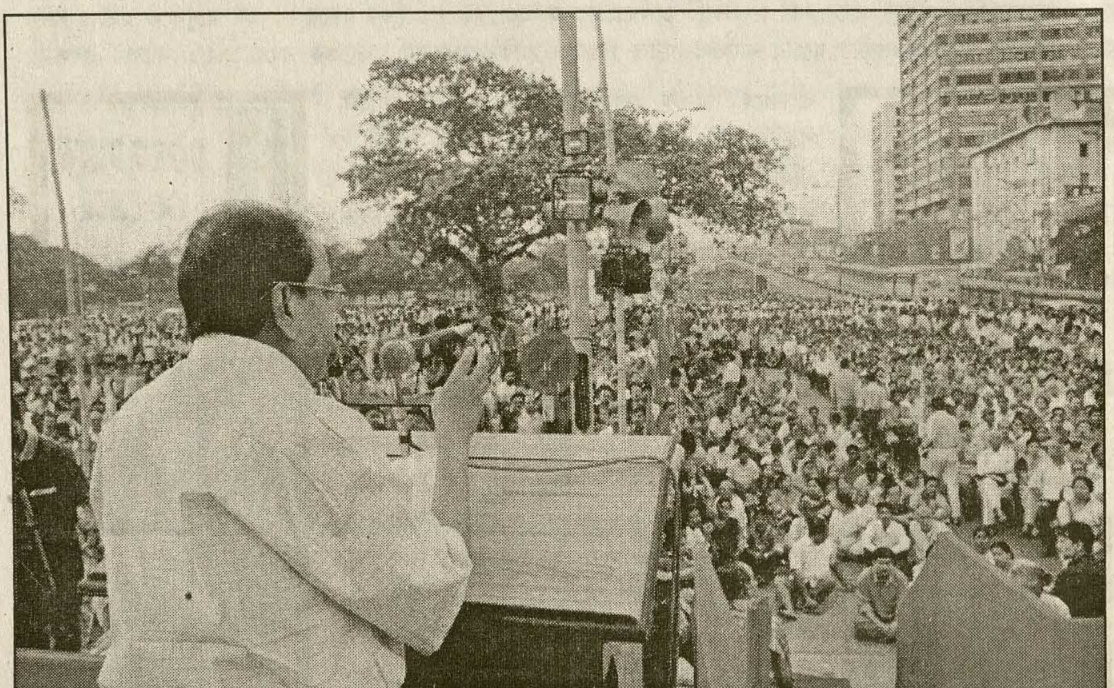

দেশের নানা প্রান্তে বুশ-বিরোধী বিক্ষোভ। (বাঁদিক থেকে) আগরতলা রাস্তায়, হায়দরাবাদের সমাবেশে, মুম্বাইয়ের পথে দিল্লির মিছিলে খেতমজুর, দিল্লির সভায় প্রবীণ নেতা হরকিষাণ সিং সুরজিৎ, প্রকাশ কারাত।
—ছবি গণশক্তির সৌজন্যে।

ইরাকের তৈলখনি দখলের লক্ষ্যে পৌঁছতেই ইরাকের বিরুদ্ধে এই তিনটি মিথ্যা অভিযোগ আনল মার্কিন প্রশাসন। অথচ এখন প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এই তিনটি অভিযোগই ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা।

ইরাকে যে গণবিধ্বংসী অস্ত্র নেই সে কথা জর্জ বুশকে জানিয়েছিলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত যোশেফ উইলসন (পরে প্রকাশ্যেই ফাঁস করেছেন)। আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার ইরাক পর্যবেক্ষক গ্রুপের প্রধান জ্যাকুইস বোটে তখনই বিবৃতি দিয়ে একথা জানিয়েছিলেন।

'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকা ২০০৪ সালের ৫ই অক্টোবর ভাষণে বলেন, মার্কিন প্রশাসন নিশ্চিত যে ইরাকে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে। এখন পাওয়েল বলছেন, তিনি অসত্য বলেছিলেন এবং তাঁর জীবনে ওই ভাষণই নাকি সবচেয়ে গভীর কালো দাগ। স্বীকার করেছেন জর্জ বুশও। তারপরেও বুশ বলেছেন ঃ ইরাকে আগ্রাসনের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিল।

তাই ২০০৩ সালের ২০শে মার্চ মার্কিন-ব্রিটিশ সেনারা দক্ষিণ দিক দিয়ে আক্রমণ চালালো। শুরু হলো গণহত্যাকারী যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায়। রাজধানী বাগদাদে চলল নজিরবিহীন বোমাবর্ষণ। বাগদাদকে যেভাবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মারণাস্ত্রে ধ্বংস করা হলো এর উদাহরণ বিশ্বে নেই। মাত্র তিন



বুশ-বিরোধী সমাবেশে কলকাতায় মার্কিন প্রচার দপ্তরের সামনে বক্তব্য রাখছেন অনিল বিশ্বাস।

জানায় ঃ "বুশ প্রশাসনের হাতে এমন অজস্র প্রমাণ ছিল যে ইরাকে পরমাণু অস্ত্র থাকার খবর ভুল। বস্তুত বস্তাপচা এই খবরকেই ডাস্টবিন থেকে তুলে এনে ইরাক আগ্রাসনের যুক্তি খাড়া করা হয়েছিল।" পরে সহকারী মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পল উলফোর্ডইৎজ 'ভ্যানিটি ফেয়ার' পত্রিকাকে বলেন, "জানতাম তো ভুয়া অভিযোগ, ওটা চালানো যাবে বলে ওটাই বেছে নিয়েছিলাম।"

২০০৩ সালের মার্চ মাসে ইরাক আগ্রাসনের প্রাক্-মুহূর্তেও মার্কিন বিদেশসচিব কলিন পাওয়েল রাষ্ট্রসংঘের সপ্তাহের মধ্যে বুশের খুনেবাহিনী দখল করল ইরাক। বিশ্বের দ্বিতীয় হিটলার বুশ মে মাসের প্রথম দিনে ঘোষণা করলেন ঃ ইরাককে জয় করেছি।

সত্যই কি ইরাক জয় করেছেন বুশ?

ভয়াবহ সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করে, মাত্রাহীন বর্বরতা চালিয়েও ইরাকের বিদ্রোহী জনগণকে দমন করতে পারেনি বুশ। বরং দুনিয়ার ঘৃণার পাত্র হয়েছেন তিনি। দুনিয়ার চোখে তিনি আজ HUMAN MONSTER।

ইরাকে গণতন্ত্র প্রবর্তনের লক্ষ্যে নাকি আগ্রাসন। আবু

ঘ্রাইবে ইরাকী বন্দীদের ওপর মার্কিন সৈন্যের অমানুষিক নির্যাতনের ছবিগুলোই প্রমাণ করছে বুশের গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের নমুনা। বন্দীর চোখমুখ বেঁধে হিংস্র কুকুরের মুখে ছেড়ে দেওয়া, বন্দীদের নগ্ন করে হাতকড়ায় বেঁধে শরীরে জ্বলন্ত সিগারেটের ছেঁকা দেওয়া, বন্দীকে ধরে এনে তার মাথায় ও গোটা দেহে মল ঢেলে দিয়ে নগ্ন করে প্রকাশ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা কোন্ মানবাধিকারের নমুনা? আজ বিশ্বের মানুষ তাই বুশকে গণবিধ্বংসী দানব ছাড়া কিছু ভাবেন না। গণহত্যার অপরাধে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে বুশকে চিহ্নিত করা আজ জরুরী। তাই বুশের ভারত সফরকালে এই বিক্ষোভ প্রদর্শন।

প্রথম দিকে ইরাকের মানুষ অত্যাধুনিক সমরাস্ত্রের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনি। কিন্তু যখনই মার্কিন, ব্রিটিশ ও তাদের ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটি সহযোগী দেশের সেনারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল, শুরু হলো প্রকৃত প্রতিরোধ। প্রতিদিন প্রতিরোধ বাড়ছে ইরাকে। সাধারণ মানুষের দেওয়ালে পিঠ ঠেকেছে। মারব কিংবা মরব — এই তাদের পণ। সাধারণ মানুষ হিংসা ও অরাজক অবস্থার জন্য মার্কিন আগ্রাসনকেই আজ দায়ী করছেন। ইরাকের অর্থনীতিকে মার্কিন প্রশাসন আজ বহুজাতিকদের হাতে তুলে দিয়ে একটি ঔপনিবেশিক সরকার প্রতিষ্ঠায় তৎপর। তাই বাড়ছে প্রতিরোধ।

সি এন এন বলছে ঃ 'ইরাকে যুদ্ধ ডেকে এনেছে আজ বিপর্যয়!'

ইরাকে 'সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ' কমেনি, বরং বেড়েছে। ২০০৪ সালের ডিসেম্বর মাসে দৈনিক এ ধরনের আক্রমণের ঘটনা যেখানে ছিল ৫৫, ২০০৫-এর ডিসেম্বরে তা বেড়ে হয়েছে ৭৭।

বুশ বলছেন, আধুনিক অর্থনীতি নির্মাণে আমরা ইরাকের সরকারকে সাহায্য করছি যাতে ইরাকের জনগণ মুক্তির স্বাদ পায়।

আসল চিত্র কী?

ইরাকে তেলের উৎপাদন আদৌ বাড়েনি, বরং কমেছে। ইরাকের বর্তমান পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী আহমেদ চালাবি বুশের ঘনিষ্ঠ। ব্যাঙ্ক প্রতারণার দায়ে নির্বাসিত ছিলেন জর্ডনে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন এখনও যুদ্ধের আগের অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়নি। সারাদিনে ১২ ঘন্টাও বিদ্যুৎ থাকে না ইরাকে।

দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পানীয় জল ও নিকাশীর সুযোগ পাচ্ছেন না। যুদ্ধের পরবর্তীকালে ইরাকী শিশুদের অপুষ্টির পরিমাণ বেড়েছে। ১/৩ ভাগ শিশুর শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। প্রতি ১২টি শিশুর ১জন অপুষ্টির শিকার। রাষ্ট্রসংঘের ২০০৪ সালের তথ্য জানাচ্ছে ঃ 'যুদ্ধ শুরুর দিন থেকে বোমাবর্ষণে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৯০০টির বেশি প্রাথমিক স্কুল। লুঠ হয়েছে হাজারের বেশি স্কুল। ৩৭০০ স্কুলে নিরাপদ পানীয় জল নেই। ৭ হাজারের বেশি স্কুলে নিরাপদ পানীয় জল নেই। ইউ এস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট বলেছিল যে তারা ২০০৪ সালের শেষের মধ্যে ২৮৬টি স্কুল তৈরি করবে। ২০০৫-এর মধ্যে তারা মাত্র ৪৫টি নতুন স্কুল নির্মাণ করেছে।

সাদ্দাম প্রশাসন যখন মার্কিন অবরোধের বিরুদ্ধে লড়াই করছিল তখনও এমন অবস্থা ভাবা যেত না।

বুশ ইরাকের জন্য ১ লক্ষ কোটি ডলার-এর বেশি খরচ করতে চাইলেও এর ক্ষুদ্রতম অংশও তিনি ইরাকের ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষের জন্য খরচ করতে রাজী নন।

তাই বাড়ছে প্রতিরোধ।

১৪০ ব্যাটেলিয়ান ইরাকী সেনা ও পুলিশকে প্রশিক্ষণ দিয়েও (তাদের দাবি তাই) তাদের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না বুশ প্রশাসন। তাই সর্বত্র অভিযান চালাচ্ছে মার্কিন সেনারাই। রাসায়নিক অস্ত্রও ব্যবহার করছে মার্কিন সেনারা যা মাংস ও চামড়ার আস্তরণকে পুড়িয়ে দেয়। লাগামহীন দুর্নীতি চলছে ইরাকে। মহিলাদের ধর্মনিরপেক্ষ অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

সাদ্দাম হুসেইন-এর বিচারের নামে চলছে প্রহসন। সাজানো আদালতে চলছে বিচার। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে ইরাকে। সাদ্দামের আইনজীবী দলের দুই সদস্য ইতোমধ্যেই ইরাকে খুন হয়েছেন। চলছে 'একুশে আইন'।

সাদ্দামকে অপসারণের পর ইরাকীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে মার্কিন প্রশাসন। সাম্প্রদায়িকতা সাম্রাজ্যবাদীর হাতে থাকা আর একটি মারণাস্ত্র। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হলে আমাদেরও সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িক শক্তি ও সংখ্যালঘিষ্ঠের সাম্প্রদায়িক শক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। ইরাকে সুন্নি সম্প্রদায়ের সমস্ত আপত্তি উপেক্ষা করে 'অনুমোদিত' ছাপ মারা হয়েছে নতুন সংবিধানে। ইরাকে সম্প্রতি নির্বাচন হয়েছে। শাসক শিয়া গোষ্ঠী 'ইউনাইটেড

ইরাকী অ্যালায়েন্স' একক বৃহত্তম দল হিসাবে উঠে আসতে চলেছে। এই নির্বাচন ইরাকী জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছে। ইরাকী জনগণ এখন তিনভাগে বিভক্ত ঃ শিয়া, সুন্নি ও কুর্দ। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইরাকী জনগণের সামনে এ এক বড় সমস্যা।

তবে একটি সাধারণ অনুভূতি ইরাকের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করছে। সেটি হলো ধারাবাহিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে 'সার্বিক বিদ্বেষ'। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা বিভাগ ২০০৫ সালের আগস্টে একটি জনমত সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে ইরাকী জনগণের ৮২ শতাংশই তাদের দেশের মাটিতে মার্কিন-ব্রিটিশ সেনা থাকার তীব্র বিরোধী এবং এক শতাংশেরও কম মানুষ মনে করেন সেনারা থাকলেই ইরাক উপকৃত হবে। প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ ও সমাজবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি লিখেছেন, "ইরাকে অনুগত সরকার স্থাপন করার চেয়ে দখলদার সেনাদের ফিরে যাওয়াই উচিত, কেননা সেখানকার মানুষ তাই মনে করেন।"

বুশ-ব্লেয়ার নিয়মরক্ষার জন্য ইরাকে কিছু সেনা হ্রাস করলেও কবে ইরাকের দখলদারি ছাড়া হবে তার কোনো নির্দিষ্ট সময় ঘোষণায় রাজী নন এঁরা।

এর মূল কারণ ইরাকের রপ্তানি পণ্য পেট্রোলিয়াম। তেল চাই তেল। আমেরিকা মধ্যপ্রাচ্যের তেলের খনিগুলি দখলে রাখতে চায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তেলের সংকট-এর মোকাবিলা করতে। আগামী বিশ বছরে আমেরিকায় তেলের সংকট তীব্র হবে।

খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও বুশের ইরাক পরিকল্পনার সমর্থক নেই বললেই চলে। মাত্র ৩৭ শতাংশ তার সমর্থক। ৬০ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে বিরোধিতা করছেন বুশের ইরাক পরিকল্পনার। সি আই এ-র গুপ্ত বন্দীশালায় অত্যাচারের চিত্র প্রকাশিত হওয়ায় বিপাকে পড়েছে বুশ প্রশাসন। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে বিশ্বের নানা দেশ থেকে সন্দেহভাজনদের তুলে নিয়ে গেছে সি আই এ'র গোপনবাহিনী। বিমানে করে তাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে আটটি দেশে যার মধ্যে মিশর, আফগানিস্তান, পোলাণ্ড ও রোমানিয়া রয়েছে। চূড়ান্ত নির্যাতন করা হয়েছে সন্দেহভাজনদের ওপর। অথচ ইউরোপীয় আইন অনুযায়ী বন্দী নির্যাতন নিষিদ্ধ। এতদ্‌সত্ত্বেও বন্দীদের বহন করা শত শত উড়ান ওঠানামা করতে দিয়েছে ব্রিটিশ ও জার্মান সরকার।

আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমরবাদকেই তার সংকটমুক্তির উপায় বলে মনে করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সামরিকখাতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করে বাকি বিশ্ব মিলে সেই অর্থ খরচ করি। বিশ্বজুড়ে সামরিক খরচের ৪৭ শতাংশই করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

শুধু ইরাক আগ্রাসনের প্রকৃত খরচই গিয়ে দাঁড়াবে ১ লক্ষ কোটি ডলার থেকে ২ লক্ষ কোটি ডলার। শুরুতে যা ধরা হয়েছিল তার অন্তত দশগুণ। অথচ রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব কোফি আন্নান বলেছেন, এই বিশ্বে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রসূতির স্বাস্থ্য, পর্যাপ্ত খাবার, পরিষ্কার জল ও নিরাপদ নিকাশী ব্যবস্থার জন্য ফি বছর প্রয়োজন মাত্র ৪ হাজার কোটি ডলার। যা কিনা ২০০৬ সালের মার্কিন বাজেটের মাত্র ৯ শতাংশ। অথবা ইরাক যুদ্ধের জন্য অনুমিত বরাদ্দের বড়জোর ২ থেকে ৪ শতাংশ।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে এসব তথ্য মূল্যহীন। রক্তপিপাসু পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী বুশ চান বিশ্বজুড়ে সামরিক আধিপত্য।

আমরা ভারতবাসীরা দীর্ঘকাল ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভিয়েতনাম, কিউবা থেকে শুরু করে আফগানিস্তান, ইরাকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমরা আমাদের সংহতি জানিয়েছি। এই সুমহান ঐতিহ্য থেকে আমরা দূরে সরে যেতে পারি না। তাই ভারতের মাটিতে মানবতার দুশমন বুশের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিবাদ ও স্বতঃস্ফূর্ত ঘৃণার প্রকাশ ঘটিয়েছে ভারতবাসী দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। আওয়াজ উঠেছে ঃ 'খুনি বুশ, ভারত ছাড়ো।'

সম্প্রতি ইরানকেও নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশ ঘোষণা করেছেন, বলপ্রয়োগের বিকল্প তিনি উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তিনি বলেছেন, "যে কোনো রাষ্ট্রপতির কাছেই বলপ্রয়োগ সবার শেষ বিকল্প।" এই বক্তব্যের পর আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা মেটানোর প্রয়াস বাধাপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। আর সেটাই লক্ষ্য মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের। পারমাণবিক বিষয়ে মার্কিন আক্রমণের মুখোমুখি এখন ইরান। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভিয়েনায় আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা (আই এ ই এ)-র অধিবেশনে ভোটাভুটির মাধ্যমে ইরানকে পারমাণবিক বিধিনিষেধ অমান্যকারী দেশ বলে চিহ্নিত করা হলো। প্রস্তাব আনা হলো, যাতে ইরানের এই বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করা হয়। খুব হিসেবী পদক্ষেপ এটা। এমনটা করা হলো এই কারণে যাতে ইরাকে মার্কিন পরিকল্পনা রূপায়ণের কাজে সহযোগিতা করতে বাধ্য হয় ইরান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

কখনোই চাইতে পারে না যে ইজরায়েলের বিরোধী কোনও দেশ পারমাণবিক প্রযুক্তির অধিকারী হোক। অথচ গণবিধ্বংসী অস্ত্রের পাহাড় তৈরি করা হয়েছে ইজরায়েলে।

আই এ ই এ-র তদন্ত চলছে। মার্কিন অনুগামী তিন ইউরোপীয় দেশ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানি (ই ইউ-৩) আলোচনার নামে নানা নিয়ন্ত্রণ ইরানের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কোন দেশ এটা মানতে পারে না। ইরান বিশ্বের সর্বত্র সুস্পষ্টভাবে বলে বেড়াচ্ছে, "পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি তাদের লক্ষ্য নয়, তারা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করতে চায়। এরপরও আই এ ই এ ইরানের বিরুদ্ধে হুমকিমূলক প্রস্তাব পাশ করেছে প্রত্যক্ষ মার্কিন চাপে এবং ভারত সে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে। ইরান পরমাণু অস্ত্র প্রসাররোধ (এন পি টি) চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ। তবুও ইরানের বিরুদ্ধে এই মার্কিন তৎপরতা। এরফলে এন পি টি চুক্তি গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো আই এ ই এ'র কোনও তথ্যে এমন কোনো প্রমাণের উল্লেখ নেই যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে উদ্যোগ নিয়েছে। তবুও ইরানকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে এগোচ্ছে বুশ প্রশাসন।

ইরান এখন যুদ্ধের প্রহর গুনছে। ইরাকের পর আমেরিকার নিধন তালিকায় আছে ইরান। অজুহাত একই ঃ পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ ও সন্ত্রাসবাদে মদত। বশম্বদ সংবাদমাধ্যম এবং আনুগত্যকামী কিছু রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়ে বুশ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে আর একটি মহামিথ্যা ঃ ইরানের হাতে পরমাণু অস্ত্র প্রায় এসেই গেছে।

অথচ ইতিহাস কী বলছে ?

১৯৭০-এর দশকে মার্কিন অনুগত স্বৈরাচারী শাহ্-র শাসনকালে আমেরিকাই ইরানে প্রথম পরমাণু প্রযুক্তি শুরু করে। ইরানের একমাত্র বিতর্কিত রি-অ্যাক্টরটি মার্কিন সাহায্যেই তৈরি। সেই রি-অ্যাক্টের 'লাইট ওয়াটার' প্লুটোনিয়াম আইসোটপ তৈরি হয় যা থেকে যুদ্ধাস্ত্র তৈরি অসম্ভব। মার্কিন সরকারই ১৯৭০-এর দশকে তেহরাণে পরমাণু প্রযুক্তি হস্তান্তর করে। রাষ্ট্রপতি ফোর্ড ১৯৭৬-এ ইরাকে পূর্ণ পরমাণু সহায়তা দেবার প্রস্তাব দেন।

বর্তমান পরিস্থিতি কী ?

৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ তারিখে আই এ ই এ'র গৃহীত প্রস্তাবে পারমাণবিক কর্মসূচিতে স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ তুলে নিন্দা করা হলো। নিরাপত্তা পরিষদে পাঠানো হলো বিষয়টি।

(১)

ইরানকে বলা হল ঃ (১) আই এ ই এ'র দ্বারা যাচাই করার কাজ চালিয়ে যাওয়া সহইউরেনিয়ামের উৎকর্ষতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে স্থগিত রাখতে হবে। (২) ভারী জল (টিউটারিয়াম) কারখানা তৈরি বন্ধ করতে হবে। (৩) আই এ ই এ'র প্রোটোকল পূর্বপর স্বীকার করতে হবে। (৪) পরমাণু কর্মসূচির বিষয়ে স্বচ্ছতার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ইরান স্পষ্টতই ঘোষণা করেছে ঃ এই পদক্ষেপ ইরানের সার্বভৌমত্বের প্রতি আক্রমণ। একে বিশ্বের কাছে ইরানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আলি খোমেইনি বলেছেন ঃ এই পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চক্রান্তে এবং নেতৃত্বে সংগঠিত হচ্ছে। এ হলো বুশ প্রশাসনের বিশ্বব্যাপী আধিপত্যবাদ এবং রাজনৈতিক ঔদ্ধত্য প্রদর্শণের অঙ্গ। ইরান বিচক্ষণতা ও ধৈর্যের সঙ্গে তার কাজ চালিয়ে যাবে। শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ইরান তার পারমাণবিক কর্মসূচি অব্যাহত রাখবে। ইরান কখনো হুমকির কাছে মাথা নত করবে না।

ইরানের রাষ্ট্রপতি আহমাদিনেজাদ বলেছেন ঃ (১) ইরান বিনা নোটিসে পারমাণবিক কেন্দ্রগুলি আর পরিদর্শন করার অনুমতি দেবে না। (২) ইরান শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে তার ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধ করার কর্মসূচি চালিয়ে যাবার সংকল্প গ্রহণ করছে। (৩) আগে স্বেচ্ছা প্রণোদিতভাবে পরমাণু অস্ত্র প্রসার নিরোধক প্রোটোকল রূপায়ণে সম্মতি দিলেও এখন তা মানবে না।

এরই পরিপ্রেক্ষিতে বুশ বলেছেন, 'প্রকৃত সত্য গোপন করা এবং আন্তর্জাতিক নীতি ভঙ্গ করার ঘটনাকে আর সহ্য করা হবে না।' মানে যুদ্ধ শুরু করা হবে। এটাই যুদ্ধবাজ বুশ চাইছিল।

তাই বুশ-বিরোধী বিক্ষোভের ঢেউ উঠল সারা ভারতে। রাজধানী দিল্লীতে জনসমুদ্রে ক্রুদ্ধ ধিক্কারে বিদ্ধ হলেন বুশ। 'যুদ্ধাপরাধী বুশ ফিরে যাও' ধ্বনিতে মুখরিত হলো দিল্লীর আকাশ-বাতাস গত ২রা মার্চ। সংসদের প্রবেশপথ ছিল বুশবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল। বামপন্থীরা ছিলেন এই বিক্ষোভের প্রধান অংশীদার। এখানে ধ্বনি ওঠে 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক'। সংসদের ভেতরে ঢুকেও সাংসদরা নেমে আসেন ওয়েলে। ইরাক দখলদারীর বিরুদ্ধে কীভাবে সংসদ একমত হয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তা স্মরণ করেন অনেকে। ইরাকেই দখলদারীর বিরুদ্ধে অনেকে গলা মেলান। মুম্বাইয়ের আজাদ ময়দানে লাখো মানুষের কণ্ঠে ছিল বুশবিরোধী স্লোগান। বুশবিরোধী স্লোগানে মুখরিত হন ৫০০০ মানুষ

চেন্নাইয়ের রাজপথে। রাজস্থানে বিশালসংখ্যক মহিলা পথে নেমে আসেন বুশ বিরোধী বিক্ষোভে, মধ্যপ্রদেশে সমাজবাদী পার্টির ডাকে হাজারো মানুষ তাঁদের তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ভূপাল-এর নীলম পার্কের সমাবেশে বক্তারা বারবার একটা কথাই বলেন, মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে এদেশে আমন্ত্রণ জানানোর বদলে প্রয়োজন এর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গঠন করা। উত্তরপ্রদেশে লক্ষ্ণৌ-এ এদিন হাজার হাজার মানুষ বুশ বিরোধিতায় নামেন। স্লোগানে পোস্টারে মুখরিত ছিল মিছিল। তিন তিনবার ভেস্তে যায় অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশের ভারত সফরের প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে অন্ধ্রপ্রদেশ বিধানসভা। বিধানসভার মধ্যে দফায় দফায় স্লোগান ওঠে 'জর্জ বুশ গো ব্যাক'। কেরলে তিরুবনন্তপুরমে রাজ্য সচিবালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখান হাজার হাজার মানুষ। বুশের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন ম্যাথিউ এবং কেসিও। চিকাগোর ঐ দম্পতি সাংবাদিকদের জানান বুশের মার্কিন নীতির বিরুদ্ধে বহু মার্কিনী সামিল। কোচি ও তিরুচিরা পল্লীতেও বিশাল বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। বামপন্থী সংগঠনগুলির ডাকে আসামের সর্বত্র বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। ভুবনেশ্বর, পাটনা, রাঁচি, শ্রীনগর, আমেদাবাদ, ছত্তিশগড় সর্বত্র চলে বুশ বিরোধী বিক্ষোভ। শ্রীনগরে বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠি চালায় পুলিশ। বুশবিরোধী হাতে লেখা হাজার হাজার পোস্টার ছিঁড়ে দেয় পুলিশ। ২রা মার্চ কলকাতায় মার্কিন প্রচার দপ্তরের খুব কাছেই বুশবিরোধী সমাবেশের মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। মঞ্চ থেকে যত দূর তাকানো গেছে শুধু মানুষ আর মানুষ। মঞ্চে লেখা ছিল 'কিলার বুশ, গেট আউট'। মঞ্চের কাছাকাছি পুড়েছে যুদ্ধবাজ বুশের কুশপুতুল।

বুশের ভারত সফরের মূল উদ্দেশ্য ভারতে মার্কিন পুঁজির দরাজ প্রবেশের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করার ব্যবস্থা করা। মনে রাখতে হবে ১৮ই জুলাই-এর ভারত-মার্কিন যৌথ বিবৃতি শুধুমাত্র পরমাণু বিষয়ক নয়। ঐ বিবৃতিতে বিশ্বে তথাকথিত গণতন্ত্রের বিকাশ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যৌথ উদ্যোগের কথা রয়েছে। তখন সি পি আই (এম)-এর পলিটব্যুরো বলেছিল যে সুপারপাওয়ার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) তার একতরফা এবং গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছে তার সঙ্গে ভারতের এই ধরনের উদ্যোগে সামিল হওয়া উচিত হয়নি। ভারত এখন আমেরিকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইরানকে ইউরেনিয়াম এনরিচমেন্ট বা প্লুটোনিয়াম রিপ্রসেসিং থেকে বিরত করতে চাইছে সেই ভারতকে এখন বুশের তৈরি ফাঁদে পড়ে নির্ভরশীল হতে হবে আমদানিকৃত পরমাণু জ্বালানির ওপর এবং প্লুটোনিয়াম রিপ্রসেসিং-এর অধিকার হারাতে হবে। বুশের এই চক্রান্তমূলক প্রস্তাবের ফলে ভারতের পরমাণু বিশেষজ্ঞরা স্বাভাবিকভাবেই বিচলিত হয়ে পড়েছেন। কারণ বুশ প্রশাসন এখন ভারতের অসামরিক পরমাণু কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ভারতে প্রচুর পরিমাণে থোরিয়াম আছে।

তুলনায় ইউরেনিয়ামের মজুত কম। সে কারণে ভারতের পরমাণু বিজ্ঞানীরা থোরিয়ামের উপরে নির্ভরশীল হতে চান। কিন্তু স্বনির্ভরতার বিষয়টিকে ধ্বংস করার জন্য ওয়াশিংটন জোর দিচ্ছে ইউরেনিয়ামের ব্যবহারের ওপর। উদ্দেশ্য একটাই ভারতকে পরমাণু শক্তির ব্যাপারে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ওপরে স্থায়ীভাবে নির্ভরশীল করে তোলা।

ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে ভারতে মার্কিন অনুসারী অবস্থান গ্রহণ এবং আমেরিকার সঙ্গে পরমাণু সহযোগিতা নিয়ে ভারতীয় জনমত ও সংসদকে আড়াল করে গোপনে ওয়াশিংটন-নয়াদিল্লী আলোচনা প্রণয়ন করে দিচ্ছে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার, নেহরুর আমলের স্বাধীন বিদেশনীতি বিসর্জন দিচ্ছে। বামপন্থীরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যথার্থ দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন। বামপন্থীরা চান, ভারত-মার্কিন বন্ধুত্ব হোক সমতার ভিত্তিতে, ভারত মেনে চলুক স্বাধীন বিদেশনীতি। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের নেতা হিসাবে এবং নিজেদের বর্ধিত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারতবর্ষ বিশ্বে তার স্থান করে নিক। মার্কিন রাষ্ট্রপতি জর্জ বুশকে যেভাবে মনমোহন সিং সব নিয়মনীতি ভেঙে স্বাগত জানিয়েছেন তা 'দেশের লজ্জা' বলে মন্তব্য করেছেন বর্ষীয়ান জননেতা জ্যোতি বসু। রবার্ট কাগান, মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা, বলেছেন, "আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই আন্তর্জাতিক কনভেনশনের কিছু সিদ্ধান্ত যেমন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট, ; কিয়াটো চুক্তি মানবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিতভাবেই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিকে সমর্থন করে, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে এসব চুক্তি মানার বাধ্যবাধকতা তার নেই। এই দ্বিচারিতা বা Double standard নিয়েই মার্কিনীদের বাঁচতে হবে।" এরপরেও আমাদের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বুশকে মান্য অতিথি বলে বরণ করে নিয়ে ভারতের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐতিহ্যকে মসীলিপ্ত করেছেন।

ভারত সফরকালে বুশ মার্কিন পণ্যের অবাধ বাজার চেয়েছেন ভারতে। বলেছেন, মার্কিন কৃষিপণ্যের জন্য ভারতের বাজারকে খুলে দিতে। মার্কিন সংস্থায় সি ই ও এবং

ভারতীয় শিল্পের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী চিদাম্বরম বলেছেন, মার্কিন লগ্নি টানতে আর্থিক সংস্কারের ঘোড়া তিনি আরও জোরে ছোটাবেন, সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের আইন আরও শিথিল করবেন। ব্যাঙ্ক ও বীমার ক্ষেত্রেই সবার আগে এফ ডি আই নিয়ম শিথিল করা হবে। মার্কিন শিল্পোদ্যোগীদের চিদাম্বরম বলেছেন : আপনাদের অর্থ এবং প্রযুক্তি দুইই আমাদের দরকার। তিনি বলেছেন, ভারতে এ পর্যন্ত যে ৩৭০০ কোটি ডলার বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে, তারমধ্যে মাত্র ৫০০ কোটি ডলার এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এই অঙ্কটা বাড়াতে সরকার সবধরনের সহযোগিতা করবে মার্কিন শিল্পপতিদের সঙ্গে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদেশী লগ্নীতে ভারত এখন সকলের দ্বিতীয় পছন্দ। চীনের পরেই ভারতের স্থান। এমনকি আমেরিকাও এই তালিকায় তৃতীয় স্থানে। এই মন্তব্য করে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "আপনারা ঢালাও বিনিয়োগ করুন। সব দরজা খুলে দেব"। তিনি বলেছেন, ভারত ক্রমশই মধ্যবিত্তের দেশ হয়ে উঠছে। মধ্যবিত্তের সংখ্যা এখন প্রায় ৩০ কোটি। অর্থাৎ আমেরিকার মোট জনসংখ্যার সমান। আর মধ্যবিত্তরাই তো বহুজাতিকদের আসল বাজার। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন ষড়যন্ত্রের পথের কাঁটা পশ্চিমবঙ্গ। তার কারণ এখানে কমিউনিস্টদের গণভিত্তি অনেক গভীরে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী নীতি ও সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টরা এখানে শতসহস্র মানুষকে সমবেত করছেন।

সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ও আন্তর্জাতিক লগ্নীপুঁজি পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দেবার চেষ্টা করবে না অথবা কমিউনিস্টদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করবে না এমন ভাবনা কদাপি করা উচিত নয়। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চীনকে ঘিরে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের রয়েছে গভীর ষড়যন্ত্র। চীনকে ঘেরা হচ্ছে বিভিন্ন দিক থেকে, জাপান দিয়ে, নেপাল দিয়ে। ভারতকে এই ষড়যন্ত্রের শরিক বানানোর পরিকল্পনা রয়েছে আমেরিকার। কিন্তু এই পথে বাধা বামপন্থীরাই। কারণ কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার বর্তমানে বামপন্থীদের সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল। ভারত সরকার একটি সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সামিল হলে বামপন্থীরা তা সমর্থন করবে না। দেশের মধ্যে বামপন্থী আন্দোলনের দুর্গ পশ্চিমবঙ্গ। এখানকার বামফ্রন্ট সরকার দীর্ঘ ২৯ বছর ধরে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং বিকল্প চিন্তা ও চেতনার প্রসার ঘটাচ্ছে। তাই আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী পুঁজি বা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের সহ্য করবে না—এটাই স্বাভাবিক। এই বিধানসভা নির্বাচনে তারা সবরকম চেষ্টা করবে যাতে সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার গঠিত না হয়। তাই বেশি বেশি মানুষকে সচেতন করে তাদের সমর্থন নিয়ে নির্বাচনে জয়ী করতে হবে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইকে জোরদার করতে এবং সমাজতন্ত্রের পক্ষে মানুষকে সমবেত করতে এরাজ্যে চাই বামফ্রন্ট সরকার।

'খুনী বুশ ফিরে যাও' ধ্বনির মধ্যে দিয়ে এরাজ্যের মানুষ সেই সংকল্পই ঘোষণা করলেন।

—শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ধারাবাহিক

উপলখন্ড

ভালো হোটেল, পাকা পায়খানা, খাবেন ভালো

অরুণ চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অবিভক্ত বাংলায় যোগাযোগ ব্যবস্থার এমন দুটি বড় কেন্দ্র ছিল যে ঐ পর্যন্ত রেলপথে এসে স্টিমারে চেপে গন্তব্যস্থলে যেতে হত। একটি ছিল খুলনা স্টেশন। দ্বিতীয়ত গোয়ালন্দ স্টেশন। দুটোই এখন বাংলাদেশে।

খুলনা থেকে স্টিমার যেত বরিশাল শহর পর্যন্ত। বাখরগঞ্জ বা বরিশাল জেলায় কোনো রেলপথ সেদিন ছিল না। আজ তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। জনশ্রুতি বা প্রবাদ ছিল : আইতে শাল, যাইতে শাল তার নাম বরিশাল। স্থানীয় উচ্চারণে 'বইশ্যাল'।

খুলনা থেকে বরিশাল পর্যন্ত স্টিমার যেত। পথে তৎকালিক যশোহর জেলার নড়াইল মহকুমা, ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার বিস্তীর্ণ অঞ্চল, বিশেষত কোটালিপাড়া থানা এবং তার পার্শ্ববর্তী বরিশাল জেলার গৌরনদী থানা পর্যন্ত এলাকার বাসিন্দাদের খুলনা, যশোহর ও সর্বোপরি কলিকাতার সাথে যোগাযোগের জন্য ঐ স্টিমারই ছিল একমাত্র ভরসা। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে ঐ বিস্তৃত এলাকার কালিয়া, সেনহাটি, কোটালিপাড়ার বহু গ্রাম, বরিশাল জেলার গৈলা, কুল্লশ্রী প্রভৃতি গ্রামের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলি, যাঁদের মধ্যে তৎকালিক বহু উচ্চশিক্ষিত পরিবার ছিল।

গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে যেতে হত কুমিল্লার চাঁদপুর ও নোয়াখালি জেলার বহু মানুষকে। ট্রেন পাল্‌টে নদী, ছোট স্টিমারে পার হয়ে নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত ট্রেনে চেপে যেতে হত উত্তরবঙ্গের ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলায়। একেবারে আসামের শিলং পর্যন্ত।

ফলে, এখানেও প্রত্যহ কলিকাতা সহ বাংলার বহু জেলার যাত্রীদের আনাগোনা হত। দিনরাত মুখরিত থাকত এ স্টেশন। খুলনাও তাই। তবে, খুলনার তুলনায় এখানেই যাত্রীদের সমাগম বেশি হত। গোয়ালন্দ ও রাজবাড়িতে যাত্রীর আনাগোনার কখনও বিরাম থাকত না।

তার ফলশ্রুতিতে দুই স্টেশনেই বহু হোটেল গড়ে উঠেছিল। ভৈরবের পাশে অবস্থিত খুলনা শহরের আর্থিক জীবনে ঐ স্টেশনেরও দারুণ গুরুত্ব ছিল। বহু মানুষ যুক্ত ছিলেন হোটেল ব্যবসার সাথে। চাল ও শব্জী উৎপাদক কৃষক, মৎস্যজীবী, চাল-ডালের আড়তদার, তেল-নুন ও মুদিখানার নানা দ্রব্যের কারবারীরা তো ছিলেনই। তার সাথে যুক্ত ছিল অনেক কিশোর ও যুবকরা। ছিল হোটেলের ঠাকুর বলে পরিচিত পুরুষরা। তখনও নারীরা ঐ কাজে লাগেননি। ঐ ঠাকুররা অনেকেই গলায় সুতো ঝুলানো 'ঠাকুর'। নাম, ধাম, উপাধি ও গোত্রাদি জিজ্ঞেস করলে সমস্যা দেখা দিত। তখন মালিকরা বিপদগ্রস্ত হতো। বেচারি ঠাকুরের কর্মজীবনে ছেদ পড়ত। সর্বোপরি, হোটেল মালিক ও তার কর্মচারীরা।

একদল কিশোর ও অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং প্রাপ্তবয়স্ক যুবকদেরও কেউ কেউ স্টেশন থেকে হোটেলের খদ্দের ধরে আনত। তীর্থস্থানের পান্ডাদের 'ভক্ত' ধরে আনার মতো ওরা ধরে-আনা-খদ্দের পিছু 'কমিশন' পেত। তাই, কতজন যাত্রী ধরে আনতে পারবে তার উপর তাদের পাওনা বা রোজগার নির্ভর করত। খাবারটা জুটত হোটেলেই। যাত্রীদের এঁটো খাবার। দারিদ্র্য-পীড়িত ঘরের সন্তান ছিল তারা। স্কুলেও যায়নি বা যেতে পারেনি। এরা সেদিন ছিল মূলত কাঙাল নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের হাভাতে সন্তান। নীচুতলার কৃষকদের ঘর থেকে আসত যারা, তাদের সংখ্যা তখন খুব বেশি ছিল না। কারণ, তখন পর্যন্ত গ্রামে কাজ ছিল। তবে, আকাল দেখা দিলে তারাও কাজের সন্ধানে বাজারে চলে আসত। ঝাঁট দেওয়া। ঘর মোছা, ময়লা পরিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করে মালিকের গায়ে তেল মাখানো, তাদের ফাই ফরমায়েস খাটায় নিযুক্ত হত তারা। বেতন মাসে একটাকা বা দু'টাকা, এর বেশি নয়। প্রথম এলে পেটভাতাতেই কাজ করত তারা। সারাদিন ধরে। বলা যেতে পারে, দিনে ঘন্টা কুড়ি অমানুষিক কাজ করত এইসব কিশোররা। এদের জীবনের সামনে কোনো স্বপ্ন রঙ্গীন ছিল না। কেবলি অন্ধকার। যারা 'ফুরণে' খদ্দের ধরে আনত।

তাদের ঘরবাড়ি ছিল স্টেশন। হোক খুলনা কিংবা গোয়ালন্দ বা রাজবাড়ি। কারণ, চব্বিশ ঘন্টায় বহু ট্রেন ও স্টিমারের আনাগোনার যায়গা। কোনোটা দুপুরে আবার কোনোটা গভীর রাতে। একটা-দুটা-তিনটা বা ভোরে। ট্রেনের ঘন্টায় বাঁধা ছিল ঐসব কিশোরদের জীবন। একফাঁকে গিয়ে হোটেলের উচ্ছিষ্টে হত এই বাল-গোপালদের ভোগ।

এদের জীবনে ছিল আরো হরেক রকমের লাঞ্ছনা ও নির্যাতন। সবটা লেখার জন্যও নয়। ট্রেন এলেই এদের কণ্ঠের কলকাকলি শোনা যেত না। তাতে কোনো কাব্য ছিল না। তবে, গলার স্বর সপ্তমে উঠত অনেকের। সেই কণ্ঠস্বর আকৃষ্ট করত আগন্তুক যাত্রীদের কণ্ঠস্বর। স্টিমারের যাত্রীদেরও ঐভাবে আকৃষ্ট করা হত। এক একজন খদ্দের ছিল তাদের কাছে জীবনদায়িনী ওষুধের মত। জীবনরস যে খদ্দেরের কাছে। খদ্দেরকুলের কাছে ছিল ঐসব প্রচারক বাহিনীর প্রাণভোমরা। এঁদের জীবনে কি সুকান্তর আঁঠারো নেমে আসত ? না, তা আসার সময় ছিল না আর সুযোগের অর্গলও ছিল বন্ধ। বসন্তের দক্ষিণা বাতাস কি এদের যৌবনে ভেসে আসত। তা কচিৎ কারো কারোর জীবনে এলেও তা সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে বা আনুপাতিক হারে আসত না। যৌবন এলে কেউ কেউ হত ট্রেন বা স্টিমারের কুলি। আবার হোটেলের মালিকদের সর্ববিধ চাহিদা মিটাতে পারলে হোটেলের 'পরিবেশক' বা ঠাকুরের পদে কেউ কেউ উন্নীত হত। বলা বাহুল্য, ঐ জাতীয় ভাগ্যবানদের সংখ্যাও কম ছিল আর সেই প্রমোশনতো ছিল মালিকদের একান্তভাবেই ইচ্ছাধীন।

মেঘনা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্র বা ভৈরব ও কীর্তন বোলার যেসব ঢেউগুলি আছড়ে পড়ত তটভূমিতে, সেইসব উর্মিমালা দেখা এবং তাদের সৌন্দর্য উপভোগ করারও কোনো সময় বা সুযোগ তাদের ছিল না। সুকান্তের ভাষাতেই বলি, ওদের কাছে 'পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি'।

এখানে একটা কথা বলা দরকার। যেসব স্টেশন থেকে ট্রেন আসত গোয়ালন্দ, রাজবাড়ি বা খুলনায় সেইসব রেলওয়ে স্টেশন কিংবা স্টিমারঘাটেও একই ছবি ছিল। বরিশালের কীর্তনবোলা নদীর ঘাট, গোপালগঞ্জের মধুমতী তীরবর্তী ঘাট বা মাদারিপুরের আড়িয়ালখাঁ তীরস্থ স্টিমার ঘাট। বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত ঢাকা বা কর্ণফুলির তীরস্থ চট্টগ্রাম, কিংবা ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী গৌহাটি বা বর্তমান গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন ও নদীর ঘাট প্রভৃতি যতগুলি যায়গায় ট্রেন বা স্টিমারের বড় স্টেশন বা ঘাট ছিল, সেখানেই গড়ে উঠেছিল হোটেল ব্যবসা। আর সর্বত্রই ঐ একই ধরনের কিশোররা খদ্দের ধরার আড়কাঠি ছিল। হোটেলের ভাগ্যতরির তরাবার কাজ তারাই করতো।

'ভালো হোটেল, পাকা পায়খানা, খাবেন ভালো' ঐসব কিশোর আড়কাঠিদের কচিকণ্ঠের টাকিসুরে ঐ আওয়াজই দ্রুত ধ্বনিত হত। তার সাথে হাত ধরে টানাটানি। তা নিয়ে আবার 'মা শীতলা আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র সাথে 'মা মনসা আদর্শ হিন্দু হোটেলে'র আড়কাঠিদের পারস্পরিক কলহ। বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় গালাগালি যাতে আবার কেউ কেউ স্কুল-পালানো ছাত্র ছিল যার পড়াশুনায় 'মতি' ছিল না কিংবা স্কুলের বেতন না দিতে পেরে নাম কাটা যাওয়ায় আর স্কুলমুখো হয়নি। এমনিও দুই-একজন ছিল। তারা 'স্টুপিড' 'ননসেন্স' 'রাস্কেল' প্রভৃতি ইংরাজি 'সাহেবি' গালও ব্যবহার করত। অবশ্য অধিকাংশেরই ছিল 'শা-কারাদি' বঙ্গভাষা রূপ জননীর কাছ থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ বাংলা গাল অর্থাৎ শা-কারাদি শব্দে একে অন্যকে ঘায়েল করত। হাতাহাতি, ঘুষোঘুষিও হত।

খদ্দের পিছু ওদের পাওনা হত এক আনা হিসাবে। সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা ও বিশ্রামহীন খাটুনির পরে এক একজন খুব বেশি হলে আট দশজন খদ্দের ধরতে পারত। তাহলে দিনের রোজগার হত বড়জোর আট আনা থেকে দশ আনা। খাবারের কথা আগেই বলেছি।

এইসব স্টেশনগুলোতে এধরনের কিশোরের সংখ্যা কত, তার কোনো হিসাব কোনোদিন ছিল না। আজও নেই। তবে তাদের মুখে উচ্চারিত ঐ বাক্যটি ঃ ভালো হোটেল, পাকা পায়খানা, খাবেন ভালো — একথা নিয়ে আমরা যাঁরা অভিজ্ঞ, তাঁরা ঠাট্টা-তামাসা করে থাকি। তার পিছনে রয়ে গেছে যে কত কিশোরের শ্রান্ত-ক্লান্ত জীবনকাহিনি, কেউ কি তার খোঁজ রাখি ? উত্তর হবে নেতিবাচক। তবু, তা সত্য। এ কাহিনি অনন্ত। তার শেষ নেই। শ্রেণিবিভক্ত শোষণভিত্তিক সমাজে তার শেষ হবে না। হতে পারে না।

(চলবে)

গল্প

বাড়ি

কমলেশ ভট্টাচার্য
প্রাক্তন সহ-প্রধান শিক্ষক, কালনা অম্বিকা স্কুল, *বর্ধমান*

শেষ মেসবাড়িটা বিক্রি হয়েই গেল।

পূর্বপুরুষের বাড়ি, কবেকার কে জানে? কেউ বলে বাড়িটার বয়েস দেড়শ বছর, কেউ বলে তারও বেশি। পাড়ার বয়স্ক লোকেরা বলেন, তাঁদের ঠিক জানা নেই। তবে ছেলেবেলা থেকে তাঁরা বাড়িটাকে এ অবস্থাতেই দেখছেন। বাড়িটা বিক্রি করে সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। লোকের হয় কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়। অতন্দ্রের হয়েছিল গৃহদায়। ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক।

সেকেলে বাড়িটা সংলগ্ন বাগান সমেত প্রায় বিঘে দুই জমি নিয়ে রয়েছে। পুরনো কালের পাতলা ইঁট আর কাদা দিয়ে গাঁথা। চওড়া ভিত বলেই এতকাল দাঁড়িয়ে আছে। চুন বালির পলেস্তরা নোনা ধরা খসে পড়ছে। কড়ি বরগা দেওয়া পেটাই ছাদ। অতন্দ্র ছোটবেলা থেকেই দেখছে তার বাবার বাড়িটা নিয়ে দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। বাবা সামান্য বেতনের চাকুরী করতেন। আয়ের একটা বড় অংশই গৃহ সংস্কারের জন্য ব্যয় করতে হতো। বিরাট বাড়িটা তিনি কোনপ্রকার তালিতাপ্পি দিয়ে বাসযোগ্য করে রেখেছিলেন। জন চারেক মানুষকে নিয়ে তাদের সংসার কোনরকমে টেনে টুনে চলতো। কাঁচা গাঁথনি, কড়ি বরগাগুলো তাই উইপোকায় খেয়ে নেয়। বলতে গেলে সারা বছরই জন, মিস্ত্রী বাড়িতে লেগেই আছে। ক্ষতিগ্রস্ত কাঠের কড়িগুলো অর্থের অভাবে পরিবর্তন করতে না পেরে বাঁশের শক্ত খুঁটো দিয়ে রাখা হতো। কড়ির গোড়াগুলো উইপোকায় খেয়ে দেওয়ায় বড় বড় কাঠের টুকরো দিয়ে জেরদাল দেওয়া হতো। ছাদ ফেটে বর্ষায় জল পড়তো প্রায় সব ঘর দিয়েই যাকে বলে— বল মা তারা, দাঁড়াই কোথা অবস্থা। একবার প্রবল বর্ষায় একটা ঘর হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল। সেই থেকে ভয় হতো ঘর চাপা না পড়তে হয়। বাল্যকাল থেকে মধ্য যৌবন পর্যন্ত অতন্দ্রের এমনভাবেই কেটেছে। তার মনে হতো, এর থেকে কুঁড়ে ঘরে থাকা ভাল ছিল। অতন্দ্র ভাবতো চাকুরী পেলে বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে বাগানে খান দুই ঘর করে নিশ্চিন্তে থাকবে।

এরপর অনেককাল কেটে গেছে। কিন্তু বাড়িটার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। অতন্দ্র চাকুরী পেয়ে বাড়িটার অনেকটাই ভাল করে মেরামত করেছে। সেকেলের ছাদবিহীন কুয়ো-পায়খানা আর খোলা বাথরুমের বদলে হাল আমলের পায়খানা আর বাথরুম করেছে। বাড়ির জন্যে অনেক অর্থ সে ব্যয় করেছে। কিন্তু নতুন ঘর করে বাস করার ইচ্ছা তার পূর্ণ হয়নি, কেননা সে সামান্য বেতনের চাকুরী করতো। বাড়িটার মূলকাঠামো অবিকৃতই রয়ে গেছে। বহু বছর পরে এ বাড়িতে আসা মানুষের বলতেন — এখানের সব পুরানো বাড়িগুলো অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু এ বাড়িটা আদ্যিকালের হয়েই রইল।

(২)

অতন্দ্র সংসারী হওয়ার পরে পরিস্থিতির চাপে বাড়ি ছেড়ে কর্মস্থলে শহরে এসে বাস করছে। দেশের বাড়িটায় এখন দু-এক ঘর ভাড়াটিয়া বসিয়েছে। গ্রামে ভাল ভাড়াটিয়া পাওয়াই দায়। তাদের নিয়ে সমস্যারও অন্ত নেই। নিয়মিত ভাড়া আদায় ও লাইটের বিলের টাকা আদায় করা কঠিন হয়ে ওঠে। অশিষ্ট ভাড়াটিয়াদের তুলতে ঘাম ছুটে যায়। তাছাড়া ভাড়া বাবদ যা আয় হয় তার থেকে অধিক অর্থ বাড়ি সারাতে খরচ হয়ে যায়। এখন জন, মিস্ত্রী জোগাড় করা সামান্য কর্ম নয়। বাড়িতে মিস্ত্রী লাগিয়ে তদারকি করা হয় না। ফলে ঠিকমত কাজও হয় না। এখন এত খরচা করে বাড়িটা টিঁকিয়ে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। অন্য শরিকরা বাড়ির জন্য অর্থব্যয়ে রাজী নয়, তাদের প্রয়োজন নেই। কিন্তু চোখের সামনে বাড়িটা ভগ্নস্তূপে পরিণত হতে দেখা অতন্দ্রের পক্ষে সম্ভবও নয়। বাড়িটা তাই সে মেরামত না করে পারে না। তার হয়েছে সাপের ছুঁচো গেলার

অবস্থা ! বাড়িটা এত পুরানো না হলে হয়ত রেখে দেওয়া যেত। অনেকেরই তো দেশে বাড়ি, সম্পত্তি থাকে। তবে অন্য সমস্যাও আছে। যা দিনকাল পড়েছে তাতে পড়ে থাকা জমি বা বাড়ি যে কোন সময়ই বেদখল হয়ে যেতে পারে। অন্যের জায়গা জমি হাতাতে অনেকেই এখন তৎপর। আর একবার যদি বেদখল হয়ে যায় তা উদ্ধার করা শিবেরও অসাধ্য। বাড়িটা নিয়ে তার দুশ্চিন্তার শেষ নেই। অনেক মায়া মমতা সে ঠেলে রেখে বাড়িটা বিক্রির সিদ্ধান্ত নিল। এ সিদ্ধান্তে আসতে তাকে মনের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করতে হয়েছে। বাড়িটার সঙ্গে তার অন্তরের গভীর মমত্ব জড়িয়ে রয়েছে। তার স্ত্রী বা ছেলেরা সে কথা বোঝে না। বাড়িটা নিয়ে পরিবারের আর সকলের সঙ্গে অশান্তি লেগেই আছে। তাই কতকটা নিরুপায় হয়েই সে এমন সিদ্ধান্ত নেয়। তবে বিক্রি করবো বললেই তো হয় না। এতখানি জায়গা একসঙ্গে কেনার মতো খরিদ্দার গ্রামে কোথায় পাবে? দালালরা যে দামে নিতে চায়, তাতে স্বীকৃত হওয়া যায় না। এক একবার বিক্রি হয় হয় করেও হয় না। সচেতন মন বিক্রি করতে চাইলেও বিক্রি না হওয়াতে মনে মনে সে যেন স্বস্তি পায়। যাক, আপাতত বাড়িটা থেকে গেল। এমনভাবেই বছর কয়েক কেটে যায়।

(৩)

বাড়ি বিক্রির দলিলে সই করে মনটা তার যেন এক অব্যক্ত বেদনায় টনটন করতে থাকে। দখল ছাড়তে সে মাসখানেক সময় চেয়ে নিয়েছে। তার ইচ্ছে শেষ বারের মত বাড়িটায় একা কয়েকটা দিন কাটাবে। অনেক স্মৃতি তার মনে জাগে। সে স্মৃতি দুঃখ এবং সুখের। দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়েই তার ছেলেবেলা কেটেছে, তবুও সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো তার কাছে কত না সুন্দর ছিল। অতন্দ্রের পিতা ছিলেন জ্ঞানী, এক বহুপরিচিত মানুষ। রাজনীতিবিদ থেকে আরম্ভ করে সাহিত্যিক, সমাজসেবী প্রভৃতি গুণী মানুষদের সঙ্গে ছিল তাঁর যোগাযোগ। এ বাড়িতে এমন সব মানুষদের আসা যাওয়া ছিল যাঁদের সান্নিধ্যে পাওয়া ভাগ্যের কথা। এ বাড়িতে বাস করে তার যা মানসিক শান্তি আর তৃপ্তি ছিল, এখন শহরের সর্বসুবিধাযুক্ত বাড়িতে বাস করেও তা সে পায় না। বহু বছর ধরে এ বাড়ি ছেড়ে থাকলেও বাড়ির প্রতি মমত্ব তার এতটুকু কমেনি। আবাল্যের এই গৃহ ছিল তার শান্তিনিকেতন। বাগানের ধারের ঘরে জানালার পাশে খাটে শুয়ে শুয়ে অলসভাবে কাঁঠাল গাছ এবং গোলক চাঁপা ফুল গাছের লম্বা লম্বা পাতার ওপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ তার কানে যেন মধুবর্ষণ করতো। বাগানের বেড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সার সার দেবদারু গাছগুলোর ফল পাকলে সারারাত ধরে বাদুড়রা ফল খেত আর পাখা ঝাপটাতো। বসন্তের কোকিলের, গাছের ডালের আড়ালে বসে মিস্টি স্বরে কুহু ডাক, ঘোর অন্ধকার রাতে পেঁচার ভুতুম্-তুম্ ডাক, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া রাতে নাম-না-জানা পাখির খটাস্ খটাস্ আওয়াজ শুনে কেমন রোমাঞ্চ লাগতো। গ্রীষ্মে চাতক পাখির একঘেয়ে করুণ ডাক 'ফটিক জল', হাঁড়ি চাঁচা পাখির কর্কশ কণ্ঠস্বর, গ্রীষ্মের ঝাঁ ঝাঁ রোদ, শীতের দিনে ধুনুরীর তুলো ধুনার যন্ত্রের 'টুয়াং টুয়াং' শব্দ এসব তাকে যেন কোন মায়ালোকে নিতে যেত। গরমের দিনে সন্ধ্যায় খোলা রোয়াকে মাদুর পেতে শুয়ে শুয়ে অন্তহীন আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কোথা দিয়ে সময় কেটে যেত। চোত-বোশেখ মাসে বাগানের আম ও লিচু গাছে বাঁশের পটকা বেঁধে দড়ি টেনে ফটাস ফটাস শব্দ করে বাদুড় তাড়ানো, ভোর না হতেই আম বাগানে গিয়ে কচি আম কুড়ানো, কালবৈশাখীর ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে আম কুড়োতে যাওয়া এ সব তার কাছে স্বপ্নের দিন বলে মনে হয়। বাগানীরা বাগান পাহারার জন্যে গাছের তলায় বাঁশের মাচার ওপর কুঁড়ে তৈরি করে থাকতো। প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায় মাচার ওপর শুয়ে বাগানীদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতো। 'চোখ গেল', 'চোখ গেল' ডেকে ডেকে পাখিটা সারা হয়ে যেত। কচি আম শিসে ছেঁচে তেল, নুন, সর্ষে, লঙ্কা দিয়ে মুখরোচক করে খেতে গিয়ে মুখের লালা আর চোখের জল এক হয়ে যেত। পাকা আম গামছায় ছেঁকে পাথরের থালা বা কাঁসার বগি থালায় আমসত্ব দেওয়া হতো। লাঠি হাতে বসে ছোটদের কাক পাখি তাড়াতে হত। ঘরের গরুর দুধ দিয়ে আমসত্ব মেখে বা খেজুর গুড়ের সরাপাটালী দিয়ে দুধ ভাত খাওয়া ছিল কত না তৃপ্তির ! শীতের দিনগুলো যেন ছিল কত সোনার ! ছাদে বসে মিঠে রোদে পিঠ দিয়া পড়া মুখস্থ করা, খেজুর গাছে রস খেতে আসা হরেক রকম পাখির আনা গোনা দেখতে ভারি ভালো লাগতো। খাঁটি খেজুরের গুড় দিয়ে পিঠে খাওয়ায় অমৃতপানের আস্বাদন পাওয়া যেত। গ্রীষ্মের স্বর্ণচাঁপা, বেলফুল আর গন্ধরাজ ফুলের গন্ধে সুবাসিত বাতাস। বর্ষার কামিনী ফুলের গন্ধ বা শরতের

ঝরে পড়া শিউলি গন্ধ মনকে প্রসন্নতায় ভরে দিত। কাঁঠালের মুচির গন্ধ কেমন যেন একটা মাদকতা বয়ে আনতো। শীতে বনতুলসীর বাঘ থাকা ঘন জঙ্গলে বন্ধুদের সঙ্গে 'ডবাডব' খেলার আনন্দই ছিল আলাদা। রাতে প্রহরে প্রহরে শিয়ালের ডাক, ফেউয়ের ডাক অথবা বাঘের গুরুগম্ভীর গর্জন শুনে ভীতিমিশ্রিত রোমাঞ্চ লাগতো। শীতের দিনে বাগানের গাছতলায় বা জঙ্গলে 'চড়ুইভাতি' করার আনন্দ আজও মনে জেগে রয়েছে। এ জন্যেই বোধহয় সংসারের অভাব অনটন শিশু ও কিশোর মনকে পীড়া দিতে পারতো না। তাদের কানায় কানায় পূর্ণ থাকতো। আজকের মতো বিনোদনের উপকরণ টিভি, রেডিও, সিনেমা এ সব কিছু না থাকলেও নির্মল আনন্দ উপভোগের কোন অভাব ছিল না। আনন্দ উপকরণের মধ্যে থাকে না, থাকে মনে, এ সত্য এখনকার দিনের ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারে না। আমরা তাদের অনেক দামি দামি খেলনা কিনে দিয়েও সে আনন্দ তাদের দিতে পারি না। এখন তাদের শৈশব গেছে চুরি হয়ে। আগাছার মতো অনাদর আর অবহেলায় বেড়ে উঠলেও সে সময় শৈশব ছিল আনন্দে মাতোয়ারা।

এ সব কথা ভাবতে ভাবতে নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে অতন্দ্র। বিমর্ষ মন নিয়ে দলিলে সই করতে গিয়ে তার হাত কাঁপছিল। মনটা যেন তার খালি হয়ে গেল। বেদনায় তার বুকটা টনটনিয়ে উঠছিল। মন বিদ্রোহ করতে চাইছে— দরকার নেই, বাড়ি বিক্রি করে, পড়ে থাক, যা হয় হবে। বয়েস হয়েছে তার, আর কতদিনই বা বাঁচবে! তার মৃত্যুর পর ছেলেরা যা হয় করবে। তার শান্তির নীড়, তবে সুখসদন এভাবে সে পরের হাতে তুলে দিতে পারবে না। অর্থই কি সব? ভাবাবেগের কি কোনই মূল্য নেই? তার শৈশব ও যৌবনের সেই সুন্দর দিনগুলো হারিয়ে গেলেও স্মৃতিমন্দিরটিও কি হারিয়ে যাবে?

স্ত্রীও ছেলেদের কাছে একদিন এ প্রসঙ্গে তুলে সে বলেছিল — থাক না বাড়িটা এখন, রয়ে সয়ে বিক্রি করা যাবে। তাছাড়া ভাল দাম তো পাওয়া যাচ্ছে না।

তার কথা শুনে সবাই রে রে করে উঠেছিল। ওসব ফালতু সেন্টিমেন্ট ছেড়ে দাও তো! একটা পচাগলা গ্রামের বাড়ির প্রতি এত দরদের কী আছে? এটা কি কোন ঐতিহাসিক ভবন নাকি? — বড়ছেলে বলে।

স্ত্রী অলোকা বলে — তাও যদি বাড়ি থেকে কোন আয় হতো, তো বলার থাকতো। মান্ধাতার আমলের বাড়িটার জন্যে গুচ্ছের টাকা খরচ করে তোমার কী লাভটা হচ্ছে শুনি? বাড়িটা যদি বেদখল হয়ে যায় কিছু করতে পারবে? তোমাদের যে জায়গাটা জবর দখল হয়ে গেছে এত চেষ্টা করেও তা কি উদ্ধার করতে পারলে? এতেও তোমার শিক্ষা হলো না? আচ্ছা মানুষ যা হোক তুমি!

ছোট ছেলে বলে — বাড়িটা কি তোমার একার? অন্য সকলে যখন বাড়ি বিক্রি করতে চায় তুমি আটকাবে কীভাবে? তোমাদের মত সেকেলে লোকদের নিয়ে হয়েছে আমাদের সমস্যা, আজকের দিনে এত সেন্টিমেন্ট রাখলে চলে না, একটু বাস্তববাদী হও।

সত্যিই এদের কোন দোষ দেওয়া যায় না।

অতন্দ্রের মানসিকতা বোঝার কোন প্রয়োজন তাদের নেই। অতন্দ্রের বিদ্যা-বুদ্ধির ওপর সংসারের মানুষদের কোন আস্থা নেই। তাদের ধারণা অতন্দ্রের মত এমন বাস্তববোধ বর্জিত অকর্মা মানুষ খুব বেশি মিলবে না। তাঁর স্ত্রী প্রায় খেদোক্তি করেন এমন মানুষের সঙ্গে তার মা-বাবা জীবনটাকে বেঁধে দিয়ে চির অশান্তি ও বিড়ম্বনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। এর থেকে চির অবিবাহিত থাকা অনেক ভাল ছিল। কারণে অকারণে লাভাস্রোতের মত বাক্যস্রোত বেরিয়ে আসে অতন্দ্রের উদ্দেশ্যে। নীলকন্ঠের মত সে বিষ তাঁকে নীরবেই উদরস্থ করতে হয়। শূন্য হাতেই অতন্দ্র সংসার জীবন শুরু করে এবং সাধ্যাতীত পরিশ্রম করে একটা মাথা গোঁজার মত ঠাঁই সে করতে পেরেছে যা সে যথেষ্ট বলে মনে করে। উচ্চাশা তার নেই, নিজের সঙ্গতির মধ্যেই সে থাকতে চায়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে তার স্ত্রী ও ছেলেদের সঙ্গে চিন্তা, চাহিদা ও বোধের ক্ষেত্রে বিস্তর ফারাক। সংসারে তার কাজকর্ম এবং আচরণ সব সময়ই সমালোচিত হয়। বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়ে অসহায়ভাবে সহ্য করা ছাড়া উপায় থাকে না। অল্পে নিয়ে সুখে থাকার পরামর্শ এ যুগে অচল। এসব অক্ষমতা আর অপদার্থতা ঢাকার প্রচেষ্টা মাত্র। আদর্শের মোড়ক দিয়ে মানুষকে ভোলানো ছাড়া আর কিছু নয় — এমনসব কথাবার্তা তাকে সব সময়ই শুনতে হয়। পরিবারের সকলের সঙ্গে তার মানসিক দূরত্ব অনেকখানি। বাকি জীবনটা কোনমতে কাটিয়ে দিতে পারলেই সে বাঁচে। পরিবারের মানুষজনেদের চাহিদাপূরণ করতে অক্ষম পুরুষ কোনপ্রকার অনুকম্পার যোগ্য নয়। এ যুগের এটাই হল সার কথা। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, আদর্শ এসব এখন ধিকৃত, তিরস্কৃত। এসব

কথা শুনলে কারো দিন চলে না। সংসারে অতন্দ্র তাই ব্রাত্যই বলা চলে।

(৪)

শেষবারের মতে অতন্দ্র তার বিক্রিত বাড়িতে ঢুকলো। তার ইচ্ছে দিন দুই সে এখানে একা নিছক একা আপন মনে থাকা। একা একা থেকে মনের সঙ্গে এক বোঝাপড়া করতে চায়। সারাদিন পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করে মনটা অনেকটা হাল্কা করে। তার মনে হয় সূতোটা যেন কেটে গেছে, আগের মত আন্তরিকতা বন্ধুদের মধ্যে পায় না। এটাই বোধহয় নিয়ম। রাত নটায় বাড়িতে ঢুকে অল্প কিছু খাবার খেয়ে সে বিছানায় শুয়ে একটা বই নিয়ে পড়তে বসে। একটা মস্ত টিকটিকি দেওয়ালে পোকা ধরে খাচ্ছে। এই প্রাণীদের কাছে সে একান্ত অপরিচিত, বোধহয় অবাঞ্ছিত। ঘন্টাখানেক পরে আলো কমিয়ে দিয়ে মশারী খাটিয়ে অতন্দ্র শুয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করেও ঘুম আসতে চায় না। ঘরগুলো এখন খালি। জিনিসপত্র সে কিছু স্থানান্তর করছে আর বাদবাকি প্রতিবেশীদের দিয়ে দিয়েছে। পুরোনো দিনের কত স্মৃতি তার মনে আসছে। কতদিন আগে কারা এখানে সংসার পেতেছিল জানা নেই, অতন্দ্র নিজে হাতে তা ভেঙে দিল। বুকচিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। নিজের মনকে সে বোঝাবার চেষ্টা করে —মানুষকে প্রয়োজনের তাগিদে দেশত্যাগী হতে হয়। পুরুষানুক্রমে কোথাও বাস করার দিন এখন শেষ হয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই পরিবর্তন হয়ে যায় এবং তাকে মেনে নিতে হয়। নইলে অযথা কষ্ট পেতে হয়। এটাইতো জীবন। হাতঘড়ি দেখলো — রাত ১১টা বাজে। সে উঠে একটু জল খেয়ে শুয়ে পড়লো। মাথা থেকে ভাবনাগুলো সে কিছুতেই ঝেড়ে ফেলতে পারছে না। মাথার ভিতর কেমন দপ্ দপ্ করছে। পাশের ঘরে ছুঁচো বা ইঁদুরগুলো হুটপাট করছে। বিশ্রী চামসে গন্ধ বার হচ্ছে। অতন্দ্র উঠে সেগুলোকে তাড়াবে ভাবলো কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, ওদের আশ্রয়চ্যুত করে কী লাভ! তাছাড়া কার বাড়ি থেকে সে তাড়াবে, এ বাড়িতে এখন তাদের কোন অধিকারই নেই। খালি বাড়িটাতে এরাই এখন রাজত্ব করছে। এরা ভালই আছে—এদের নেই কোন স্মৃতি, নেই বাড়ি ছাড়ার বেদনাবোধ! নানা কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ে মানসিক ক্লান্তিতে।

অতন্দ্র! অতন্দ্র! ওঠো — ডাক শুনে সে উঠে চোখ কচলায়।

এত রাতে কে তাকে নাম ধরে ডাকে?

আগন্তুক বলে — ভালো করে দেখ দেখি, আমায় চিনতে পারছ কিনা?

অস্ফুট কণ্ঠে সে বলে ওঠে — বাবা। আপনি?

হ্যাঁ, আমিই তোমার স্বর্গীয় পিতা বসন্ত কুমার।

অতন্দ্র!

বলুন, বাবা! —

তোরা এ কী করলি? আমাদের এতদিনের বাড়িটা এভাবে বিক্রি করে দিলি? একটু ভাবলি না? আমি দারিদ্র্যের মধ্যেও কত কষ্টে বাড়িটা টিকিয়ে রেখেছিলাম এই সাতপুরুষেরও অধিককালের ভদ্রাসন। আর তোরা পারলি না? তোদের এত অর্থের প্রয়োজন? আর বাড়ি বিক্রি করে সে প্রয়োজন মেটাতে হবে? বড় কষ্টে ব্যথায় আমার বুকখানা ফেটে যাচ্ছে, যন্ত্রণায় দেহটা জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে। পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদে তোরা অর্থকষ্টে ভুগছিস না। তবে, তবে কেন এ কাজ তোরা করলি? তোরা তো দরিদ্রের সন্তান ছিলি। কত কষ্টে তোদের মানুষ করেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি, তার এই পরিণতি?

অতন্দ্র তাকিয়ে দেখে তার পিতার মুখটা মলিন হয়ে গেছে। কাপড় পড়ে খালি গায়ে দাড়িয়ে আছেন। ধব্‌ধবে উপবীত শোভা পাচ্ছে।

অতন্দ্র অধোবদন হয়ে থাকে। কী উত্তর দেবে সে? আর বলার কী আছে?

কি চুপ করে রইলে কেন? উত্তর দাও।

আমি-আমি .... পারলাম না বাবা, আমি যে একা। আমাকে আপনি মাপ করুন। যা শাস্তি দেবেন, আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু ....। কান্নায়, আবেগে তার গলা ধরে আসে। বিশ্বাস করুন বাবা, আমি বড় অসহায়, বড় নিরুপায়। আমার পাশে কেউ নেই।

এভাবে আত্মসমর্পণ করলে কেন? আমার শিক্ষা কি বৃথা হয়ে গেল? আমাকে দেখে কিছু শিখলে না? তোমার প্রতি যে আস্থা ছিল তার মর্যাদা রাখলে কই? তোমার উর্ধ্বতন পুরুষদের হয়ে আমি এসেছি তোমার কাছে, শেষবারের মত চেষ্টা করে দেখ। আমার যোগ্য পুত্র হও।

এ কী ....! এ কী! ....।

হঠাৎ বসন্ত নতজানু হয়ে বসে পড়েন। —শোন পুত্র!

তোমার কাছে আমার শেষ মিনতি যেকোনভাবেই হোক, পিতৃপুরুষের এই ভদ্রাসন যেমন করে পার রক্ষা কর। আমার চরম বিপদের দিনেও এভাবে আমি কারো কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিনি। আমি হাত জোড় করে ....

এ কী .... এ কী করছেন বাবা! আমাকে অপরাধী করবেন না।

অতন্দ্র দেখলো তার বাবার চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো, যেন মুক্তা বিন্দু। দু'ফোঁটা জল মেঝেতে পড়ে দুটো বড় কালচে লাল রঙের গোলাপে পরিণত হলো। অতন্দ্র চিনতে পেরেছে। এ গোলাপের নাম পল নিরন। তাঁর বাবার বড় প্রিয় ছিল এ ফুল। বাড়িতে তাদের উঠোনে বাবা সার সার গোলাপ ফুল লাগিয়েছিলেন। কী সুন্দর বড় বড় ফুল ফুটতো!

বাবা! ধরাগলায় ডাকে অতন্দ্র।

বল পুত্র!

আমাকে আপনি আপনার কাছে নিয়ে চলুন। আমি আর পারছি না।

না পুত্র, তা হয় না। তাছাড়া সংসারটা লড়াই করার জায়গা, নিজেকে শক্ত কর। হার জিত আছে, বীরের মত লড়াই কর। কে তোমার পাশে আছে, কে তোমার পাশে নেই, সে কথা ভেবো না। তোমার কাজ তুমি করে যাও। পালিয়ে যেতে চেয়ো না।

বাবা! আমিও তো কম লড়াই করিনি। কিন্তু আর পারছি না। আমার সমস্ত শক্তি যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে। আমি ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত! সংসারে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। আমি চাইছি জীবন থেকে অবসর —অখন্ড অবসর।

হঠাৎ একটা আলোর ঝলক, খোলা জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকলো, চোখ তার ধাঁধিয়ে গেল। হ্যারিকেনটা বোধহয় তেলের অভাবে দপ্ দপ্ করে নিভে গেল। ঘরের মধ্যে নীরন্ধ্র অন্ধকার। আকাশে বোধহয় মেঘ করেছে।

অতন্দ্র ডাকে, বাবা।

কোন উত্তর নেই।

আবার ডাকতে যায় কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বার হয় না — গলাটা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মাথার বালিশের পাশে রাখা টর্চটা হাতড়ে হাতড়ে সুইচটা টিপে দেয়—উজ্জ্বল আলোয় আলোয় ঘর ভরে যায়।

কোথায় ?— কেউ নেই। ঘামে ভিজে গেজে। তাহলে, সে স্বপ্ন দেখছিল। উঠে পড়ে সে। মেঝেতে পড়ে রয়েছে দুটো বড় লাল গোলাপ যা সে কাল এনে টেবিলে রেখেছিল, বোধহয় ইঁদুরেই ফেলে দিয়েছে, পাত্রটা উল্টে পড়ে রয়েছে। গোলাপ দুটো তুলতে গিয়ে দেখে তার মধ্যে রয়েছে এক বিন্দু জল।

বিষণ্ণ হয়ে পড়ে অতন্দ্র। এ কি তা বাবার চোখের জল? না; এ সব কী ভাবছে সে!

গামছা দিয়ে বেশ করে গাটা মুছে নিয়ে, হাতে মুখে একটু জল দিল! এক গ্লাস জল খেল ঢক ঢক করে। তারপর আলোটা নিভিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল। একটু পরে মনে হল বুকটায় চাপ ধরছে। একটা হার্টের বড়ি ও একটা ঘুমের বড়ি একসঙ্গে খেয়ে নিল। একটু বেলাতে ঘুম ভাঙলেও ক্ষতি নেই। ভারমুক্ত করার জন্যে ভাল ঘুম দরকার।

পরদিন বাড়ির রক্ষক উমেশ এসে ডাকাডাকি শুরু করে। অনেক বেলা হলেও অতন্দ্র তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে দরজা ঠেলাঠেলি করতে ছিটকিনিটা খুলে গেল, বোধহয় আলগা করেই দেওয়া ছিল। ভেতরের ঘরে ঢুকে দেখা গেল মশারীর মধ্যে অতন্দ্র শুয়ে, দেহটা তার ঠাণ্ডা ও নিষ্প্রাণ। ডাক্তার এসে পরীক্ষার পর জানালেন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু ঘটেছে। হার্টের সমস্যা তার ছিল। বাড়ির চিন্তায় আর তাকে আকুল হতে হবে না। এখন সে যে বাড়িতে প্রস্থান করলো, সে বাড়ি আর কোনদিন বিক্রি হবে না, — পরম শান্তির নিকেতনেই সে পৌঁছে গেছে।

গল্প

D-DAY

সায়ক দত্ত চৌধুরী

বেলুড়মঠ লালবাগ বিদ্যালয়, হাওড়া

"লা মার্টসে ওরা সেভেনের টেব্‌ল জিজ্ঞেস করেছে। তপনদা বলল" —টাই-এর গিঁটটা ড্রেসিং টেবিলের সামনে ঠিক করতে বলল অরুণাভ। অরুণাভ রায়, 'মেডিলার্জ-এর সিনিয়ার সেলস্ এক্সিকিউটিভ। এই বহুজাতিক সংস্থাগুলোর অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মতোই ঝকঝকে, বুদ্ধিমান, উচ্চাকাঙ্ক্ষি এবং বাস্তববাদী। সুতপা তখন ছেলের সামনে বসে একমনে কয়েকটা বই-এ দাগ দিতে ব্যস্ত। মুখ তুলে প্রায় ফ্যাকাসে হয়ে বলল, "তাহলে কী হবে ? আমি যে ওকে পাঁচের টেব্‌ল অবধি শিখিয়েছি ? আরো কয়েকটা আজকে শেখানোর চেষ্টা করবো ?"

"আর সময় নেই, যা হবার হবে। মনোময়দাকে বলে ফাদার গ্রেগরি'র সঙ্গে যদি যোগাযোগ করা যায়, তাহলে একটু নিশ্চিন্ত হতে পারবো। যে কারণেই হোক, সেন্ট জেমসে ভর্তি করতেই হবে।"

যার জন্যে এই আলোচনা সে অবাক হয়ে একবার বাবা, আরেকবার মা-এর দিকে তাকাচ্ছিল। ওর নাম জয়। বয়স তিন বছর। টেবল্‌গুলো শেখা হয়নি বলে ভয় পাবে, না নতুন করে শিখতে হবে না বলে আনন্দিত হবে ঠিক বুঝতে পারছিল না। আসলে জয়ের বয়সী প্রায় সব বাচ্চারাই এই অবস্থাটার মধ্যে দিয়ে যায়। বিশেষত শহরাঞ্চলে। তাদের জীবনে প্রথম সবচেয়ে বড় লড়াই, একটা তথাকথিত বড় স্কুলে ভর্তি হবার জন্য লড়াই। ওদেরকে কেবল A, B, C, D বা অ, আ, ক, খ শিখলেই চলে না, ওদের রঙ চিনতে হয়, তাদের নির্ভুল বানান জানতে হয়, সমস্ত রকম আকার ও আকৃতির নাম ও বানান জানতে হয়, নামতা জানতে হয়, কবিতা, যোগ, বিয়োগ, পশু-পাখির নাম, তাদের বাসস্থান ইত্যাদি ইত্যাদি ওদের ছোট্ট মাথার মধ্যে ঠেসে ঢোকানো হয়। নয়তো বাবা-মায়েরা যে ইংরাজী মাধ্যমের, সর্বজনবিদিত স্কুল ওদের জন্য ঠিক করে রেখেছেন তাতে সুযোগ পাওয়া যাবে না যে। আর বাবা-মায়েদেরই বা দোষ দিই কী করে। এই ভোগসর্বস্ব, ইঁদুর দৌড়ের যুগে তারা নিজেরাও তো দিশেহারা। কোনো কোনো স্কুলে কবে ফর্ম দেওয়া হচ্ছে তা মনে রাখা, ফর্ম তোলা, ছেলেমেয়েদের মন্তেসরিতে ভর্তি করা, পারলে তাদের বাড়তি টিউশন দেওয়া, ইন্টারভিউ বোর্ডের মুখোমুখি হবার জন্য তৈরি হওয়া, তাতে তো আবার অবশ্যই কেবলমাত্র ইংরাজীতে কথা বলতে হবে ইত্যাদি সামলাতে গিয়ে তারাও তো উন্মাদ প্রায়। কিন্তু কেন ? আসলে একটা ভয় তৈরি করছে আজকের সমাজ। একটা ভাষায় কথোপকথনের চূড়ান্ত দখল তৈরি করতে না পারলে ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এই বোর্ড আর বাংলা মাধ্যম স্কুলের প্রতি অহেতুক অবিশ্বাস তাদেরকে যেন ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। শুধুই কি তাই ? নিজেরা যা পারেনি, ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেই স্বপ্ন পূরণ করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা আর গর্ব করার একটা ইচ্ছেও কি কাজ করে না ? এই ধরুন না কেন, অরুণাভর কথা। একটা গ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন ওর বাবা। মা-ও সেই স্কুলেরই শিক্ষিকা। পড়াশোনায় বেশ ভালই ছিল। প্রথাগত শিক্ষার পর চাকুরীর বাজারে নেমে দেখতে গেল বেসরকারী ক্ষেত্রগুলোতে ইংরাজীর প্রতাপ। তখন থেকেই যেন পরবর্তী প্রজন্মকে এই লড়াইয়ের হাত থেকে বাঁচানোর একটা ইচ্ছা কাজ করছিল তার মধ্যে। তাতে ইন্ধন জুগিয়েছে সুতপা। নিজে সাধারণ ঘরের মেয়ে। তাই তার ছেলেকে হতে হবে ঝকঝকে, স্মার্ট, ইংরেজীমুখর। টিভির সেই বিখ্যাত বিজ্ঞাপনের মতো তাদের ছেলেকেও ভর্তি হতে হবে 'সর্বোত্তম' বিদ্যালয়ে। সেন্ট জেমস তেমনি এক 'ডে বোর্ডিং' স্কুল। বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের শংসাপত্র পাওয়া যায় সে বিদ্যালয়ে। শহরের নতুন ক্রেজ। বাবা-মায়েদের দীর্ঘ সারি তার দরজার সামনে।

"লখোটিয়ার ভোঁদা ছেলেটা পর্যন্ত ভর্তি হয়ে গেল আর আমার ছেলে পারবে না ? কত ডোনেশান চাইতে পারে ? চল্লিশ হাজার, ষাট হাজার ?"— ভাবছিল অরুণাভ। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরলো সুতপার চিল চিৎকারে।

"হতভাগা ছেলে, কতবার বলেছি রম্বস-এর মধ্যে একটা এইচ্ থাকে যার উচ্চারণ হয় না। সেই ভুল বার বার করবি ? বানানের এই দশা হলে লেখাপড়া শিখবি কী করে ?"

মাথার মধ্যে যেন আগুন ধরে গেল অরুণাভর। সেও ঝাঁঝিয়ে উঠল— "ছেড়ে দাও। লেখাপড়া শিখিয়ে আর লাভ নেই। সারাজীবন মূর্খ হয়ে বসে থাকুক।" নিঃশব্দে দু'চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল জয়ের। "তোর সঙ্গে একটা জরুরী কথা

ছিল খোকন!" বলতে বলতে ঘরে ঢুকছিলেন মনোরমা। দৃশ্যটা দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর শান্ত স্বরে বললেন, "ছেলেটার ওপর কেন অত্যাচার চালাচ্ছিস। ঐ বয়সে তুই রম্বসের মানে জানতিস?"

অন্য সময় হলে কী হতো বলা যায় না কিন্তু এখন সমান তেজে অরুণাভ জবাব দিল—

"আমার সঙ্গে ওর তুলনা কোরো না মা। ও অনেক সুযোগ পাচ্ছে বা পাবে যা আমি পাইনি। আর দিন বদলাচ্ছে, ওর বয়সী সব বাচ্চারা এখন এগুলো শিখছে, ওর ভাল চাই বলে আমরাও তাই শেখাচ্ছি। তোমার কী ধারণা, সব বাবা-মায়েরাই এত খারাপ যে সবাই তাদের ছেলেদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে?" চুপ করে গেলেন মনোরমা। স্বামী মারা যাবার পর থেকে ছেলে-বৌমার কাছেই থাকেন, শ্রদ্ধা ও যত্নের কোনো অভাব নেই, কিন্তু বেশ বুঝতে পারেন, দুই প্রজন্মের চিন্তার সুর যেন কিছুতেই মিলছে না। বাংলা বিদ্যালয়ের পক্ষে সওয়াল করতে গিয়ে এমনই ঝড়ের মুখোমুখি পড়েছিলেন তিনি। তিনি জানেন তর্ক করে কোনো লাভ হয় না।

আজকে সেইদিন। D-Day. কাল রাত্রে অরুণাভর ঘুম বার বার করে ভেঙে গেছে। সুতপার ফর্সা মুখ যেন রক্তাল্পতায় আরো সাদাটে মেরে গেছে। সামনে গেলেই শোনা যাচ্ছে বিড়বিড় করে কী যেন বকে চলেছে সে। আসলে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোর উত্তর ইংরাজীতে ঠিক কীভাবে দেওয়া উচিত তা তাকে মুখস্থ করতে হয়েছিল। ইংরাজীতে সড়গড় না হবার দরুণ যদি আটকে যায় এই নিয়ে চরম দুশ্চিন্তায় রয়েছে সে। জয় তার বয়সী ছেলেদের তুলনায় এমনিতেই কম কথা বলে, আজ সে এক্কেবারে চুপ। ব্রেকফার্স্টের টেবিলে বসে আরেকবার পড়া ঝালানোর চেষ্টা করেছিল সুতপা, অরুণাভ ইশারায় বারণ করেছে। ছেলেটা ঘাবড়ে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় অরুণাভ দেখল মায়ের মুখ যেন মাত্রাতিরিক্ত গম্ভীর, কী যেন একটা আবারও বলতে গিয়ে থমকে গেলেন তিনি। ট্যাক্সিতে চড়ে হঠাৎই একটা কথা মনে পড়ল অরুণাভর। সে বলল, "শোনো, তোমাদের দু'জনকেই বলছি। যদি জিজ্ঞেস করে, কীসে চড়ে স্কুলে এসেছ বলবে 'বাই কার'। নিজের গাড়ী না থাকলে এসব স্কুলে ভর্তি নাও করতে পারে। আর মিথ্যেও খুব একটা বলা হবে না। নতুন সেশন শুরু হবার আগেই আমি চেষ্টা করছি একটা গাড়ী কেনার। অন্তত সেকেন্ড হ্যান্ড!" নিজের ছেলে, বৌ-কে মিথ্যে বলতে বাধ্য করার জন্য একটুও লজ্জিত হলো কি সে?

সেন্ট জেমসের মার্বেলশোভিত সুদীর্ঘ ওয়েটিং রুম'-এ আরো পনেরো/কুড়ি জোড়া বাবা-মায়ের সঙ্গে ওরাও বসে আছে স্থির চিত্রের মতো। এমনিতে কয়েকটা বাচ্চা বেশ হাসিখুশি। কিন্তু একটু আগেই দু'টো ছোট্ট মেয়ে, দু'জনের মধ্যে খুনসুটি করতে করতে খিলখিলিয়ে হেসে উঠতেই, 'ডিসিপ্লিন্ড' করার জন্য দু'জনের বাবা-মায়েরাই যে পরিমাণ দাবড়ানি দিলেন তাতে তাদের উৎকণ্ঠাটা বেশ বোঝা গেল। ঘরটাতে তখন শ্মশানের স্তব্ধতা বিরাজ করছে। অরুণাভ দেখল দু'জন ব্লেজার বা স্যুট পড়ে এসেছে। তার নিজের জামা-প্যান্টটা দেখলেই বোঝা যায় বেশ দামী, তবুও তার স্যুটটা পরে আসাই বোধহয় উচিত ছিল। এমন সময় সুতপা কানের কাছে ফিসফিস করে উঠল—

"আমার বেশ ভয় করছে!"

এ আর নতুন কথা কী। তবু অরুণাভ বলল, "কেন? প্রশ্নের উত্তর ভুলে যাচ্ছ, না জয় উত্তর দিতে পারবে না বলে ভাবছো?"

"না গো, কালকে তো অনিমাদিদের ইন্টারভিউ ছিল। টুবলুতো এমনিতে বেশ হাসিখুশি ছেলে। কিন্তু কী যে হলো, ইন্টারভিউ রুমের সামনে গিয়ে কেন যে হঠাৎ কান্না জুড়ে দিল। জোর করে ঢুকিয়েও কোনো লাভ হলো না। চান্স যে পাবে না তা একেবারে নিশ্চিত। এখন নাকি এই ঘটনাটা অনেক বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই ঘটছে!" আড়চোখে একবার জয়ের দিকে তাকালো অরুণাভ। কী যে ভাবছে ঠিক বোঝা গেল না। বাচ্চাগুলোর মুড কখন যে কী হয়। দুলালদার মেয়েটা নাকি ইন্টারভিউ-এর সময় "আমি জানি, কিন্তু বলতে ইচ্ছা করছে না" বলে চুপ করে বসেছিল কোনো উত্তর না দিয়ে। তেমন যদি জয় কিছু করে? ভাবতেই বিনবিনিয়ে ঘাম ঝরতে আরম্ভ করল তার কপাল বেয়ে। এদিকে আরেক চিন্তা। ঘড়ির কাঁটা প্রায় বারোটার কাছে এসে গেছে। বারোটার আগে ঢুকলে জয়কে 'গুড মর্নিং' বলতে হবে আর বারোটার পরে ঢুকলে 'গুড আফটার নুন'। যদি গুলিয়ে ফেলে।

দরজার কাছ থেকে বেয়ারা ডাক দিল— "মিঃ এন্ড মিসেস অরুণাভ রায়!" বারোটা বাজতে পাঁচ। গুড মর্নিং চলবে। সুদৃশ্য ঘরটাতে এক যাজকের সাথে আরো তিনজন বসে আছেন। অরুণাভ বুঝলো তার নিজের চাকরীর ইন্টারভিউয়েও এত উৎকণ্ঠা ছিল না। ঘরের কোণে রাখা একটা ছোটো চেয়ারে নিয়ে গিয়ে জয়কে আলাদা করে বসলেন দুই মহিলা। ছেলেটার মুখটা কি করুণ দেখাচ্ছে? চোখ ফেরাল অরুণাভ। তার রিং-এ এখন দুইয়ের বিরুদ্ধে দুই। প্রথম প্রশ্নটা চেনা — "কেন

সেন্ট জেমসেই ভর্তি করতে চান।" বলটা ফেস করল সুতপা। সরকারী স্কুলে কিছু পড়ানো হয় না, ইংরাজীর প্রয়োজনীয়তা, তার সাথে এই বিদ্যালয়ের গুণকীর্তন ভালই করল সে। আড়চোখে ওদিকে কী হচ্ছে দেখার চেষ্টা করছিল অরুণাভ। জয় সমানে দুটো পা দুলিয়ে চলেছে। অরুণাভ জানে বাচ্চারা বিপন্ন বোধ করলে তার কোনো না কোনো বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পরের প্রশ্ন "উই সে উই ডোন্ট টিচ্, এডুকেট, ডু ইউ নো হোয়াই ?" এটা সুতপার ক্ষমতার বাইরে। অরুণাভ মাঠে নামল। তার শিক্ষক-শিক্ষিকা, পিতা-মাতার সংস্পর্শে যা জ্ঞান অর্জন হয়েছিল তার সবটা কাজে লাগাতে হবে। জবাব দিতে দিতেই সর্বনাশটা প্রথম টের পেলো অরুণাভ। তার নাক সুড়সুড় করছে। এবং তাড়াহুড়োতে রুমাল ফেলে এসেছে সে। হাঁচিটা চেপে জবাব শেষ করল সে। এরপর একের পর এক প্রশ্নবান। বেশ কিছুটা সময় পর ফাদার তাদের স্কুল যে কত মহান সে ব্যাখ্যা শুরু করলেন। এদিকে অরুণাভর দমবন্ধ অবস্থা। আর চেপে রাখা যাচ্ছে না। ভয়ানক নাক সুড়সুড় করছে। ফাদার তার কথার সমর্থনের জন্য তার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কী বলেন মিঃ রায়।" "হ্যিয়েস" — হাঁচি আর জবাব একসঙ্গে বেরিয়ে এলো। তারপর বোমার মতো পরপর আট/দশটা হাঁচি। এরকমই হয়। সে একটাতে কিছুতেই থামতে পারে না। ঘরভর্তি লোক চুপ। মায় জয় পর্যন্ত তার দিকে তাকিয়ে। এরপর কিছু কথা হলো বটে কিন্তু সুর যে কেটে গেছে বেশ বুঝলো সে। শেষ গন্ডগোলটা হলো জয়কে নিয়ে। দিদিমণিদের কাছ থেকে যখন লজেন্স পেলো, "থ্যাঙ্ক ইউ" বলতে বেমালুম ভুলে গেল সে। ডোনেশনের কথা একবারও তুললেন না স্কুল কর্তৃপক্ষের কেউ। বেরিয়ে এসে তার ভুলের জন্য জয়কে বকতে গিয়েছিল সুতপা, অরুণাভ বারণ করলো। এখন শেষ ভরসা মনোময়দা।

বাড়ি ফিরতে প্রায় সন্ধে হয়ে গেল ওদের। ফ্ল্যাটে ঢুকে চুপচাপ পোষাক বদলাচ্ছিল সবাই, এমন সময় কমলার মা এসে জিজ্ঞেস করল—

"চা দেবো দাদাবাবু।"

"দাও। মা কোথায় ? দেখতে পাচ্ছি নাতো।"

"মাসিমণি তো ব্যাগ নিয়ে দুপুরবেলা বেরিয়ে গেলেন।"

"কোথায় ?"

"তাতো আমায় বললেন না। এই কাগজটা দিয়ে গেলেন।"

ভ্রূ কুঁচকে কাগজটা নিল অরুণাভ। মায়ের চিঠি। মা লিখেছেন—

'খোকা,

অনেকদিন ধরেই সিদ্ধান্তটা নিচ্ছিলাম। তোদের বলবো বলবো করেও বলা হয়নি। কালকে যখন বলতে চাইলাম দেখলাম তোরা কী দুশ্চিন্তার মধ্যে রয়েছিস, তাই আর বিরক্ত করলাম না। তুই তো জানিস সারা জীবন কাজে জড়িয়ে থাকার পর শহরের একটা ফ্ল্যাটে প্রায় কর্মহীন জীবন কী কষ্টকর হয়। তোরা সবাই ব্যস্ত, এমনকী জয় পর্যন্ত তার ছোট্টো জীবনে এমন দৌড়ে চলেছে, তার সঙ্গে আমি খাপ খাওয়াতে পারছিলাম না রে। তাই ঠিক করলাম আমি চলে যাবো। ভয় পাস না, এ কোনো নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়। ঈশিতাকে মনে আছে ? আমার ছাত্রী, এখন পুরুলিয়ার 'সূর্যোদয়' স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা। ওখানে পিছিয়ে পড়া সাঁওতাল আদিবাসী ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে লেখাপড়া শেখাচ্ছে ওরা। আমাকে অনেকদিন ধরেই বলছিল, আমাকে ওদের দরকার। মনস্থির করতে পারছিলাম না। কিন্তু যখন তোদের সাথে থেকে দেখলাম কিছুতেই মেলাতে পারছি না ঠিক করলাম ওখানেই যাবো। বলবি, কীই বা অসুবিধা ছিল আমার। অসুবিধা শরীরে নয়, মনে। জয় পঁচিশে ডিসেম্বর জানে কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারি নয়। ক্যালেন্ডারের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ আজ সেই একুশে ফেব্রুয়ারি, যেদিন মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারেরা। আমরা এখন কেবল টিঁকে থাকার জন্য ওদের কত সহজে ভুলে যাচ্ছি বল ? আচ্ছা, এটাই কি প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা বা বিশ্বায়ন ? ভবিষ্যৎ কী এই দৌড়ের ? ভালো থাকিস। তোদের আতঙ্কের জন্য ছোট্ট ছেলেটার জীবন কষ্টে ভরে দিস না। ওখানে তো টেলিফোন নেই; তাই পৌঁছেই ফোন করতে পারবো না, তবে খবর কোনো না কোনো রকমভাবে ঠিকই পাঠাবো। ভালোবাসা নিস। দাদুভাইকে ভালোবাসা দিবি। বিশ্বাস কর তোদের প্রতি কোনরকম রাগ নিয়ে আমি যাচ্ছি না।

ইতি মা।

— ও, হ্যাঁ, একটা খবর দিতে ভুলে গিয়েছিলাম ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ ফান্ড-এর বনসংরক্ষণের ওপর আন্তর্জাতিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সূর্যোদয়ের একটা সাঁওতাল ছেলে দ্বিতীয় হয়েছে। বনের অসুখ সম্পর্কে ওদের চেয়ে কে ভালো জানবে বল। আবার বলছি, ভালো থাকিস, মনখারাপ করিস না।"

চিঠিটা হাতে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অরুণাভ। তাদের আলিপুরের এই গর্বোদ্ধত অভ্রংলিহ মিনারে কোনো এক সংখ্যালঘু বাঙালি রেডিও চালিয়েছে, আর তাতে গান বাজছে—

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি।"

ভীম

তরুণ দত্ত

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, চিত্তরঞ্জন কলোনী হিন্দু বিদ্যাপীঠ, *উত্তর ২৪ পরগণা*

মহাভারতের ভীম পঞ্চপাণ্ডবের একজন, যাঁর দৈহিক শক্তির কথা ছেলেবুড়ো সবাই জানে। অপরিমেয় শক্তিধর সেই মধ্যম পাণ্ডব ভীম এ গল্পের নায়ক নয়।

সহজ, সরল, সত্যভাষী ও অহঙ্কারহীন মানুষ সত্যই এখন খুঁজে পাওয়া ভার — একথা বললেও কাছেপিঠে হাতের নাগালেই সেই মানুষের দেখা মিলে যেতে পারে। ভীম যেন তারই প্রতীক।

ভীমের বর্তমান বয়স চৌত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ হবে। তামার মতো গায়ের রং, সুঠাম দেহ, সবসময় মুখে হাসি লেগেই আছে।

অনেকদিন আগেকার কথা, অর্জুনপুর বাজারে ভীমের বাবা পাণ্ডুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে বলেছিল — 'আমি মুখ্যসুখ্য মানুষ, চোখ থাকতেও কানা। ছেইলেটা পড়তে চায়।' ভীমকে দেখিয়ে বলেছিল — 'প্রাইমারিতে পাস করেছে।' ভীমের দিকে তাকিয়ে দেখলাম গায়ে একটা ছেঁড়া জামা ছাড়া আর কিছু নেই। শীতের সকালের হিমেল বাতাসে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। দেখে কেমন একটা মায়া হল। পরম স্নেহে কাছে ডেকে বললাম — 'এগারোটা নাগাদ স্কুলে আসিস। হেডমাস্টার মহাশয়কে বলে দেব — ওকে ভর্তি করে নেবে।'

ভীমের বাড়ি রাজারহাট থানার অর্জুনপুর গ্রামের চড়কতলার কাছাকাছি। তার বাবা পাণ্ডু ঘরামীর কাজ করে দুমুঠো ভাতের ব্যবস্থা করত। পরিবারের সদস্যসংখ্যা ছিল পাঁচ। অন্যের ঘর ছাইলেও নিজেরটা না ছাওয়ার জন্য বর্ষাকালে তাদের অসুবিধায় পড়তে হত। তখন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অবৈতনিক ছিল না। অথচ এমনই অবস্থা তার বেতন দেওয়ার সামর্থ্য নেই। পাঠ্যপুস্তক কিনবে কী করে? তখন মাস্টার মহাশয়দের মাস মাহিনা ছাত্রদের বেতনের উপর নির্ভর করতে হত। শিক্ষকদের সামান্য মাস মাহিনা ও ডি এ নিয়মিত না হওয়ায় শিক্ষকদেরও ভয়ঙ্কর অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্বভাবতই ভীমের জন্য জামা-কাপড় কিনে দিতে পারলেও বেতনের টাকা তাদের পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। বিদ্যালয়ের সেক্রেটারীকে অনুরোধ করায় ভীমের ফি মুকুব হয়ে যায়।

এক চৈত্রে চড়কতলায় ঢাকের বাজনা শোনা গেল। ঢাকীরা ঢাক বাজাচ্ছে, সন্ন্যাসীরা বাজনার তালে তালে এক অপূর্ব ভঙ্গীতে নাচছে। শিবকে কেন্দ্র করে গাজন, নীল, চড়ক প্রভৃতি চৈত্রমাসের ধর্মোৎসব। চারদিন ধরে মানুষজনের মাতামাতি হয় এই পার্বণে। নিচে কাঁটা দ্বারা বিদ্ধ ধানের বিচালির বস্তা, ডবল গামছা বেঁধে সন্ন্যাসীরা দুদিকে টেনে ধরে। উপরে বাঁশের বাধা খুঁটি থেকে পরপর সন্ন্যাসীরা নানা কায়দায় ঝাঁপ দেয়। ঢাকের বাজনা, মাইকের আওয়াজ, বিভিন্ন জিনিষপত্রের বিভিন্ন দোকান বহুজনের সমাবেশে একটা ভিন্নতর মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করে।

নীলের রাতে গাজনতলায় ভারি ধূমধাম সহকারে মানুষজন মেতে উঠেছে। ঢাকের বাদ্যে, সন্ন্যাসীদের চিৎকারে কারো নিদ্রা যাওয়ার উপায় নেই। ভীমের বাবা পাণ্ডু এই উৎসব বা পার্বণে একজন মূল সন্ন্যাসী। কয়েকদিন অত্যধিক নিয়মকানুনের বেড়াজালে সে বন্দী। ক্লান্ত হয়ে ঘরে গিয়ে হাঁড়ির আমানি খেয়ে কলেরায় বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। স্বভাবতই ভীমের সংসারে আরো দুর্দিন নেমে আসে। মা বাড়ী বাড়ী কাজ করে কোনরকমে সংসার চালায়। অনেকদিন অনাহারেও কাটাতে হয়। তখন দেশে চলছে জরুরী অবস্থা। আধা-ফ্যাসিস্ট হামলায় স্থানীয় বিদ্যালয়ের আটজন শিক্ষক বিতাড়িত হয়েছেন। আমি সহ এদের অনেককেই এলাকা ছাড়তে হয়েছে। ভীমের পড়াশুনার খোঁজ রাখা আর সম্ভব হয়ে উঠলো না।

২০০৫ সালের অর্জুনপুরের খালপাড়ে ভীমের সঙ্গে আবার দেখা হয়। ভীমের বিস্তারিত খবর নিতেই ভীম বলে উঠল — "পেটের জ্বালা বড় কঠিন জ্বালা, স্যার। একমুঠো ভাতের জন্য কী কষ্ট! অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে এবং একরকম অনাহারে মা মারা যান। এক দাদা ছিল সেও কোথায় হারিয়েছে। রইল কেবল ছোট বোন। একটা কাজের সন্ধানে পথে পথেই ঘুরতাম। পশু, পাখিরা তাদের বাচ্চাদের মুখে খাবার তুলে দেয়। কিন্তু আমার তেমন তো কেউ ছিল না। হঠাৎ এক সহৃদয় ব্যক্তি আমাকে একটি ছোট কারখানায় কাজ দেয়। কয়েক বছর কারখানার মেশিন চালিয়ে মেশিনের যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা হলো। ফলে মেশিনগুলি অচল অবস্থা হলে তার পার্টস কিনে সচল করার ব্যবস্থা করতে পারতাম।"

ভীমের মধ্যে অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি ঘটে চলেছে। "বেঁচে থাকার জন্য অনেক সংগ্রাম করেছি — গ্লাসটা সযত্নে ধুয়ে লোককে জল দিয়েছি, চা এনেছি, জলখাবার এনেছি রাস্তার দোকান থেকে। লোকের পছন্দ মতন জিনিসপত্র আনা বেশ

কঠিন কাজ। বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে সে কাজ করতে হয়। নিয়ত প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আত্মবিকাশ ও আত্মবিশ্বাস আনতে সক্ষম হয়েছি।"

তারপর ঘটনা দীর্ঘ। কারখানার মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হলো। মালিক অতিরিক্ত মুনাফার জন্য কয়েকজন শ্রমিককে ছাঁটাই করল। শ্রমিকদের সাপ্তাহিক বেতন নিয়মিত না দেওয়ায় শ্রমিকদের অসন্তোষ সৃষ্টি হলো। ভীমের প্রতি মালিকের বিশেষ অনুকম্পা থাকায় ভীমকে শ্রমিকরা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। এই ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে ভীম কারখানার কাজ ছাড়াই শ্রেয় মনে করল।

সংসারে কেবল ১৫ বছরের একটি বোন ছাড়া ভীমের আর কেউ ছিল না। ভাই-বোন মাথায় করে বেগুন-কুমড়ো-লাউ হাটে বাজারে বিক্রি করত ; এতেই তাদের কোনরকমে সংসার চলত।

একদিন বাজারে তার ছোট কারখানার মালিক নয়নচাঁদের সঙ্গে দেখা হলো। মালিক বলল, "তোর সব কাজের মধ্যে নিষ্ঠা আছে। তুই কারখানায় ফিরে আয়। তোকে কারখানার ম্যানেজার করে দেব, তাতে তোর মাহিনা অনেকটা বেড়ে যাবে।"

ভীম পুরনো সাথীদের নিয়ে কারখানায় কাজ করতে চায়। কিন্তু মালিক নয়নচাঁদ রাজী না হওয়ায় তার ম্যানেজার হওয়া হলো না।

নয়নচাঁদ মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন — 'পুরনো সাথীদের বাদ দিয়ে নতুন জোয়ান শ্রমিকদের নিয়ে কাজ করলে কারখানাটা ভালো চলবে।' নয়নচাঁদ এই ধরনের নানা বক্তব্য রাখলেও ভীমকে টলাতে পারল না। শেষে হুমকি দিয়ে নয়নচাঁদ বলল — "তোকে বাজারে আনাজপত্র নিয়ে বিক্রি করতে দেব না। এই বাজারের জমিই অর্ধেকটাই আমার। বাজার কমিটি আমার কথানুসারে চলে।" অগত্যা ভীমকে সিদ্ধান্ত নিতে হলো তার পারিবারিক জমি অর্দ্ধেকটা বিক্রি করে বাড়ীতেই ছোট কারখানা করবে। কারখানার কাজ করার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ১০জন ছাঁটাই শ্রমিক নিয়ে কাজ শুরু করবে। ভীমের জীবন অবাধ ও নিষ্কন্টক নয়, প্রতি পদে পদে নানা বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়, প্রবল সংগ্রামী প্রয়াস এবং ভিতরে কঠিন আত্মবিশ্বাস নিয়েই ভীম এই দুরূহ কার্যে ব্রতী হয়েছে।

ভীমের কারখানাটি অর্জুনপুরের সীমানায় দেশবন্ধুনগরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। কারখানাটির মাথায় টিনের আচ্ছাদন, চারিদিকে শক্তপোক্ত একটি দরজা ও জানালা সহ দরমার বেড়ায় ঘেরা। ছোট বড় নয়টি মেশিন কেনা হয়েছে। দশজন পুরনো সাথী শ্রমিকরা চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করে। চুক্তির ভিত্তি হলো উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে যে অর্থ আসবে তার একটা অংশ কারখানার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য থাকবে, বাকী অর্থ সমভাগে ভীম সহ দশজন শ্রমিক ভাগ করে নেবে।

ভীমের কারখানার কাস্টিং পাওয়ার প্রেস, বিস্টন পাওয়ার প্রেস ও গিয়ার প্রেস প্রভৃতি মেশিনে সাইকেল রিক্সার নাট, বড় চাকতি ও টেবিলফ্যানের আর্মেচার তৈরী হয়।

ভীম ভোর পাঁচটায় উঠে প্রাতঃকালীন জলখাবার খেয়ে সে তার ছোট কারখানায় চলে আসে। রাত দশটা পর্যন্ত নানা ধরনের কাজ করে। সকালে তাকে কারখানায় পাওয়া যাবে। কোন মেশিন অচল হলে চালু করার জন্য সাধারণ যন্ত্রপাতি দিয়ে মেশিনগুলি ঠিক করে।

কারখানার উৎপাদিত দু'শ কিলো দ্রব্য প্রায় প্রতিদিন সাইকেলে চাপিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গিয়ে লালবাজারের কাছে বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে হার্ডওয়ারের দোকানগুলিতে বিক্রি করে।

উৎস থেকে বেরিয়ে নদী অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলে সব বাধাকে অতিক্রম করে ; সেইরকমই ভীম সমস্ত বাধাকে দূরে সরিয়ে ক্ষুদ্র মৌমাছির মতো গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে পুষ্প থেকে পুষ্পান্তরে বিচরণ করে তিল তিল করে মধু সংগ্রহ করেছে। সেই মধু নিজের জন্য নয়, সমাজের বঞ্চিত মানুষের জন্য। পরার্থে জীবন উৎসর্গ করে ভীম প্রকৃত আনন্দ পেতে চায়।

এর কিছুদিন পরে, বছর খানেক হবে, ভীমের সঙ্গে কারখানায় গিয়ে জানতে পারি ভীম কয়েকদিন হলো কারখানায় আসছে না। কাছেই ভীমের বাড়িতে গিয়ে দেখি বিছানায় শুয়ে শীর্ণদেহের মানুষ। ভীম তাকে পাখার বাতাস করছে। আমায় দেখে শীর্ণদেহের মানুষ কারখানার শ্রমিক রতন উঠে বসল। ভীম বলল — "এই আমার রতনদাদা, ষোলোদিন ওর জ্বর, ওকে দেখার আমি ছাড়া কেউ নেই। তাই ওকে ছেড়ে যেতে পারিনি।" সর্বহারা মানুষের প্রতি ভীমের এত ভালোবাসা দেখে আমার মাথা নত হয়ে গেল।

এরপর জানতে পেরেছি ভীম মিউনিসিপ্যালিটির ওয়ার্ড কমিটির মেম্বার হয়েছে। ওয়ার্ডের মানুষেরা ওকে খুবই ভালোবাসে। ওর চালচলনে একটা মধুর ভাব ও সদাহাস্য মুখ থাকায় সাধারণ মানুষ নিজের প্রাণের মানুষ হিসেবে মনে করে। সকলের বিপদে আপদে ভীম পাশে থেকে দৈহিক ও আর্থিক সাহায্য করে।

ক্ষুধিতের কাছে ক্ষুধার জ্বালা ও অভাবের তাড়না এতই তীব্র ভীম তা নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ করেছে, সেইকারণে বাস্তবের সমস্যা তাকে সমাধান খুঁজতে বাধ্য করে। স্কুলে পড়ার সময় সে একজন শিক্ষকের কাছে শুনেছিল সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন — "পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন স্থায়ী সুখের অন্য কোনো মূল্য নেই।" — একথা সে আজও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে চলেছে।

জলের অন্য নাম যখন 'মরণ'

মনোজিৎ মণ্ডল
কোনা হাইস্কুল, হাওড়া

ধরুন আপনি কারো বাড়ি গেছেন। অতিথিসেবার সূচনা করতে আপনার হাতে তুলে দেওয়া হল এক গ্লাস শীতল বিষ। আপনার কেমন লাগবে? অবাক হয়ে যাচ্ছেন আমার কথা শুনে। না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। আবার জলের পরিবর্তে বিষ তুলে দেওয়াটাও স্বাভাবিক। অবশ্য অজ্ঞাতসারেই। অথচ জল আমাদের চাই-ই-চাই। জল ছাড়া জীবন অচল।

বিদ্রোহী কবি'র কথায় — "রৌদ্র-তপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল"। সুতরাং নতুন করে আর বলার অপেক্ষা রাখে না জল আমাদের কত আদরের, কত প্রয়োজনীয়। বস্তুত জলের সাথে মাছের যে সম্পর্ক, আমাদের সাথে জলেরও তাই। বিশুদ্ধ জলের প্রাকৃতিক উৎস বৃষ্টি-বৃষ্টি আর বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির কথা মনে এলেই মনে পড়ে যায় শৈশবের ফেলে আসা দিনগুলোকে। আকাশ ভেঙে নেমেছে অঝোর ধারার মুক্তোপাত। বাবা-মা'র কঠোর শাসন উপেক্ষা করে পাড়ার ছেলেরা মিলে নেমে গেছি জলকাদাভরা মাঠে। আহা সে কি আনন্দ! কিন্তু অতি আকাঙ্ক্ষিত সেই বৃষ্টি যখন মাঝে মাঝে অভিশাপ হয়ে নেমে আসে ধরণীর বুকে, তখন জলের আর এক নাম হয় মরণ! যে নদীর কাঁচ-সাদা শীতল জল আর কুলুকুলু ছন্দের টানে আপনি শহরের জীবনকে সাময়িক টা-টা জানিয়ে চলে গেছেন সুদুর গ্রামে, সেই নদীতে প্রাণ জুড়োতে নামলে যদি গা ভ'রে যায় দগ্‌দগে ফোসকায়, তখন কাকে দায়ী করা যায় বলুন তো? বৃষ্টির জলে বৃক্ষকূল নৃত্য না করে যদি লুটিয়ে পড়ে ধুলার পরে তবে সে কেমন বৃষ্টি? হ্যাঁ, এও এক ধরনের বৃষ্টি। এ হল শিল্প-সভ্যতার বিস্ময়কর সৃষ্টি! এর নাম 'অম্লবৃষ্টি'। কেহ কেহ আবার সম্মান দিয়ে বলেন Acid rain যা আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয়। পিছনে তাকালে দেখা যায় অম্লবৃষ্টির কথা প্রথম ব্যবহার করা হয় ১৮৭২ সালে। বিলাতের জনৈক রসায়নবিদ্ সর্বপ্রথম এই বিশ্বাসঘাতক বৃষ্টি সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সাবধান করে দেন। কলকারখানার ধোঁয়া-ময়লার মারাত্মক প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। কারণ কলকারখানার নাইট্রোজেন ও সালফারের অক্সাইড-ই প্রকৃতির নির্মল হাস্যোজ্বল নীলাকাশকে করে তোলে ধূসর কালো বিষময়। যা থেকে জন্ম এই শত্রুবৃষ্টি?

কীভাবে জন্ম নেয় অম্লবৃষ্টি?

Man is the loftiest Pinnacle of the evolutionary fabric. মানুষ নব নব সৃষ্টিতে যেমন পারদর্শী, ধ্বংসতেও সমান দক্ষ। শিল্পবিপ্লবের সাথে সাথে মানুষ পৃথিবীতে কলকারখানার সংখ্যা দ্রুত বাড়ালেও শিল্পের বর্জ্য পদার্থসমূহের যথাযথ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করেনি। ফলে বায়ুমন্ডলে বেড়েছে কার্বন ডাই অক্সাইডের (CO_2) পরিমাণ। আর এক সাথে তাল মিলিয়ে বিগত ১৫০ বছরে পৃথিবীর বুকে সালফার ও নাইট্রোজেনের বৃদ্ধিও ঘটেছে দ্রুতহারে। এখন এই নাইট্রোজেন, সালফার, জল ও সূর্যের আলো মিলিতভাবে তৈরী করে সর্বনাশা সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) এবং নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) যা হাত ধরাধরি করে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে মৃত্যুর পরোয়ানারূপে। তত্ত্বগতভাবে নির্ভেজাল বৃষ্টির জলের P^H হল ৫·৬ যা আমাদের লালারস এবং দুধের P^H-র তুলনায় সামান্য বেশী আম্লিক।

অন্যদিকে কলকারখানার, যে সমস্ত অধঃক্ষেপ হিমবাহের নীচে চাপা পড়ে আছে তাদের P^H ৫·০ বা তারো কম।

আবার অম্লবৃষ্টি যেভাবেই নেমে আসুক না কেন যেমন—বৃষ্টি, তুষারপাত, কুয়াশা, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতির মাধ্যমে সর্বদাই এর মধ্যে থাকে উচ্চমাত্রায় অ্যাসিড যার ৭০ শতাংশ আসে সালফার ডাই অক্সাইড ও হাইড্রোজেন সালফাইডের জারণ ও জল বিশ্লেষণ (Hydrolysis)-এর মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ৩০ শতাংশ আসে নাইট্রিক অক্সাইড ও অন্যান্য যৌগ থেকে।

পরিসংখ্যান বলছে, ১৯৭৫ সালে আমেরিকায় মোট প্রায়

২৮·৫ মিলিয়ন টন সালফার অধঃক্ষিপ্ত হয়। অধঃক্ষিপ্ত এই সালফারের ৬৫ শতাংশের জন্ম বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম থেকে, ২৫ শতাংশের জন্ম শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন উপাদান থেকে এবং বাকী ১০ শতাংশের জন্ম Nonferrous জাতীয় বস্তুর গলিত অংশ থেকে।

অন্যদিকে ওই একই বছরে সমগ্র আমেরিকায় মোট প্রায় ২৪·৪ মিলিয়ন টন নাইট্রোজেন নিক্ষিপ্ত হয় যার প্রধান উৎস যানবাহন (৪৫ শতাংশ), বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম (২৮ শতাংশ) এবং শিল্পের অন্যান্য পদার্থ (২৭ শতাংশ)। এখানে একটা কথা আমাদের মনে রাখা দরকার যে সালফার ও নাইট্রোজেন উভয়েই প্রস্তরীভূত জ্বালানি দ্রব্যের প্রজ্জ্বলনকে ত্বরান্বিত করে যা আবার অম্লবৃষ্টির অন্যতম সহায়ক।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অম্লবৃষ্টিপাত

স্মৃতিসৌধের সংখ্যা আমাদের দেশে বা পৃথিবীতে কম নেই। তবু এ-প্রসঙ্গ এলেই আমাদের মনের মুকুরে একে একে হাজির হয় তাজমহল, ভিক্টোরিয়া প্রভৃতি। তেমনি পৃথিবীতে এমন কতকগুলি অম্লবৃষ্টি হয়ে গেছে যার উল্লেখ না করলে এই আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে টরেন্টো শহরে এমন এক বৃষ্টিপাত হয়েছিল যার স্বাদ তেঁতুলের মতোই টক ছিল। এর ঠিক দু'বছর পরে অর্থাৎ ১৯৮১ সালে লস্ এঞ্জেলস্ শহরে যে কুয়াশার উদয় হয় তার P^H ছিল ২·২ যার সঙ্গে অ্যাসিডের স্বাদের পার্থক্য সামান্যই।

আর নরওয়ে নামক দেশটিতে প্রতি বছর এমন বৃষ্টিপাত হয় যাকে বারি বর্ষণ না বলে লেবুর রস বর্ষণ বলাই বাঞ্চনীয়।

রেকর্ড ঘাটলে দেখা যায় আমেরিকার পেনসিলভানিয়া শহরে একবার এমন বৃষ্টিপাত হয়েছিল যে ভিনিগার আর সেইস বৃষ্টির জলের পার্থক্য করাটাই দুষ্কর হয়ে পড়েছিল।

তবে আজ পর্যন্ত যত অম্লবৃষ্টি হয়েছে তার মধ্যে সব থেকে বেশী অ্যাসিড ছিল আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়ার হুইলিং শহরের অম্লবৃষ্টিতে। এই বৃষ্টির জলের P^H ছিল ১·৪ যা ব্যাটারিতে ব্যবহৃত অ্যাসিডের প্রায় কাছাকাছি এবং স্বাদেও ততোধিক কড়া।

রাজত্বের সীমানা

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী অম্লবৃষ্টি হয় মধ্য ইউরোপ, উত্তর-পূর্ব আমেরিকা এবং জাপানে। অন্যদিকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিন্তু হাঙ্গেরী, পোল্যান্ড আর চেকোশ্লোভাকিয়া। ধনতান্ত্রিক আমেরিকা বা জাপানরা মুনাফা বাড়ানোর জন্য শিল্প সম্প্রসারণ করে জন্ম দিচ্ছে অম্লবৃষ্টির, তবে তার মানে এই নয় যে তার ছোঁয়া গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে পৌঁছাবে না। আসলে উড়ন্ত প্রকৃতির হওয়ায় (Aerosol nature) অম্লবৃষ্টি কোন বাধা মানে না। দেশ-বিদেশ বোঝে না। ছাড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। কারণ অধঃক্ষিপ্ত হবার পূর্বেই সালফার ও নাইট্রোজেন বেশ কিছু দূরত্ব অতিক্রম করে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন উত্তর আমেরিকার ৮০ শতাংশ সালফার দূষণ সৃষ্টি হয় মিসিসিপি নদীর পূর্বাংশের ওহিও, সাডবেরী, ওনটারিও প্রভৃতি নদীর উপত্যকা থেকে। আর তা ছাড়িয়ে পড়ে আমেরিকার শিল্পাঞ্চল ছাড়িয়ে ইউরোপের এমন সব দেশে যেখানে আদৌ কোন শিল্প-ই নেই। অতএব অম্লবৃষ্টি নামক দানবের হাত সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত। মানে না কোন আইন, কোন বন্ধন।

অম্লবৃষ্টির প্রভাব

অম্লবৃষ্টির ফলে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ভীষণভাবে বিঘ্নিত হয়। জল ও স্থলে এর প্রভাব সমান সক্রিয়। অম্লবৃষ্টি খাদ্য শৃঙ্খলের (Food chain) বিভিন্ন প্রজাতিকে ধ্বংস করে, খাদ্যশৃঙ্খলকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে।

অরণ্য ও অম্লবৃষ্টি

অম্লবৃষ্টির প্রভাবে মৃত্তিকাস্থিত জৈব পদার্থের পচনক্রিয়া ধীর হয়ে যায় কারণ অম্লের প্রাদুর্ভাবে মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের ঘাটতি দেখা দেয়।

ফলে পচনক্রিয়া দ্রুত না হওয়ায় পরিবেশ দূষিত হয়, যা রোগ বিস্তারেরও সহায়ক। এছাড়া গাছের যে সমস্ত খাবার মাটিতে থাকে, যেমন—ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি অম্লবৃষ্টি এই সমস্ত পদার্থকে মাটি থেকে টেনে নিয়ে চলে যায়, যার ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়। অরণ্য হয়ে ওঠে ফল-ফুল-পাতা শূন্য পিতৃহারা সন্তানের মতো। এভাবেই ধীরে ধীরে মরুভূমি তার ডানা বিস্তার করে প্রকৃতির সবুজ আঁচলের উপর।

এই অম্লবৃষ্টির প্রভাবেই Spruce, Aspen, Birch, Pine প্রভৃতি অরণ্যের প্রাচীন সদস্যগুলি ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। এভাবেই অম্লের প্রভাবে সুইজারল্যান্ডের

সবুজ-শ্যামল-শীতল মধ্য আলপাইন অঞ্চলের চল্লিশ শতাংশ দেবদারু জাতীয় উদ্ভিদ মরে গেছে। আর যারা মরেনি, তারা মরণের দিন গুনছে। গরমের দেশে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ জন্মায় কিন্তু শীতপ্রধান দেশে এ-সুবিধা নেই। সেখানে গাছের বৈচিত্র্য কম। ফলে এসব অঞ্চল অম্লবৃষ্টির দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

শুধু কি তাই, অরণ্য যাদের ঘর-বাড়ি, গাছগাছালির ধ্বংসের সাথে সাথে সেইসব পশুপাখিরাও হয়ে পড়ছে দিশাহারা আশ্রয়হীন। এভাবেই শুধুমাত্র অরণ্যের বিঘ্নিত বিন্যাসের জন্য পশুপাখির প্রজাতির সংখ্যাও কমে যাচ্ছে। এ-অবস্থা চলতে থাকলে এমন দিন আসবে যখন আমরা কোকিলের ডাক শোনার জন্য টেপ রেকর্ডারের শরণাপন্ন হব, ময়ূর দেখার জন্য মিউজিয়ামে ছুটে যাবো। ব্যাপারটা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। তাই নয় কি ! গাছগাছালির মত জলের বাসিন্দারাও বিশেষ করে মৎস্যকুল অম্লবৃষ্টির দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মাছের অনেক প্রজাতি পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়েও গেছে। অনেকে আবার 'কোমা'য় আচ্ছন্ন, অন্তিম যাত্রার প্রহর গুনছে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে জলাশয়ের জলের P^H ৫-এর কম হলেই অধিকাংশ প্রজাতির মাছ মারা যায়।

এছাড়া অম্লবৃষ্টি মাটির অ্যালুমিনিয়াম নামক ধাতুকে মুক্ত ও সচল করে। এই মুক্ত অ্যালুমিনিয়াম বৃষ্টির জলের সাথে জলাশয়ে প্রবেশ করে। অম্লের সাথে জলাশয়ের অ্যালুমিনিয়াম যুক্ত হয়ে যা গঠন করে তা মাছেদের কাছে মারাত্মক বিষ। অর্থাৎ অম্লবৃষ্টি পরোক্ষভাবে মাছেরও দারুণ ক্ষতিসাধন করে।

উত্তর আমেরিকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ মিষ্টি জলের লেকগুলোতে অম্ল ও ক্ষারকে প্রশমিত (neturalize) করার ক্ষমতা বা Buffering capacity নেই। শুধু এই অঞ্চল-ই নয়, পৃথিবীর যে সমস্ত অঞ্চল প্রস্তরময় স্তরের উপর (Silceous fayer-Granite, Quartzite, Quartz sandstone) দাঁড়িয়ে তাদের-ই Buffering capacity কম বা শূন্য। যার জন্য Scandanavi-র Precambrian-শিল্ড, কানাডিয়ান শিল্ড প্রভৃতি অঞ্চলে অম্লবৃষ্টির প্রকোপ বেশী। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অম্লবৃষ্টির জন্য নরওয়ের ১৩,০০০ বর্গ কিমি অঞ্চলের লেকগুলোতে কোন মাছ নেই। সব মরে হেজে গেছে।

১৯৭০-এ Nova Scotia-র নয়টি নদীর জলের P^H ছিল ৫-এর কম। ফলে নদীগুলো হয়ে গেল বন্ধ্যা। অথচ পূর্বে এই নদীগুলিই ছিল স্যালমনে পরিপূর্ণ। ১৯৭৫-৮২ পর্যন্ত Ariorondacks-এর ২১৪টি লেক ছিল মৎস্য শূন্য। এই লেকগুলোর ৫১ শতাংশে-ই P^H ছিল ৫-এর কম।

অন্যদিকে মানুষ পৃথিবীর উন্নততম প্রতিনিধি হলেও অম্লবৃষ্টির হাত থেকে আমাদেরও রেহাই নেই। আম্লিক জল যখন পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয় এমন জলের পাইপ থেকে কপার চুঁইয়ে জলের সঙ্গে মিশে যায়। কপার মিশ্রিত পানীয় জল পান করে সুইডেনের পশ্চিমাঞ্চলের শিশুরা প্রলম্বিত ডায়েরিয়ার শিকার। অম্লজল মিশ্রিত পানীয় জলের অতিরিক্ত অ্যালুমিনিয়াম ও অন্যান্য ধাতুসমূহ মানসিক ভারসাম্যে ব্যাঘাত ঘটায় বলে মনে করা হয়। এছাড়া বাতাসে ঘনীভূত অ্যাসিড সালফেট আমাদের শ্বাসকষ্ট ও হার্টের সমস্যার জন্য অনেকাংশে দায়ী। অম্লবৃষ্টির খড়্গ মারাত্মকভাবে নেমে আসে শিশুদের উপর। যারা ফুলের মতোই নিষ্পাপ-সুন্দর ও পৃথিবীর ভবিষ্যত। অম্লবৃষ্টি শিশুদের চোখের চামড়াকে নষ্ট করে দেয় এবং ফুসফুসকে করে তোলে ক্ষয়প্রাপ্ত। শিশুদের উপর এই নির্যাতনের অর্থ পৃথিবীর ভবিষ্যতের কোমরে আঘাত করা।

অম্লবৃষ্টি রেহাই দেয় না পাথর-ইট-সিমেন্ট-কাঠকেও। আগ্রার আশপাশ অঞ্চলের অ্যাসিড তৈরীর, ফিরোজাবাদের কাঁচ তৈরীর কারখানা, মথুরার তৈল শোধনাগার, লোহার কারখানার বিভিন্ন পদার্থ কীভাবে তাজমহলকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা নিত্য খবরের কাগজ খুললেই চোখে পড়ে। সুতরাং এখনি যদি না যথেষ্ট প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয় তাহলে অম্লবৃষ্টি একাই ধ্বংস করে দেবে পৃথিবীর অন্যতম সম্পদ এই স্মৃতিসৌধটিকে। এভাবেই অম্লবৃষ্টির অত্যাচারে ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রোমের কলোসিয়াম, এথেন্সের বিখ্যাত মনুমেন্ট, অ্যাক্রোপোলিসের সুদৃশ্য বারান্দা, লিঙ্কন মেমোরিয়াল, ওয়াশিংটন মনুমেন্ট প্রভৃতি। অ্যাসিড বৃষ্টির জল ক্ষয় করে দিচ্ছে পোল্যান্ডের ক্রাকাউ অঞ্চলের স্থাপত্য শিল্পসমৃদ্ধ অট্টালিকাগুলিকে। অর্থাৎ অপেক্ষা করতে করতে আমাদের পিঠ এখন দেওয়ালে। এখনি জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে পৃথিবী হারাবে তার যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সাক্ষী-নিদর্শনকে। তাজমহল দেখতে বাধ্য হব আমরা ক্যালেন্ডারের বুকে, নয়ত ইতিহাসের পাতায় অথবা শুধুই লেখনীতে।

অম্লবৃষ্টির ক্ষত সারানোর চেয়ে যাতে এই মারণ বৃষ্টি না

হয় সেদিকে লক্ষ্য দেওয়াই উচিত। এবং অবশ্যই তা কম ব্যয়সাপেক্ষ। কারণ The National Academy of Science-এর হিসাবে অনুযায়ী ১৯৭৮ সালে আমেরিকার অম্লবৃষ্টির দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসপত্র, বনাঞ্চল, কৃষিক্ষেত্র, চিকিৎসা, জল সরবরাহের নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার।

আবার আমেরিকার Council of Environmental Qualify এক হিসাবে দেখিয়েছেন যে ১৯৭০ সালে অম্লবৃষ্টির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপত্য নির্মাণগুলিকে সংস্কারের জন্য প্রায় ২ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়েছে।

এসবই আমাদের কল্পনাতীত ব্যাপার।

অন্যদিকে ১৯৮৪ সালে সুইডেনে ঘটানো হয়েছিল এক মহাকান্ড। আমরা জানি যে অ্যাসিডের সাথে চুন দিলে একে অপরকে খেয়ে নেয়। ফলে জলে অ্যাসিডের ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় বা কমে যায়। ওই বছর ২৫০ লক্ষ ডলার খরচ করে সুইডেন সরকার সে দেশের লেকের জলে চুন মিশিয়েছিল নতুন করে মাছ চাষের জন্য। কিন্তু আমাদের মতো গরীব দেশগুলোর পক্ষে কি এভাবে মশা মারতে কামান দাগা সম্ভব? সহজ সরল উত্তর 'না'। যে কোন দূষণ রোধ করার জন্য আমাদের দেশে লিখিত আইন আছে, তবে নেই তার সারা দেশে ব্যবহারিক প্রয়োগ। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শিল্পাঞ্চলের বেশ কয়েকটি ঢালাই কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ধোঁয়া নিষ্কাশন ব্যবস্থা যথাযথ না থাকার জন্য। কলকাতা পুরসভা বাড়িতে জঞ্জাল ফেলে রাখার জন্য গৃহস্বামীকে আর্থিক জরিমানা করছেন। নিঃসন্দেহে এ-সবই সাধু প্রচেষ্টা। কিন্তু সারা দেশে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। তবেই মুক্তি নচেৎ না। আগেই বলেছি অম্লবৃষ্টি বিহার-পশ্চিমবঙ্গ-রাজস্থান বোঝে না। সে বোঝে আকাশ। ওখানে কোন প্রাচীর নেই কিন্তু তাই সমস্ত রাজ্যের পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদকে একসঙ্গে সক্রিয় হতে হবে। সুপ্রিম কোর্টও জারি করেছে দূষণ রোধের জন্য কিছু আইন-কানুন। আয়োজনে ত্রুটি নেই, ঘাটতি যত ব্যবহারিক প্রয়োগে। সেইজন্য নিজেদের বাঁচার স্বার্থে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবসে' (৫ই জুন) শুধুমাত্র স্কুল- কলেজের ছেলেদের বুকে ব্যাজ ঝুলিয়ে রাস্তায় নামালেই চলবে না। আগে বেআইনি কারখানাগুলোকে বন্ধ করতে হবে। নাহলে মূলোচ্ছেদ করে ডগায় জল ঢেলে কী লাভ!

অম্লবৃষ্টি ধ্বংস করছে অরণ্যসম্পদ, শুকিয়ে মরছে তরতাজা সবুজ গাছ। গাছ কমলে বৃষ্টি কমে। ফলে পরিবেশের তাপমাত্র বাড়ে! আগমন ঘটে নতুন বন্ধু 'খরা'র। অতএব অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত অম্লবৃষ্টির বিরুদ্ধে জোট বাঁধার।

পরিশেষে 'আজকাল'-এর একটা ছোট্ট খবর তুলে ধরে এই আলোচনার ইতি টানছি — "দূষণময় গঙ্গা। গঙ্গাতীরের ১১০ শহর প্রতিদিন নদীতে বর্জ্য ফেলছে ১৫০ কোটি লিটার ....।"

বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পেনসন সেল আগামী ২৫শে মার্চ, ২০০৬ থেকে ২০শে এপ্রিল, ২০০৬ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সমিতির সদস্য এবং সদস্যাদের অবগতির জন্য পেনসন সেল সংক্রান্ত সংবাদটি জানান হলো।

অশোক গাঙ্গুলী
অফিস সম্পাদক,
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

কেন্দ্রীয় শিক্ষা বাজেট ঃ কিছু কথা

কান্তি বিশ্বাস

বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী ২০মাস পূর্বে এই সরকারের প্রথম ব্যয়-বরাদ্দের দাবি সংসদে পেশ করেছিলেন। গত ২৮শে ফেব্রুয়ারি তিনি ২০০৬-০৭ আর্থিক বৎসরের ব্যয়-বরাদ্দের বক্তৃতা শেষ করেছেন স্বামী বিবেকানন্দের যে বিখ্যাত উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে, তা হলো ঃ

"আমরা যা বপন করি, সেই শস্য ঘরে তুলি। আমরাই আমাদের ভবিষ্যতকে সৃষ্টি করি। বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে, যে তরণী পাল তুলতে পারবে, সে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে, সে এগিয়ে যাবে, যারা পাল তুলতে পারবে না, প্রবহমান বায়ুর এই সুযোগও তারা গ্রহণ করতে পারবে না। এটা কি বায়ুর দোষ? আমাদের ভবিষ্যত আমরাই গড়ি"।

বিদ্বান অর্থমন্ত্রী মহোদয় হয়তো স্বামীজীর আরও একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ উক্তি স্মরণ করতে পারবেন — "Education is the manifestation of perfection already in man।" (মানুষের মধ্যে যে উৎকর্ষতা নিহিত রয়েছে, একমাত্র শিক্ষাই তাকে প্রকাশ করতে পারে)

আজ সারা দুনিয়ায় বিশ্বায়নের প্রচণ্ড বায়ু প্রবহমান। বিজ্ঞান-প্রকৌশলের দ্রুত অগ্রগমন তাবৎ বিশ্বের জীবনযাত্রাকে অধিকতর মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রযুক্তিবিদ্যার অমোঘ প্রভাবে বিশ্ব আজ গ্রামে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের একটি ঘটনা তরঙ্গায়িত হয়ে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ার পরিমণ্ডল তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে শিক্ষার অপরিসীম গুরুত্ব প্রতিনিয়ত অধিকতর মাত্রায় অনুভূত হচ্ছে। বিশ্ববাসীর ১৭ শতাংশের বাস যে ভারতে, তাকে সারা বিশ্বের নিরক্ষরদের ৩৩ শতাংশের গ্লানি বহন করতে হচ্ছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত বয়সের যত কিশোর-কিশোরী সারা দুনিয়ায় আছে, তার ২০ শতাংশ আছে ভারতে। আর বিশ্বে ঐ বয়সের কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যারা বিদ্যালয়ে যায়, তার মধ্যে ১৫ শতাংশ মাত্র আছে ভারতে। বিশ্বে গড়ে উচ্চতর শিক্ষায় সংশ্লিষ্ট বয়সের ২৬ শতাংশ বিদ্যায়তনের সাথে যুক্ত। ভারতে এই হার ৭ শতাংশের নিচে। বিশ্বে গড়ে ১০ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে ব্রতী গবেষকদের সংখ্যা ১,১৪৬, আমাদের দেশে ঐ সংখ্যা অবিশ্বাস্য হলেও মাত্র ১২০। বিশ্বায়নের দরিয়ায় ভারতীয় শিক্ষার এই শোচনীয় পালে কতটুকু হাওয়া লাগানো যাবে, মন্ত্রী মহোদয় ভেবেছেন কি?

মানবসম্পদ বিকাশের এই আত্মঘাতী উপেক্ষা একদা ঐতিহ্যশালী ভারতকে বহু পিছনে ঠেলে দিয়েছে। তার থেকে মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি সংযুক্ত প্রগতিশীল জোট সরকারের ন্যূনতম কর্মসূচির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। থোক জাতীয় উৎপাদন (জি ডি পি)-র ৬ শতাংশ শিক্ষাখাতে বরাদ্দের কথা ঐ কর্মসূচিতে বলা হয়েছিল। ১৯৬৪-৬৬ সালের কোঠারি কমিশন থেকে শুরু করে ঐ সঙ্গত সুপারিশ বহুবার বহু কমিশন/কমিটির প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে। বিশ্বের দেশগুলিতে সরকার থোক জাতীয় উৎপাদনের ৪.৪ শতাংশ শিক্ষার জন্য ব্যয় করে। অর্থমন্ত্রী মহোদয় উত্থাপিত শিক্ষাখাতের ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব দেখে ধারণা করা স্বাভাবিক রাজ্য সরকারগুলির শিক্ষাখাতে বরাদ্দের সম্মিলিত অর্থের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ বরাদ্দ যুক্ত করে শিক্ষাখাতে থোক জাতীয় উৎপাদনের ৪.৩ শতাংশ স্পর্শ করতে পারবে না।

শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় ব্যয়-বরাদ্দে ২০০৬-০৭ আর্থিক বৎসরের জন্য ২৪,১১৪ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। বিদায়ী বৎসরের ঐ বরাদ্দ থেকে ৫,৭৭৭ কোটি টাকা বেশি। কিন্তু ঐ প্রস্তাবিত বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকারের মোট প্রস্তাবিত ব্যয়ের (মোট ব্যয়ের প্রস্তাব ৫,৬৩,৯৯১ কোটি টাকা) ৪.৩ শতাংশ মাত্র। বিদায়ী বৎসরে এই বরাদ্দ ছিল ৩.৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের অন্তত ১০ শতাংশ ব্যয় করতে হবে, দীর্ঘদিনের এই সুপারিশ বহুদূরেই রয়ে গেল। শিক্ষাহিতৈষী মানুষ যে

প্রত্যাশা এই সরকারের কাছে করেছিল, আপাতত ব্যর্থতার বেদনায় তার সমাপ্তি হলো।

কেন্দ্রীয় ব্যয়-বরাদ্দ (কোটি টাকায়)

	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭
মোট ব্যয়	৫,১৪,৩৪৩	৫,৬৩,৯৯১
শিক্ষাখাতে বরাদ্দ	১৮,৩৩৭	২৪,১১৪
(ক) প্রারম্ভিক শিক্ষা	১১,২১৯	১৫,৩৭০
এর মধ্যে সর্বশিক্ষা অভিযান	৭,১৫৬	১০,০৪১
এর মধ্যে মধ্যাহ্নকালীন আহার	৩,০১০	৪,৮১৩
(খ) মাধ্যমিক শিক্ষা	১,৫৯১	১,৮৩৭
(গ) উচ্চশিক্ষা	২,১০৮	২,৭৭৮
(ঘ) বয়স্ক শিক্ষা	২৬৩	২১৪
(ঙ) কারিগরি শিক্ষা	১,৬০০	১,৭১৮
(চ) ভাষা-উন্নয়ন	১৫২	১৯৪

দশ বৎসর পূর্বে সারা বিশ্বের ধ্বনি ছিল প্রারম্ভিক শিক্ষা (৬ থেকে ১৪ বৎসর বয়সের শিশুদের জন্য) সর্বজনীন করা অত্যন্ত জরুরী। অবস্থার গুণগত পরিবর্তন হয়েছে। আজ আন্তর্জাতিক দাবি মাধ্যমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্ষদের সভা থেকে তাই সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল, সর্বজনীন মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ২০০৬-০৭ আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রীয় ব্যয়-বরাদ্দে ঐ বাবদ ১,৫১৩ কোটি টাকা রাখতে হবে। বর্তমান প্রস্তাবে একে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দের মধ্যে নবোদয় বিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের জন্য ধরা হয়েছে ১,৬৮৭ কোটি টাকা। ফলে ঐ উদ্দেশ্যে রাজ্যকে সাহায্য করার জন্য কোনো বরাদ্দই রাখা হয়নি।

জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ যেখানে নিরক্ষর সেখানে কেন্দ্রীয় বরাদ্দে বিদায়ী বৎসরে বয়স্ক শিক্ষার জন্য যে সামান্য বরাদ্দ ছিল, তার থেকে ৪৯ কোটি টাকা কেটে নেওয়া হলো। এর ফলে নিরক্ষর বয়স্কদের সাক্ষর করার প্রয়াস ব্যাহত হবে।

কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ধশত বৎসর উপলক্ষে একটি উল্লেখযোগ্য অর্থবরাদ্দের প্রস্তাব নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু জ্ঞান-নির্ভর সমাজে, নিত্যনতুন আবির্ভূত বিষয়ে অধ্যয়নের অবকাশ তৈরি করতে, গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে, উচ্চশিক্ষার অঙ্গনকে প্রসারিত করতে অনিবার্যভাবে যে আর্থিক সংস্থান রাখার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল, তার প্রতি সীমাহীন অবজ্ঞা দেখানো হয়েছে। পূর্বের সরকারের আমলে নিযুক্ত আম্বানি-বিড়লা কমিটি উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারী দায়িত্ব পর্যায়ক্রমে ছেঁটে ফেলার যে সুপারিশ করেছিল, অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বর্তমান সরকারও তাকে নস্যাৎ করতে ইচ্ছুক নয়।

এই সরকারের অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে উল্লেখ করা হয়েছিল শিক্ষাখাতে যথার্থ পরিমাণে অর্থের যোগান দেওয়ার জন্য এবং তার তদারকির উদ্দেশ্যে শিক্ষার জন্য জাতীয় আয়োগ (National Commission on Education) নিয়োগ করা হবে। সেই প্রতিশ্রুতির প্রতি আজ পর্যন্ত কোনো মর্যাদা প্রদর্শন করা হলো না, এই ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাবেও তার কোনো উল্লেখ নেই।

অর্থমন্ত্রী মহোদয় তাঁর বক্তৃতায় শিক্ষাগুরু রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শিক্ষার ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য গুরুদেবের আকুতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। মন্ত্রী মহোদয় গান্ধীজীকে তাঁর বক্তৃতায় স্মরণ করেছেন। ১৯৪২ সালে জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে গান্ধীজী স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সাথে শিক্ষার আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, স্বাধীনতার এতদিন পরেও তার প্রতি যথাযোগ্য মর্যাদা দেখানো হয়নি। মন্ত্রী মহোদয়ের এই ব্যয়-বরাদ্দের বক্তৃতার মধ্যেও তার উপযুক্ত প্রতিফলন নেই। বাক্যে তাঁর কথা উল্লেখ করলেও কর্মে তার অনুরণন না থাকা আত্মপ্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নয়। দেশের আপামর জনগণকে দেশের স্বার্থে এ-বিষয়ে সচেতন হতে হবে।

সৌজন্যে : গণশক্তি, ১৩ই মার্চ, ২০০৬

ধারাবাহিক

সর্বভারতীয় শিক্ষা কনভেনশন ও শিক্ষা আন্দোলনের অভিমুখ

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সাঁত্রাগাছি কেদারনাথ ইনস্টিটিউশন, হাওড়া

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

উচ্চশিক্ষা

সর্বভারতীয় শিক্ষা কনভেনশনে উচ্চশিক্ষা নিয়ে আলোচনার জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। ঐ কমিশনের বক্তারা যে বিষয়গুলির ওপর তাঁদের বক্তব্য কেন্দ্রীভূত রাখেন সেগুলি হল ঃ শিক্ষার বে-সরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের সমস্যা, শিক্ষার ওপর GATS (General Agreement on Trade in Service) চুক্তির প্রভাব, Self-financing কলেজগুলির সমস্যা, autonomy and accreditation-এর বিষয়, প্রাইভেট কলেজে আসন সংরক্ষণের বিষয়, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রশাসনিক কাঠামোর বিষয় নারীদের উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের প্রশ্ন প্রভৃতি। সকল বক্তাই এ বিষয়ে একমত হয়েছেন যে উচ্চশিক্ষা গভীর সংকটে নিমজ্জিত।

ঐ কনভেনশনে এটা অনুভূত হয়েছে যে Self- financing institution-গুলি সম্পর্কে উপযুক্ত বিধি নিয়মের অভাব উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সংকট ডেকে আনছে। উচ্চশিক্ষার স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানগুলি এবং সাহায্যপ্রাপ্ত পাঠ্যবিষয়গুলিতে (Aided Course) এরফলে শংকা ও সংশয়পীড়িত অবস্থার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এগুলির অস্তিত্বই বিপন্ন। গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, Self financing Course-গুলি বাজারী-অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কর্মসংস্থানের পক্ষে একান্ত সহায়ক। কিন্তু সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির পাঠ্যবিষয় (Course) কর্মপ্রাপ্তির পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়। এই গুজব ছাত্র-ছাত্রীদের চিত্ত-বিভ্রান্তি ঘটাচ্ছে এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে। কনভেনশনে অংশগ্রহণকারীরা এ বিষয়ে একমত হন যে, Self-financing institution-গুলিতে যে বিষয়গুলি শেখানো হবে, এখানে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদেয় বেতনকাঠামো কী হবে এবং কোন্ প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি (affiliation) দেওয়া যেতে পারে — এই বিষয়গুলি নিয়ে বিধি, নিয়ম, আইন (Regulation) প্রণয়ন একান্তভাবেই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হল ঃ সারাদেশে এই বিষয়গুলি নিয়ে অভিন্ন বিধি, নিয়ম, আইন (national uniformity) প্রণয়ন করতে হবে। শুধু তাই নয়, Self-financing institution-গুলির পরিকাঠামো (infra-structure) সম্পর্কেও অভিন্ন বিধি, নিয়ম, আইন করতে হবে। কোনো প্রতিষ্ঠানকে উচ্চমানের বলে গণ্য করার বিষয়টিকে যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Accreditation, আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে যুক্ত করা চলবে না এবং এই কাজটি কোনো Private Agencyকে দিয়ে করানো কখনোই উচিত নয়। এর ফলে Public institution-গুলি যথেষ্ট চাপের মধ্যে রয়েছে। কারণ এই accreditation-এর ফলে Self-financing Course-গুলি, যা বাজারী অর্থনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতেও এসে পড়ছে আর উচ্চ ছাত্র বেতনপ্রদানে সক্ষম পরিবারের ছেলেমেয়েরাই এই পাঠ্য বিষয় (Course) পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি করছে। এই নিয়োগ শিক্ষকদের অধিকারের ওপর আঘাত হানছে। এভাবে চললে খুব শীঘ্রই শিক্ষক সমাজে নিয়মিত নিয়োজিত শিক্ষকরা (Regular teacher) সংখ্যালঘু হয়ে যাবেন আর তারফলে শিক্ষকদের দরকষাকষি করবার ক্ষমতা ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং দেশে শিক্ষক আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে।

কমিশন আলোচনাকালে এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও যদি চুক্তির ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হয় তা হলে বিদ্যালয় শিক্ষকদেরও দরকষাকষির ক্ষমতা আর থাকবে না, বিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলনও

দুর্বল হবে। (ভবিষ্যতে এমনটা যে ঘটবে না তা নিশ্চিত করে বলা যাবে না) কেন্দ্রের 'ঊপা' সরকার যে নয়া উদারনীতির পথে চলছে তার মূল কথা হল, সর্বপ্রকার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করা। ঠিক এই কারণেই নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ বা পার্শ্ব শিক্ষক নিয়োগ সমর্থন করে না। সমিতি দাবি করে যে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হলে চাই পূর্ণ সময়ের জন্য সরকার নির্ধারিত বেতনে শিক্ষক (full time basis) নিয়োগ। সকলের জন্য শিক্ষার দাবি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার (formal education) মাধ্যমেই সফল করা সম্ভব। এ কথা সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

কমিশন আর একটি বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সেটি হল ঃ উচ্চশিক্ষার সুযোগ লাভের ক্ষেত্রে রাজ্যে রাজ্যে এবং গ্রাম ও শহরে বৈষম্যের প্রকোপ। এরফলে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বত্র সমান সুযোগ প্রাপ্তির অভাবে নিজের বসবাসের পশ্চাদপদ এলাকা ত্যাগ করে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এলাকায়, যেখানে উচ্চশিক্ষার জন্য সুযোগ-সুবিধা পর্যাপ্ত, মানুষ চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। উত্তরপূর্ব ভারতে ও বিহারে উচ্চশিক্ষার সুযোগ-সুবিধার অভাব থাকায় এই নিজের এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

জি ডি পি'র ৬ শতাংশ ও কেন্দ্রীয় বাজেটের ১০ শতাংশ শিক্ষায় ব্যয় করার জন্য এই কমিশনেও আলোচনাকালে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রায়ই বলা হয়, বিদ্যালয় শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে বলে উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করা যাচ্ছে না। শুধু অর্থের অভাবেই উচ্চশিক্ষায় সংকট সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ নয়। প্রত্যেক রাজ্যেই উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষকদের বিশালসংখ্যক শূন্যপদ রয়েছে যেগুলি পূরণ করা হচ্ছে না। মহারাষ্ট্রে এমন শূন্যপদের সংখ্যা ৩৫০০ ; বহুরাজ্যে এই সংখ্যা ৫ থেকে ১০ হাজার। ১৯৮৯ সাল থেকে উড়িষ্যায় নিয়মিত শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ হয়ে রয়েছে ; মহারাষ্ট্রেও শিক্ষক নিয়োগ ১৯৯০ সাল থেকে বন্ধ হয়ে রয়েছে। এরফলে উচ্চশিক্ষার ভার নিয়েছে কোচিং সেন্টারগুলি। এই বিদ্যা বিক্রয়ের দোকানগুলি মহাসুখে অর্থ রোজগার করছে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে 'চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ' একটি অতি স্বাভাবিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। কেন্দ্রের 'উপা' সরকার এব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। আর শিক্ষার গুণগত মান ধুলায় লুণ্ঠিত হচ্ছে।

এই কমিশন বি জে পি শাসনকালে পাঠক্রমের অবনতি বিষয়ে যথেষ্ট উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। বিশেষ করে ঐ সময় পাঠক্রমের মধ্যে যে জ্যোতিষ শাস্ত্র ও কর্মকাণ্ড ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে তা আজও প্রত্যাহার করা হয়নি। এগুলি উচ্চশিক্ষায় পড়ানো চলছে অব্যাহত গতিতে। ইতিহাস ও পুরাকীর্তির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রকল্পগুলিকে, সমাজবিজ্ঞানের বিষয়গুলিকে অধিকতর হাল্কা করে বাজার অর্থনীতির সহায়ক পাঠক্রমের (market friendly) সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলা যায়, "শিক্ষার হদ্দমুদ্দ"। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গণতন্ত্রীকরণ ও স্বায়ত্তশাসন-এর বিষয়টি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। Academic Council ও Board of Studies-এর ভূমিকাকে তুচ্ছ করে দেখা হচ্ছে। এগুলির প্রাধান্য ক্রমশ বিলীয়মান।

উচ্চশিক্ষা নিয়ে আলোচনাকালে দেশে একটি 'জাতীয় শিক্ষা কমিশন' গঠনের দাবি করা হয়। দেশে শিক্ষার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে জাতীয় শিক্ষা কমিশনকে একটি Status Report প্রস্তুত করতে বলা হয়। শিক্ষায় বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ ও শিক্ষার বে-সরকারীকরণ-এর বিরুদ্ধে সতর্কতা গ্রহণের দাবি জানানো হয়। অন্যান্য পিছিয়ে থাকা শ্রেণির জন্য এবং অন্যান্য সুযোগ বঞ্চিত শ্রেণির জন্য (OBC) শিক্ষায় সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে এই কনভেনশনে সমর্থন করা হয়।

শিক্ষা চলে যাচ্ছে বড় ব্যবসায়ীদের হাতে

'শিক্ষা' এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এক উল্লেখযোগ্য পণ্য হিসাবে স্বীকৃত। শিক্ষা কেনাবেচা চলছে অবাধে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা এখন ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা (WTO), বিশ্বব্যাঙ্ক (World Bank) এবং অসংখ্য বহুজাতিক করপোরেশন-এর ক্রমবর্ধমান প্রভাব শিক্ষাকে এখন মুনাফা অর্জনকারী আকর্ষণীয় পণ্যে পরিণত করেছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সমুদ্রপাড়ি না দিয়েও অসংখ্য ব্যক্তি (যাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান) বিদেশী শিক্ষা লাভ করছেন ঘরে বসেই। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৫-এর মধ্যে সারাবিশ্বে ঘরে বসে বিদেশী শিক্ষা অর্জনকারী সংখ্যা ০.৯৩ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১.৫ মিলিয়ন হয়েছে। এই বৃদ্ধি ৬০ শতাংশেরও বেশি। এই ধরনের শিক্ষার্থীরা নিজের উদ্যোগে দূরবর্তী শিক্ষাধারায় (Distance Education Courses) বিদ্যা অর্জনের জন্য নাম নথীভুক্ত করছেন। স্থানীয় সরকারী অথবা বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আংশিক সময়ের জন্য অথবা পূর্ণসময়ের জন্য এঁরা পাঠ গ্রহণ করছেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হয় এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে অথবা

এক বা একাধিক বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ-এর সঙ্গে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে দূরবর্তী শিক্ষাধারা নিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা করছে। এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার দ্বারা 'উচ্চমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান' হিসাবে স্বীকৃতিও লাভ করছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে দূরবর্তী শিক্ষা অর্জনের বিষয়টি যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে।

বহুজাতিকরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির (Information and Communication Technology–ICT) সাহায্যে দূরবর্তী শিক্ষা (Distance Education) বিক্রয় ব্যবসায় প্রবেশ করে প্রভূত মুনাফা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে আর ঘরে বসেই শিক্ষার্থীরা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী লাভ করছে। Cable, Satellite transmissions, Audio and Video conferencing, Computer Software CD-ROMS এবং Internet দূরবর্তী শিক্ষালাভের অভাবনীয় সুযোগ সৃষ্টি করেছে যাকে কাজে লাগিয়ে বহুজাতিকরা শিক্ষাব্যবসার বাজারে তেজীভাব (Boom) সৃষ্টি করেছে। মুষ্টিমেয় স্বচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা এই শিক্ষা কিনতে ব্যস্ত। সকলের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের সুযোগ দ্রুত সংকুচিত হয়ে আসছে। অথচ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রসার ঘটিয়েই সকলের জন্য সমমানের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

আজ অস্ট্রেলিয়ার ২২টি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের ছাত্রদের কাছে দূরবর্তী শিক্ষালাভের সুযোগ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি e-mail এবং internet-এর ব্যাপক ব্যবহার করছে এই দূরবর্তী শিক্ষা বিশ্বের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য।

১৯৯৮ সালে WTO তার রিপোর্টে দেখিয়েছে, কেমন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং পুঁজির মালিকদের (Private firm) মধ্যে অংশীদারী ব্যবসার মাধ্যমে উদার শিক্ষার (liberalized education) বাজারটি চলছে।

শিক্ষা নিয়ে অংশীদার ব্যবসার অতিপরিচিত উদাহরণ হল : 17 governors of Western US states and private entities such as IBM, AT & T, CISCO, Microsoft and International Thompson ; এরা বিশ্বের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে internet-এর মাধ্যমে দ্রুত পৌঁছে দিচ্ছে শিক্ষা।

আর একটি উদাহরণ হল Universitas-21 initiative এটি একটি কোম্পানি হিসাবে স্থাপিত হয়েছে এবং এটি United Kingdom-এর সঙ্গে আইনসম্মতভাবে একীভূত (incorporated)। ১০টি দেশের ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এর জাল বিস্তৃত। প্রতি বছর ৫ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী Universitas-21-এ নাম নথীভূক্ত করে। প্রায় ৪৪ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাবিদকে এরা নিয়োগ করেছে। এদের সম্মিলিত বাজেটের পরিমাণ ৯ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। শিক্ষিত স্নাতকদের জন্য একাধিক আন্তর্জাতিক পাঠক্রম তৈরি করে তার সাহায্যে বিশ্বব্যাপী একটি পেশাগত দক্ষতাসম্পন্ন কর্মীবাহিনী গড়ে তোলাই Universitas-21-এর লক্ষ্য।

আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই শিক্ষা পরিষেবার অগ্রগামী রপ্তানিকারক। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝাই যাচ্ছে বিশ্বের ধনকুবেররা সারাবিশ্বে শিক্ষাকে একটি শিল্পে রূপান্তরিত করতে বদ্ধপরিকর।

১৯৯৯ সালে উচ্চশিক্ষা নিয়ে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লেনদেন হয়েছে ৩০ বিলিয়ন আমেরিকান ডলারের। এই পরিমাণটা OECD-র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির পরিষেবা নিয়ে বাণিজ্যলব্ধ আয়ের ৩ শতাংশের সমান।

Grand Alliance for Trade in Education (GATE) হিসাব করে দেখিয়েছে খুব শীঘ্রই শিক্ষা পরিষেবা নিয়ে বাণিজ্যের আর্থিক মূল্য দাঁড়াবে ৫০ বিলিয়ন আমেরিকান ডলার। আমেরিকা এখন অগ্রগামী শিক্ষা রপ্তানিকারক। তারপরেই এ ব্যাপারে এগিয়ে রয়েছে ব্রিটেন, জার্মানি ও ফ্রান্স।

১৯৯৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে ১১.৭ বিলিয়ন ডলার মূল্যের শিক্ষা পরিষেবা রপ্তানি করেছে এবং এই ব্যাপারে বিশ্বে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। ১৯৯৬ সালে ৭.৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের শিক্ষা রপ্তানি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৬.৬ বিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত আয় করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষা পরিষেবা রপ্তানি বাণিজ্যতে উৎসাহ দিতে অতি আগ্রহী। তার কারণ, শিক্ষা রপ্তানি বাণিজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪০ লক্ষ মানুষকে চাকুরী দিয়েছে। এশিয়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা পরিষেবা ক্রয় করে চীন, জাপান, কোরিয়া, ভারত, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানিযোগ্য শিক্ষা পরিষেবার ৬৪ শতাংশ কেনে এই দেশগুলি। এছাড়া আরও দুটি বড় খদ্দের হল ইউরোপ ও লাটিন আমেরিকা। ব্রাজিল, চীন, ভারত, কোরিয়া, মালয়েশিয়ায় 'শিক্ষা'র ক্রমবর্ধমান চাহিদা শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্যের সম্প্রসারণের, বলা যায়, সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে।

গ্যাটস চুক্তি ও ভারতে উচ্চশিক্ষা

সারাবিশ্বে বার্ষিক শিক্ষা বাজেট-এর পরিমাণ ১০০০ বিলিয়ন ডলার। এই বিশাল বাজারের অন্তর্ভুক্ত ৫ কোটি শিক্ষক ও কয়েক কোটি ছাত্র-ছাত্রী। বাজারী অর্থনীতির

ভাষায় এই ছাত্র-ছাত্রীরাই হল শিক্ষার বাজারে Potential Customer. গ্যাটস্ চুক্তি, ২০০০-এর মূল লক্ষ্য হল : শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করার জন্য পুঁজির মালিকদের অবাধে নানা দেশে প্রবেশ করার পথ প্রশস্ত করা। নয়া উদার অর্থনীতির সুযোগ গ্রহণ করে করপোরেট সেক্টর শিক্ষা পণ্য বিক্রয় করে অতিমুনাফা (super normal profit) অর্জন করতে চায়। গ্যাটস চুক্তি, ২০০০ তাদের সহায়ক। ভারত সরকারকে বড় ব্যবসায়ীরা উচ্চশিক্ষা নিয়ে ব্যবসা করার জন্য সুযোগ করে দিতে চাপ দিচ্ছে। শিক্ষক-শিক্ষাবিদ্-শিক্ষাবিজ্ঞানীদের অভিমতের কোনো মূল্য নেই। যে বিষয়টা শেখালে বড় ব্যবসায়ীদের মুনাফা হবে সেই বিষয়টাই শেখান হবে।

'শিক্ষা'র প্রসার ও উন্নয়নের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে কাজে লাগাবার যে ব্যবস্থা চলেছে এ পর্যন্ত তা আজ বিপর্যস্ত। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার স্থান দখল করে নিচ্ছে শিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য করার অতি উৎসাহ। অথচ Indian Institute of Technology-র মতো Public Sector Institution শিক্ষা নিয়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে কাজে লাগিয়েই বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, গত বিশবছরে উচ্চ-শিক্ষায় সরকারী বিনিয়োগ ক্রমাগত কমানো হয়েছে। পরিকল্পিত ব্যয়ের অতি ক্ষুদ্র অংশ উচ্চশিক্ষার জন্য ধার্য করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয় কমতে কমতে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১.২৪ শতাংশ থেকে ০.৩৫ শতাংশে নেমে এসেছে। উচ্চশিক্ষার প্রতি সরকারের এই অবহেলা অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্য করেছে Private education-এর দিকে ছুটতে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রভাবশালী অংশ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রদত্ত উচ্চশিক্ষার গুণগত মানের ওপর ক্রমশ আস্থা হারিয়েছেন। ৭৫ শতাংশ কলেজ এখন প্রাইভেট কলেজ। উচ্চশিক্ষার জন্য ক্রমবর্ধমান খরচের সিংহভাগ বহন করছেন পিতামাতা ও অভিভাবক সমাজ। রাষ্ট্র এব্যাপারে হাত ধুয়ে বসে আছে। ফলে অতি উচ্চআয়ের পরিবারের ছেলেমেয়েরাই উচ্চশিক্ষায় প্রবেশের সুযোগ পাচ্ছে। ভারতে উচ্চশিক্ষার জন্য যথেষ্ট চাহিদা থাকায় এবং উচ্চশিক্ষার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ না করায় উচ্চশিক্ষায় সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) গ্রহণ করার পক্ষে অনুকূল জনমত সৃষ্টি হয়েছে। জ্ঞানের বিস্ফোরণের যুগে উচ্চশিক্ষার জন্য চাহিদা বৃদ্ধি কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

কিন্তু প্রশ্ন হল, ভারতবর্ষের মতো দেশে বাণিজ্য, প্রতিযোগিতা আর ব্যক্তিগত মুনাফাকামী বিনিয়োগের দ্বারা বিশ্বজ্ঞান (global knowledge) অর্জন কতটা সম্ভব ?

মনে রাখতে হবে, করপোরেট সেক্টর শিক্ষায় টাকা ঢালতে চাইছে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের নব নব জ্ঞানার্জনে সক্ষম করে তোলার জন্য নয়। তারা আসছে ভারতবর্ষে ক্রমপ্রবাহমান উচ্চশিক্ষার বাজার দখল করতে পারলে প্রচুর মুনাফা লাভের সম্ভাবনা আছে — এই কথাটা উপলব্ধি করে। সঙ্গে সহায়ক শক্তি হিসাবে তারা পেয়েছে গ্যাটস, ২০০০।

এখনও গ্যাটস চুক্তি থেকে শিক্ষাকে বের করে আনার সুযোগ আছে ভারতের। "Finally, as a way out it is important to keep in mind that General Agreement on Trade in Services negotiations allow the Government to follow the positive list approach which means that it has the option of not to open up the sector of education through the World Trade Organisations (WTO)"– Dinesh Abrol, Commercialisation of Higher Education : Implications of the GATS 2000 Negotiations/All India Convention on Education/Approach paper/12-13 January, 2006, New Delhi).

আজ দেশব্যাপী গণআন্দোলন গড়ে তুলে দাবি করতে হবে কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের কাছে যে গ্যাটস চুক্তির ফাঁদ থেকে শিক্ষাকে বের করে আনতে হবে। গ্যাটস চুক্তির মাধ্যমে এদেশে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ আমরা হতে দেব না।

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে এতকাল আন্তর্জাতিক অংশীদার পেয়ে এসেছি। তাতে আমরা সুফলও পেয়েছি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। উচ্চ-শিক্ষায় সমমান ও গুণগত উৎকর্ষ-এর দ্বারা এতকাল বজায় রাখা সম্ভবও হয়েছে। সেই ব্যবস্থাই বজায় থাক। আমরা দাবি করছি, ভারত সরকার বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেবলমাত্র আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া সীমাবদ্ধ রাখুন।

(চলবে)

তথাকথিত মূল্যবোধ শিক্ষা এবং ধর্ম

সোনালী দত্ত
বালী বঙ্গশিশু বালিকা বিদ্যালয়, *হাওড়া*

ওরা সরল, নিষ্পাপ টাট্‌কা ফুলের মত — ওরা আমাদের ছাত্রছাত্রী। ওদের কারও ভাত জোটে না, কেউবা প্রত্যাশার অত্যাচারে ক্লান্ত। ওরা কেউ চঞ্চল, কেউ শান্ত, কেউ দুরন্ত, কেউ বাধ্য। তবু ওরা যেমনই হোক শ্রেণিকক্ষের মলীন অন্ধকারে ওরা ধ্রুবতারার মত জ্বলে ; বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের শান্ত, সবুজ সমুদ্রে ওরা ঢেউ তুলে দেয় ; ছুটির ঘন্টা ওদের উল্লাসে আর উন্মাদনায় দেবালয়ের আরতির মত বাজে। আমরা ওদের পথ দেখাতে পারি শিক্ষকের মত, পাশে দাঁড়াতে পারি বন্ধুর মত — আমরা কিন্তু ওদের কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য প্ররোচিত বা বাধ্য করতে পারি না। অথচ তেমনি একটা বেসুর যেন আমাদের সুরসাধনার শান্ত নীড়ে অশান্তির বাতাবরণের আশঙ্কা নিয়ে আসছে, তার পদধ্বনি এখনও অস্পষ্ট ; তবু স্পষ্টতই কোথাও একটা টুকরো মেঘ শিক্ষা জগতের খোলা আকাশকে আবৃত করার ষড়যন্ত্রে রত।

খোলাখুলিই বলি। বিদ্যালয়কে গেরুয়া বসন পরিয়ে সরস্বতী বন্দনার প্রচেষ্টা তো বহুদিন ধরেই চলছে। এখন শুধু রাজার মুখোশের রঙ, ঢঙ বদলেছে — রাজাতো আর বদলায়নি। কাজেই তথাকথিত ধর্মের আগ্রাসী থাবা থেকে আমাদের জীবন্ত দেবতার দল অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা কিন্তু নিরাপদ দূরত্বে নেই। জ্যোতিষ প্রেমিকদের লাল-নীল পাথুরে যন্ত্রপাতি এখন একটু ভোল পাল্টেছে মাত্র। এবার ওদের নতুন অস্ত্র 'মূল্যবোধ'। প্রচার করা হচ্ছে, শিক্ষার্থীর মূল্যবোধের পাঠ নাকি ধর্ম ছাড়া সাঙ্গ হবে না! ধর্মনিরপেক্ষ দেশের সিংহাসনের পেছনে মাঝে মধ্যেই যে ত্রিশূল উঁকি মারে এ ত আমাদের সকলেরই জানা। এবার কিন্তু সচেতন হতে হবে এই নতুন ষড়যন্ত্রটির বিষয়ে। নইলে অসংখ্য বৈচিত্র্যে সুসজ্জিত এই দেশের ভবিষ্যৎ সত্যি সত্যিই মাটি হয়ে যাবে। ডেলার কমিশন প্রস্তাবিত 'শোষণমুক্ত এবং হিংসাবর্জিত সমাজ গঠন'-এর পথ ছেড়ে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা মূল্যবোধহীন কেরিয়ার-সর্বস্বতার ঘোলা জলে হাবুডুবু খাবে।

আমাদের সকলের শিক্ষক শ্রী অশোক মিত্র একটি বক্তৃতায় খুব সুন্দর করে আমাদের দেশের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রটি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত শিক্ষকদেরই এক সভায়। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যে, আমাদের সংবিধানের লিখিত অভিমত অনুসারে রাষ্ট্রের কোনও ধর্ম থাকবে না। রাষ্ট্রের কোনও ব্যাপারেই ধর্ম কোনও ভূমিকা নেবে না এবং রাষ্ট্র সব ধর্ম থেকেই সমান দূরত্ব বজায় রাখবে। অথচ বেশ কিছু ধর্ম-ব্যবসায়ী রাজনীতিকের ভোট-লোলুপতার কারণে প্রথম থেকেই এই পরিচ্ছন্ন বক্তব্যটিকে বিকৃত করা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হলে সে নাকি সব ধর্মকেই সমানভাবে মানবে। ভারতবর্ষের মত বিরাট এক দেশ, যাকে 'উপমহাদেশ' বলা হয়, সেখানে যদি 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র সংজ্ঞা এই হয়, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষ তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবেন কি? আর যদি ক্ষেত্রটি বিদ্যালয় হয়, সেখানে ধর্মের সরাসরি অনুপ্রবেশ কি ঐ নিষ্পাপ শিশু-কিশোরদের মধ্যেও একটা বিভেদ রেখা টেনে দেবে না? যে মূল্যবোধ এক হতে না শিখিয়ে ভাঙনের অঙ্ক কষতে শেখায়, যে মূল্যবোধ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণ এবং কর্মকাণ্ডের উপর নির্ভর না করে পুঁথিসর্বস্ব হয়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের দুর্বল স্কন্ধে বেঁচে থাকার বরাত দিয়ে বসে, কী লাভ সেই অকারণ বোঝা বহন করে?

'ধর্ম' বিষয়টি চিরকালই বিতর্কিত। বিশ্বের বহু বিজ্ঞজনেই এর প্রয়োজনীয়তাকে একরকম বাতিলই করেছেন। কেউবা এর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েও মানব সমাজকে আরও একটু এগিয়ে যেতে বলেছেন। গ্যেটের মতে — "কেউই ঈশ্বরবিরোধী নন, কেবল ঈশ্বর নিজে ছাড়া।" লেখক সমীরণ মজুমদারের বক্তব্য — "অগ্রগতি ও ধর্ম পরস্পরবিরোধী জায়গায় চলে আসতে বাধ্য। ধর্ম সব কিছুরই শেষ কথা থেকে শুরু হয়েছে — সমস্ত জিজ্ঞাসার চরম উত্তর হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। সুতরাং সামাজিক উন্নতির যে স্তরে, মানসিক বিকাশের যে পর্যায়ে, বিশেষ বিশেষ ধর্মের আবির্ভাব,

সামাজিক উন্নতি সেই স্তর বা পর্যায় অতিক্রম করলেই ধর্মের উত্তর পিছিয়ে পড়তে বাধ্য।" তিনি আরও বলেছেন — "যেখানেই ধর্ম, সেখানেই নাস্তিকতা। সে অর্থে ভারতীয় চার্বাক ছিলেন বিশ্বে প্রথম ধর্মের বিরুদ্ধে সরব বিদ্রোহ।" এই সাহসী মন্তব্য আসলে কার্ল মার্কসের সেই বিখ্যাত উক্তির অনুরণন — "ধর্মের বিরুদ্ধে সমালোচনাই, সুতরাং সব সমালোচনার আরম্ভ।" লেনিনের স্পষ্ট শব্দগুলিও এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য — "যারা সারা জীবন খাটে আর অভাবে নিমজ্জিত থাকে, ধর্ম এ পৃথিবীতে তাদের নম্রতা ও সহিষ্ণুতার শিক্ষাদান করে স্বর্গীয় পুরস্কারের সান্ত্বনা দেয়।" আর রাসেল বলেছেন — "আমি মনে করি 'অনিশ্চিত' শব্দটি অনিবার্যভাবে কোন কিছুর সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে, যা আপনার মতানুযায়ী এক ধরনের দৈবাৎ চরিত্রসম্পন্ন এবং আমি একমাত্র কারণগত অর্থ ছাড়া সত্য বলে কোনো কিছুকে চিন্তা করি না।"

উপরোক্ত বক্তারা সকলেই ধর্মকে নস্যাৎ করেছেন। কিন্তু ধর্মরাজ্যে যেসব মহামানব অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে বিচরণ করেছেন, তাঁদের কথাও তো শুনতে হবে। গৌতম বুদ্ধের স্নিগ্ধ কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে — "যদি মেনে নেওয়া যায় যে ঈশ্বরই সব কিছুর নির্মাতা, তাহলে কর্মে ইচ্ছা ও উৎসাহ থাকবে না।" এমনকি বিবেকানন্দের বক্তব্যেও আমরা যেন একটা দোলাচলের স্বাদ পাই — "মানুষ যতোরকম প্রেমের আস্বাদ পেয়েছে তার মধ্যে তীব্রতম প্রেম লাভ করেছে ধর্ম থেকে এবং মানুষ যতোরকম পৈশাচিক ঘৃণার পরিচয় দিয়েছে তারও উদ্ভব হয়েছে ধর্ম থেকে।"

এতজন গুণী এবং জ্ঞানী মানুষের কথা উল্লেখ করতে হচ্ছে, কারণ ধর্ম বিষয়টির বিভিন্ন তর্ক, বিতর্ক এবং বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে অগ্রগতির কাহিনিটি একটুখানি জেনে না নিলে 'মূল্যবোধে'র আলখাল্লার নীচে লুকানো শানিত ছোরাটির অস্তিত্ব আমরা কোনওদিনই চিহ্নিত করতে পারব না, যা একটিমাত্র সুযোগ পেলেই আমাদের রাষ্ট্রের 'সংহতি' নামক বহুযত্ন-লালিত বিশেষ্যটিকে রক্তাক্ত করবে।

আসুন, এবার আমরা সেইসব মহাপ্রাণ মানুষের কথা বলি, ধর্মকে মেনে নিয়েও, ঈশ্বরকে এই মহাজাগতিক কর্মকাণ্ডের চূড়ান্ত পরিচালক বলে স্বীকার করেও যাঁরা এই বিষয়টিকে এনে দিয়েছেন এক সীমাহীন ব্যপ্তি ; সূক্ষ্ম এবং স্থূল — সবখানেই যার প্রবেশ অবাধ। কবি জালালউদ্দীন রুমীর অবিস্মরণীয় পংক্তি দুটি দিয়েই শুরু করি —

"My place is placeless, my trace is traceless –
My body no soul, I am from the soul of souls..."

মানুষের সৃষ্টি এবং অস্তিত্ব রহস্যের এই অবারিত হাতছানির মূল্য বুঝবে কি 'মূল্যবোধ' বেশি ধর্মশিক্ষা ? এই শিক্ষা কি নাগাল পাবে ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ রামমোহনের, অম্লান দত্তের ভাষায় যিনি "চেয়েছিলেন সুনীতি, আত্মজ্ঞানের মিলন"রূপী ধর্ম — "সেই আত্মজ্ঞান, যা একদিকে ব্যক্তিত্বের মূলে বিশ্বাস, অন্যদিকে বিশ্ববোধে অনুপ্রাণিত"! এভাবে ধর্মকে বিশ্লেষণ ও অনুধাবন করতে গেলে বিদ্যাভ্যাস এবং অভিজ্ঞতায় নিজের মনভান্ডারটি এমনভাবে ভরিয়ে তুলতে হবে যাতে পৃথিবীময় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে একটি সুস্পষ্ট যোগসূত্র আবিষ্কার করা যায়। বিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ আসনে, সীমিত সময়ে, পাঠক্রমের বোঝা সামলে সত্যিই কি এই জ্ঞানে শিক্ষার্থীকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব ? আর এই প্রচেষ্টায় যদি এতটুকু বিকৃতি স্থান পায় তবে কি অচিরেই তা ফ্র্যাঙ্কেস্টাইনের দৈত্যের গল্পের চেয়েও ভয়ঙ্কর পরিণতি ডেকে আনবে না, অথচ মানুষ তো শেষপর্যন্ত অমৃতের সাধক, যে অমৃত ঝরে পড়ে M.M Thomas-এর গলায় – "We need a common human home – humanisation of existance – common religiosity, or common sense of the Divine – a meeting of faiths of spiritual depth in our time." বিভেদের উপর দিয়ে একতার কী তীব্র তরঙ্গ! কত সহজে ঘুচে যায় দেশকালের ব্যবধান। রবীন্দ্রনাথ বলে ওঠেন, "বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো/সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও।" ঠিক একই কথা ধ্বনিত হয় W.C. Smith-এর কণ্ঠে — "Our vision and our loyalties, as well as our aircraft must circle the globe." অবশ্য রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে হলে তাঁর উপলব্ধি সাগরে নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়াই ভালো। ভ্রাতৃহত্যার রক্ত মেখে আজও গুজরাটের পথে ঘাটে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের যদি শোনানো যেত সেই মহান অনুভূতির কথা — "পূর্ণতাই সরলতা। ধর্ম সেই পরিপূর্ণতার, সুতরাং সরলতার একমাত্র চরমতম আদর্শ" — "একদিকে স্বাতন্ত্র্যের স্ফূর্তি এবং অন্যদিকে সমগ্রের সহিত সামঞ্জস্য, এই দুই নীতিই একসঙ্গে কাজ করিতেছে। মানুষের স্বাতন্ত্র্য যখন মঙ্গলের সহায়তায় সমস্ত দ্বন্দ্বকে নিরস্ত করিয়া দিয়া সুন্দর হইয়া ওঠে তখনই বিশ্বাত্মার সহিত মিলনে সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জনের জন্য সে প্রস্তুত হয়।"

হ্যাঁ, এমনই বিভিন্ন এবং বিচিত্র বিশ্লেষণে অলঙ্কৃত আমাদের ধর্মের শরীর। ঋজুতা আছে, উদারতা আছে, প্রসারতা আছে, সঙ্কীর্ণতাও আছে। তবু বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ শেষপর্যন্ত

অলৌকিকের প্রভাবমুক্ত এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন। আস্তিক্যবাদ থেকে নাস্তিকতার দিকে এগিয়ে চলার পথে যে সবচেয়ে ইতিবাচক মোড়টি আছে, নিঃসন্দেহে তার নাম ধর্মনিরপেক্ষতা। অন্তত রাষ্ট্র ক্ষেত্রে এর চেয়ে সময়োপযোগী এবং আধুনিক সিদ্ধান্ত আর কিছুই হতে পারে না। কোনও নাগরিকের হৃদয়ের সংবেদনশীল স্থানে আঘাত না দিয়ে এবং কোনও নাগরিকের স্বেচ্ছাচারী হওয়ার অভিসন্ধিকে বাস্তবায়িত হতে না দিয়ে রাষ্ট্রকে যদি প্রগতির পথে শান্তিপূর্ণভাবে অগ্রসর হতে হয়, তবে ধর্মনিরপেক্ষতার রক্ষাকবচটি তার চাই-ই চাই। এই কারণেই মূলত, শিক্ষার্থীদের অর্থাৎ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রয়োজন এক বুক সহনশীলতা, যা গড়ে দেবে তাদের আসল মূল্যবোধ কিংবা হয়ত জীবনবোধ। দ্বন্দ্বময়, হানাহানির এই রক্তাক্ত ধরিত্রী আজ তার খণ্ডিত-বিখণ্ডিত, জর্জরিত শরীরে একটুখানি শান্তির বারি চায়, যা দিতে পারে কেবলই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা। এই বোধ ঠিকমত সঞ্চারিত না হলে একজন সত্যিকারের মানুষ তৈরি হতে পারে না। ফলে বিপদে পড়ে সমাজ, বিঘ্নিত হয় রাষ্ট্রীয় একতা। সুযোগসন্ধানীরা, যারা সংখ্যালঘু, দুর্বল মানুষের ক্ষতিসাধনে সদা প্রস্তুত, তারা তো চাইবেই তাদের উগ্রতা আর মৌলবাদের বিষ ছড়িয়ে সবুজ মনকে শৈশব থেকেই দূষিত করতে। না হলে, দিকে দিকে অযোধ্যা আর গুজরাট তৈরি হবে কী করে? আর এই কাজের জন্য বিদ্যালয়ের চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর কী হতে পারে? এখানেই তো জবাই করার মত নির্মল হৃদয়ের অফুরন্ত যোগান রয়েছে।

তবে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি কিন্তু এই ভারতবর্ষে একেবারে হাল আমলের নয়। এ দেশের শিকড়ে রয়েছে সহনশীলতার প্রাণরস, যা ধর্মকেও প্লাবিত করেছে যুগ যুগ ধরে। হোসেনুর রহমান সেই আদিকালের একটা ভারি সুন্দর ছবি এঁকেছেন তাঁর শব্দের তুলিতে, যে সময় শ্রীচৈতন্য অস্থির বাংলায় মিলনের এক নতুন আলোড়ন তুলে দিয়েছিলেন — "সেদিন শ্রী অদ্বৈত ভাবছিলেন কি করে হিন্দুর সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা দূর করা যায়। আর যবন হরিদাস ভাবছিলেন কি করে মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দূর করা যায়। এই সময়ের ইতিহাসে বলা হচ্ছে ঃ হিন্দু ও মুসলমান — এই উভয় ধর্মের ভেদমূলক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বাঙালীর বৈষ্ণব ধর্মে একটা বিদ্রোহ আছে। এই বিদ্রোহ বাঙালী ষোড়শ শতাব্দীতে করেছিল।" এই সুপরিচিত বক্তা এবং লেখক অপর এক প্রবন্ধে এদেশের ইতিহাসখ্যাত সম্রাটদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন — "আমরা অশোক, আকবরের প্রদর্শিত পথ বিস্মৃত হইনি। অশোক যে অহিংসা, মৈত্রী, মানবপ্রেমের বাণী প্রচার করেছিলেন, দেশে বিদেশে সেই সময় কেন, পরবর্তীকালেও তার কোনও তুলনা ছিল না। আর আকবর দেশশাসনে ধর্মবিশ্বাসকে দূরে সরিয়ে রেখে যুক্তি ও নিরপেক্ষতার উচ্চমান স্থাপন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে ব্যর্থ হলেও তাঁর নতুন ধর্মচর্চার স্বরূপ দীন-ই-এলাহির সর্বধর্ম সমন্বয় প্রচেষ্টা এক অসাধারণ ঐতিহাসিক ঘটনা।" আর এই প্রাচীন ঐতিহ্যকে অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবেই ভবিষ্যতের দিকে বহন করে নিয়ে যেতে চেয়েছে আমাদের নতুন ভারতবর্ষ, স্বাধীন ভারতবর্ষ। ধর্মের অস্তিত্ব নিয়ে, ব্যাখ্যা নিয়ে যত বিতর্কই থাক, যেন রাষ্ট্রব্যবস্থার স্বচ্ছন্দ গতিতে তা বাধা দিতে না পারে। ধর্ম যদি মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ হয়, তার স্বাতন্ত্র্যের নজির হয়, তবে থাক না সে সগৌরবে সন্ধ্যাপ্রদীপের আলোয়, নমাজের আন্তরিকতায় কিংবা চার্চের ঘন্টাধ্বনিতে। রাষ্ট্র এবং তার শিল্পব্যবস্থা যদি তাতে প্রত্যাশাভাবে থাবা বসায় তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের 'স্বাতন্ত্রে'র চাপে সংখ্যালঘু মানুষ পিষ্ট হবেন নিশ্চিত। এ বিষয়ে ভারি সাবলীল ভাষায় অম্লান দত্ত বলেছেন — "যাঁরা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাজ করতে চান, তাঁদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে দূরে থাকাই ভালো। ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ির মধ্যে কোনও গভীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীকে বিশ্বস্তভাবে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব।" তাই প্রত্যেক জ্ঞানী মানুষই চেয়েছেন ধর্মীয় সাধনার আচারের দিকটি আপন প্রাঙ্গণে সীমাবদ্ধ রেখে উপলব্ধির অঙ্গনটিকে প্রসারিত করা হোক পরম একতার লক্ষ্যে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায় — "বৃহৎ সম্মিলনের মধ্যে শক্তি ও শ্রী, কল্যাণ ও আত্মমর্যাদাকে ফিরে পাওয়া যায়। বিচ্ছিন্ন জীবনের প্রাত্যহিক ক্লীবত্ব, প্রাত্যহিক ঔদাসীন্য ঘুচে যায়। মানুষ প্রতিদিনের নির্বীর্য নিশ্চেষ্টতা থেকে মুক্তি লাভ করে। এই মানুষ হিন্দু, এই মানুষ মুসলমান, এই মানুষ এই মুক্ত পৃথিবীর সুন্দর মানুষ। নমস্কার এই মানুষকে!"

হ্যাঁ, প্রথমত মানুষ, দ্বিতীয়ত মানুষ এবং শেষপর্যন্ত মানুষ। এই মানুষকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ নির্বিশেষে 'মানুষ' ভাবতে শেখার চেয়ে বড় মূল্যবোধ শিক্ষা আর কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু এই মূল্যবোধ কি পাঠ্যবইতে কালো কালো অক্ষরের জটিলতায় জর্জরিত হতে পারে? মূল্যবোধ, জীবনবোধ, ধর্মবোধ — সবকিছুই কি শেষপর্যন্ত মানুষ তার নিজের জীবন, তার আত্মীয়, পরিজন, বান্ধবের জীবন থেকেই শিক্ষা করে না? সেই নীতিটি তাহলে নিষ্পাপ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেই কেবল বদলে যাবে কেন? এই প্রশ্ন আরও গভীর সব প্রশ্নের

জন্ম দেয়। শিক্ষা কী ? শিক্ষার উদ্দেশ্য কী ? অম্লান দত্তের ভাষায় — "অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলবার ক্ষমতাটিকে আরও একটু শিক্ষিত করে তোলাই কি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ? নাকি একটা আদর্শের সঙ্গে প্রাণের পরিচয় ঘটানো, সেই আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে ও পারিপার্শ্বকে নতুন করে রচনা করার আকাঙ্ক্ষা জাগানো শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ?" সেই বৃহত্তর আদর্শই মানুষকে নিজ ধর্ম চিনতে শেখায় — এই ধর্ম হল ভালোবাসার ধর্ম, একতার ধর্ম। এই ধর্মকে অনুসরণ করে মানুষের সুস্থ মননশীলতা, তার সংস্কৃতি, তার কাজকর্ম। শিক্ষার্থীকে যদি মূল্যবোধের শিক্ষা প্রকৃতই পেতে হয় তবে শিক্ষককে তাঁর আচরণ দৃষ্টান্তমূলকভাবে তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে। মূল্যবোধ জীবন থেকেই সঞ্চারিত হয় জীবনে — পাঠ্যপুস্তক থেকে নয়, গবেষণাগার থেকেও নয়। সেখানে যদি কোথাও 'ধর্ম' নামক বস্তুটি থেকেও থাকে, তবে তাকে গ্রহণ করতে হবে সংসার জীবনের সাধনার মাধ্যমেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় বলেছেন — "প্রাতঃকালে যিনি পিতা হইয়া আমাদিগকে কর্মশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনিই আমাদের মতো হইয়া আমাদিগকে তাঁহার অন্তঃপুরে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন। প্রাতঃকালে তিনি আমাদিগকে ভার দিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনি আমাদের ভার লইতেছেন।" যে মানুষ ধর্মকে স্বীকার করেন না, তাঁর তো সমস্যাই নেই ; কিন্তু যিনি ধর্ম মানেন, তিনি যদি বাল্যকাল থেকেই ধর্মের এই ব্যাখ্যা, ঈশ্বরের এই পরিচয়টুকু পেয়ে আসেন তাহলে নিশ্চিতভাবেই বলা যায় — তাঁর হাতে কোনওদিন ভ্রাতৃহত্যার রক্ত লাগবে না ; তাঁর হৃদয় কোনওদিন বিদ্বেষে কলঙ্কিত হবে না। নতুন মুক্ত সমাজের তিনি একজন সত্যিকারের কারিগর হয়ে উঠবেন।

আজ আমরা আক্রান্ত। আমাদের অর্থনীতি, ভাষা, সংস্কৃতি এবং শিক্ষাও আক্রান্ত। 'বিশ্বায়ন' নামক আগ্রাসী দৈত্য, যে পরিচালিত হয় এ যুগের এক নয়া মার্কিন হিটলারের অঙ্গুলিহেলনে, আজ তারই ভয়ঙ্কর থাবার সামনে সত্যিই বিপদাপন্ন আমাদের জীবনবোধ, আমাদের মূল্যবোধ। ঐ শ্বেতকায় দৈত্য জানে — ভাত কাড়লে, এমনকি প্রাণ কাড়লেও মানুষকে পরিচয়হীন পণ্য ক্রেতায় পরিণত করা যাবে না। কাড়তে হবে তার মন যাতে সে বিভক্ত হয়, বিকৃত হয় এবং বিলুপ্ত হয়। নামাবলীর তলায় যদি আজ সেই কোর্ট-প্যান্ট-টুপি পরা মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যায়, যার বিরোধিতা করা মানেই 'সভ্যতা'র বিরোধিতা করা, তাহলেও বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। মূল্যবোধের নামে তথাকথিত ধর্মের ক্যাপসুল গিলিয়ে শিশুমনকে নষ্ট করে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে বরবাদ করার চক্রান্তে তারও হাত থাকতে পারে না কি ? তবে ভরসা শুধু এই, যে যক্ষপুরীর যাদুমনের সব্বাই ভোলে, প্রত্যেকেই ভোলে ; কিন্তু ঠাণ্ডা করার কোনও আধ্যাত্মিক ডান্ডাতেই কেউ কেউ শেষপর্যন্ত ভোলে না। সীমিত সংখ্যক, তবু সোজা মেরুদণ্ডের এই মানুষগুলি শিক্ষাজগতেও সূর্য হাতে হেঁটে চলেছেন আজও। তাঁদের পথ দেখাচ্ছেন অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ, বলেছেন — "স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে, ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্র প্রকৃতিগত। মানুষের প্রকৃতি নিহিত এই অনন্তের বোধকে, তাহার ধর্ম-প্রবৃত্তিকে ইতিহাস-ভূগোল-অঙ্কের মতো স্কুল কমিটির শাসনাধীনে সমর্পণ করা যায় না।" নতুন করে ধর্মের পাঠক্রমীভবন আজ তাই সম্ভবই নয় এবং তার প্রয়োজনও নেই। আজ দরকার ঐ বহুকথিত ভালোবাসার ধর্মটিকেই জীবনধারণের সহজিয়া ঢঙে শিশু-কিশোরের সামনে তুলে ধরা আরও একবার। তাদের শোনানো দরকার তাদের জন্মভূমির বর্ণপরিচয়, যেখানে নজরুল শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন, হোসেনুর রহমান বিবেকানন্দে মশগুল হয়ে যান এবং মাসুদুর রহমান ইংলিশ চ্যানেল পেরোলে অথবা ইরফান পাঠান হ্যাট্রিক করলে ক্লাস সেভেনের বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে পি এইচ ডি করা সান্যালবাবু একই উন্মাদনায় লাফিয়ে ওঠেন ! মিলনের এমন ধর্মকে যাঁরা অনায়াসে ধারণ করেছেন হৃদয়ে তাঁরা তো নিজেরাই জীবন্ত পাঠ্যবই। পড়ুক না আমাদের শিক্ষার্থীরা প্রাণভরে পড়ুক এই জীবন-গীতা !

তথ্যসূত্র ঃ

১। অন্য এক বিপ্লব — অম্লান দত্ত
২। ধর্ম দ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবাদ — হোসেনুর রহমান
৩। বিবেকানন্দ বেদান্ত ও হিন্দু ধর্ম — হোসেনুর রহমান
৪। আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা — হোসেনুর রহমান
৫। মানব সমাজে ধর্ম — সমীরণ মজুমদার
৬। অনীশ সংস্কৃতি — সমীরণ মজুমদার
৭। কেন আমি ধর্মবিশ্বাসী নই — রাসেল
৮। ধর্ম প্রসঙ্গে — লেনিন
৯। ধর্ম প্রসঙ্গে — কার্ল মার্কস
১০। রবীন্দ্র রচনাবলী।

কমরেড তারা ব্যানার্জী ঃ সংগ্রামের স্বর্ণমূর্তি

শ্রীমতী রীতা রায় (সেনগুপ্তা)
প্রধান শিক্ষিকা, কদমতলা বালিকা বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি জেলার শিক্ষা তথা শিক্ষক আন্দোলনের আজীবন ছায়াসঙ্গী, শিক্ষা আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ, সুযোগ্য শিক্ষিকা শ্রদ্ধেয়া তারা ব্যানার্জী গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ সকাল ৮টা ১০ মিনিটে বার্ধক্যজনিত নানা অসুস্থতার কারণে আমাদের সকলকে ছেড়ে চলে গেলেন। জলপাইগুড়ি জেলার চুয়ান্নর স্মরণীয় আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী একমাত্র জীবিত সদস্য হিসাবে যাকে চুয়ান্নর ঐতিহাসিক আন্দোলনের সুবর্ণবর্ষ উদ্‌যাপনে জেলার অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানানো হলো, আজ তিনি আমাদের মধ্যে নেই। সেদিনও কমরেড অরুণ চৌধুরীর সাথে তারা ব্যানার্জী সমিতির অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করে গেলেন। কিন্তু একথা সত্যি তার রাজনৈতিক, সাংগঠনিক কর্ম-চরিত্রের উজ্জ্বল দিক তিনি রেখে গেছেন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চলার পথের পাথেয় হিসাবে।

একাধারে ইংরাজী সাহিত্যের সুযোগ্য শিক্ষিকা-ছাত্রীদের প্রতি স্নেহবৎসলা বিপরীতে সুশাসনের মধ্যদিয়ে ছাত্রীদের কাছে ভীতির কারণ হয়ে উঠা এই বিরল ব্যক্তিত্ব নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির আপামর (জলপাইগুড়ি জেলার) সদস্য/সদস্যা তথা জনগণের অত্যন্ত কাছের মানুষ, প্রিয় তারাদি হিসাবে চিহ্নিত হতে পেরেছিলেন। তার জীবনের নানা উত্থান ও পতন, চড়াই ও উৎরাই তিনি পেরিয়ে এসেছেন বহুবার।

১৯২০ সালে অবিভক্ত ভারতের ঢাকা জেলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা প্রয়াত চিন্তাহরণ ব্যানার্জী জেলা পরিদর্শকের করণে কাজ করতেন। অকৃতদার তারা ব্যানার্জী। পারিবারিক সূত্রে শিক্ষাজগতের সংস্পর্শে আসেন অতি শীঘ্রই। বাবার শিক্ষাজগতের সাথে যোগাযোগ সূত্রে তিনি ও তার ছয়বোন ও তিনভাই সকলেই প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করেন। ১৯৩৬ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন স্থানীয় সদর বালিকা বিদ্যালয় (বর্তমানে সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়) থেকে। তারপর উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় আসেন ও বেথুন কলেজ থেকে ইংরাজী সাহিত্যে স্নাতক ও পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রী অবস্থায় থাকাকালীন পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তার স্বাধীনচেতা মন গড়ে উঠে। সে যুগে ভারতের জাতীয় পতাকা বা বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের পতাকা তোলার জন্য ব্রিটিশের অনুমোদনের প্রয়োজন হত, সেই যুগেই তারাদি নির্ভয়ে ১৯৪২ সালে বিদ্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করেছেন। ১৯৪৫ সালে কারাবরণ করেছেন স্থানীয় জেলে। পারিবারিক বন্ধু একজনের (গুরুদাস মুখার্জী) কাছ থেকে জানা যায় বহু রাজনৈতিক স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীকে তিনি ঐ সময় আশ্রয় দিতেন নিজের বিপদ হবে জেনেও।

কর্মজীবন শুরু হলো ১৯৪৮ সালে। প্রথমে মালদায় পাওয়া বিদ্যালয়ে পরে হাওড়া। তারপরেই জলপাইগুড়ি সুনীতিবালা সদর বালিকা বিদ্যালয়ে যোগদান করেন ১৯৫০ সালের ২৮শে মে। সেখানেই ৩৫ বছর শিক্ষকতা করে ১৯৮৫ সালে অবসর নেন।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে তখন টালমাটাল অবস্থা। স্বাধীন ভারত সরকারও ব্রিটিশ সরকারের ন্যায় শিক্ষাকে কোন গুরুত্ব দেয়নি। এমনকি সংবিধানেও শিক্ষা গুরুত্বহীন। শিক্ষাজগতে তখন শিক্ষকদের আর্থিক দুরবস্থা সহ শিক্ষার্থীদের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। সমিতিতে তখন প্রবাদপ্রতিম নেতা প্রয়াত সত্যপ্রিয় রায় ও অনিলা দেবীর নেতৃত্বে সারা রাজ্যজুড়ে গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৯৫২-এর ভাষা আন্দোলনের পর পরই ১৯৫৪-এর স্মরণীয় ১২ দিনের শিক্ষকদের কলকাতায় অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়েছিল যা ঐতিহাসিক চুয়ান্নর স্মরণীয় আন্দোলন নামে খ্যাত। আজীবন যোদ্ধা তারাদিও জলপাইগুড়ির সুযোগ্য নেত্রী হিসাবে ঐ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। ১৯৫৮তে স্থানীয় মাদ্রাসা মাঠে প্রয়াত কমরেড সুহৃদ সেন, সর্বকনিষ্ঠ সুবোধ মিত্রের সাথে তারাদিও অনশনে বসেন। ভাগ্যে জোটে পুলিশের লাঠিচার্জ। দাবী মাত্র ৫ টাকা মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি, তাও জোটে নি।

আজ যখন বিশ্বায়নের দাপটে মধ্যবিত্ত সহ নিম্নমধ্যবিত্ত সকলের চিন্তাচেতনা ঘরমুখী স্বার্থপরতার নেশায় মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত

শুধু তাই-ই নয়, সমিতিকে ব্যবহার করার মানসিকতা, সর্বত্র বিরাজমান তখনই তারাদির চিন্তাচেতনা ও সমিতির প্রতি অগাধ ভালবাসা স্মরণ করার মতো। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি আঞ্চলিক স্তরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সভা সহ মহকুমা ও জেলাস্তরের প্রতিটি অনুষ্ঠানেই তিনি উপস্থিত হতেন। কোন অনুষ্ঠানের খবর তিনি না পেলে সমিতির কর্মকর্তাদের ডেকে বকা দিতেন। কোনদিনই নির্ধারিত সময়ের পরে তিনি যেতেন না। অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ের আগেই তিনি পৌঁছে যেতেন। শারীরিক অসুস্থতা বা বয়সজনিত কারণে শত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তিনি অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত বসে থেকে সকলকে ডেকে কথা বলতেন। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন "তোরা নতুনরা কেমন কী করছিস তাই দেখতে ইচ্ছা করে।

বৈচিত্র্যময় তারাদির জীবন। শিক্ষিকা তারাদির ক্লাশে পড়া না করে কোন ছাত্রী আসতে সাহস পেত না। পড়া না পাড়লে আবার বুঝিয়ে দিয়ে বিদ্যালয় ছুটির পর তা বুঝে নিয়ে তবে ছুটি দিতেন। প্রতিটি ছাত্রীর নাম তারাদির মুখস্ত ছিল। ছাত্রীর মাতা-পিতা সম্পর্কেও তারাদির নখদর্পণে ছিল। ভবিষ্যৎ জীবনে নিজের পায়ে দাড়ানোর সংকল্প নিতে উপদেশ দিতেন ছাত্রীদের। তারাদি কোনদিন দেরিতে বিদ্যালয়ে যেতেন না এবং বিদ্যালয় ছুটির আগে বিদ্যালয় ত্যাগ করতেন না। তারাদি ছিলেন ছাত্রীদের প্রিয় শিক্ষিকা, ছাত্রীদের নিজের "তারাদি"। সহকর্মী শিক্ষিকারা তারাদিকে অভিভাবিকা বলেই মানতেন। ভয় করতেন। শ্রদ্ধা করতেন। এমন কি প্রধান শিক্ষিকাও তারাদিকে সমীহ করে চলতেন। নিজে পারিবারিক জীবনে কর্তব্যে ফাঁকি দেননি। শিক্ষিকা হিসাবে পাঠদানে নিজে ফাঁকি তো দেনইনি, অন্যের ফাঁকি দেখলে ক্ষেপে যেতেন। সমিতিতেও দায়িত্ব পালনে সামান্য ত্রুটির জন্য অনেকেই বকা খেয়েছেন। যারা বকা খেয়েছেন তারাই সমিতির নেতৃত্বের পদে এসেছেন। তারাদি নেতা তৈরি করেছেন নিজে নেতৃত্বের পদ অলংকৃত করেননি।

তারাদির বাবা অভিনয় করতেন। তারাদিও ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন। তার কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প বিদ্যালয় পত্রিকা ছাড়াও জলপাইগুড়ির অনেক পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। আজও অনেক লেখা অপ্রকাশ্যই রয়ে গেছে। তিনি প্রকাশ করতে দেননি। "ভালো লাগে তাই লিখি, প্রকাশের দরকার কী?" তারাদি নিজেকে কোন ক্ষেত্রেই প্রকাশ করতে চাননি।

শেষবেলায় তারাদি ভালো করে চোখে দেখতে পারতেন না; কানেও কম শুনতেন। "শিক্ষা ও সাহিত্য" পত্রিকা পড়তে পারতেন না, বাড়ীতে পরে থেকে উইপোকা খাবে তার সহ্য হয়নি। কিছুদিন, কেউ দেখা করতে গেলে তাকে দিয়েই বিশেষ বিশেষ লেখা পড়াতেন। কানে কম শোনাতে পরে তাও সম্ভব হয়নি। তাঁর বাড়ীতে সমিতির পত্রিকার অবমাননা হবে জেনে তিনি নিতে চাননি।

জলপাইগুড়ির গণআন্দোলন তথা শিক্ষা আন্দোলনের অনেক সুযোগ্য নেতৃত্ব আজ আমাদের মধ্যে নেই। যেমন সুহৃদ সেন, সুবোধ মিত্র, সুনীল ভৌমিক, জগদীশ সেন, সুবোধ সেন গোবিন্দ কুন্ডু আরো অনেকে। আজ তারাদিও চলে গেলেন। স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় "একে একে নিভেছে দেউটি।" সাথে সাথে তারাদির মতো চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষা আন্দোলনের নিবেদিতপ্রাণ আমাদের এই প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেয় কর্তব্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা ও সাংগঠনিক দায়িত্ববোধকে। প্রাকৃতিক নিয়মে চলে যাওয়া তারাদির শূন্যস্থানের দিকে তাকিয়ে এ যুগের দৃঢ়প্রত্যয়ী আহ্বান হোক

"এগিয়ে চলার মন্ত্র মোদের
পিছিয়ে পড়ার নয়,
যতই আসুক বিপদ হাজার
করবো মোরা জয়।"

কবিতাগুচ্ছ

নির্বাচনিক

অশোক অধিকারী,

(১)
ভোটের ঢাকে কাঠি
পর্যবেক্ষক খাঁটি !
৫ দিনে হোক ভোট
করতে হবে চোট:

কিন্তু মশাই শুনুন
যতই কষে নাচুন,
কাস্তে-হাতুড়ি তারা
চিনেছে সর্বহারা।

(২)
কাঁদছি আমি সব ভুলে
'বিহার মডেল' দাও তুলে
নিদেন মহাকরণ
কালীঘাটের নাচন।

এই এনেছি জামা
মহাজোটের মামা
দাও না কিনে বাংলা
এমনিতরো হ্যাংলা।

(৩)
বাজল ভোটের বাদ্যি
কার এমনই সাধ্যি
মানুষ কথা বলে
সেই নিয়মে চলে।

উন্নয়নে জোয়ার
বাংলা তুমি কাহার
বাম সরকার বলে
এখনও দেশ চলে

(৪)
সব জাগাতে ১ কি ২ পশ্চিমবঙ্গে ৫
এটাই এবার ফু-মন্ত্র। এমনই তার ধাঁচ
নাচরে খেঁদি নাচ
দাদা ধরে বাঁচ
সবার মনে খোদাই করা কাস্তে হাতুড়ি ছাঁচ্।



(৫)
তুমি বললেই শিল্প নেই
উনি বলেছেন শিক্ষা
কে শেখালে উত্তরণে
নয় সে তো নয় ভিক্ষা।

একাত্তরে রক্ত
চেতনা পাকাপোক্ত
তাই টলেনি মন
দৃঢ় মানববন্ধন।

(৬)
দেওয়াল লেখা পড়ে
ইতিহাস তো গড়ে
এবার লেখা বারণ
অসঙ্গত কারণ।

তবু কেমন পদ্য লিখি
দেওয়াল তোমায় দেখেই শিখি
ক্ষেতখামারে একটি সুর
লাল নিশানে নয় সুদূর।

(৭)
কাস্তে মানে ধানের লড়াই
হাতুড়ি শ্রমের জয়
এখানে শহিদ জননী শেখায়
হও সবে নির্ভয়।

বাংলার মাটি তীব্র ভ্রুকুটি
পরিপাটী জনগণ
নয়া ইতিহাস নয় পরিহাস
প্রজন্ম সচেতন।

ভোটরঙ্গ

সুশান্ত দাস
রাজেশিবপুর বি কে পালস্ ইনস্টিটিউশন, *হাওড়া*

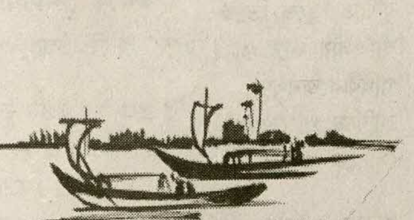
প্রতিশ্রুতির ফানুস ওড়ে
ভোটের সুর বাজে
গিরগিটিরা ব্যস্ত যে যার
রং বদলের কাজে

শৃগালের সাথে সন্ধি করেছে
সুচতুর সারমেয়
সঙ্গী কেন বকধার্মিক
সহজেই অনুমেয়।

হিসেব চলে দিনরাত্তির
কার কতটা ভাগ
লুকিয়ে রাখে জামার নিচে
যত কাদার দাগ

দুর্নীতি আর রাজনীতি
দোসর কে যে কার
সবাই তারা মাসতুতো ভাই
বুঝে নিয়েছে সার

মুখের সঙ্গে মুখোশের তাই
নেই তো কোনো দ্বন্দ্ব
নামাবলী গায়ে নামগান চলে
পয়ার-ত্রিপদী ছন্দ।





ছোঁয়া

নারায়ণ চৌহান, শিক্ষক
বালুরঘাট এল এম এ ইউ বিদ্যালয়, *দক্ষিণ দিনাজপুর*

অবকাশের শেষে উন্মুক্ত জীবন
গানের ছন্দে বাঁধা থাকে না
রাত্রির নিস্তব্ধতা যাদের কাছে কোলাহল
জীবনযন্ত্রণায় তারা অমৃতের সন্ধানে,
ভালোবাসা এখন ভালোলাগার কপটতায় আচ্ছন্ন নয়,
নিরন্নতার হাহাকারে দ্বিখণ্ডিত জীবন
সবুজের সজীবতায় রোদে পোড়া ঘাস
অনাহারক্লিষ্ট ক্লান্ত হাত, পা, চোখও নড়ে না,
মরা মাছের স্থবিরতা চারপাশে।
তুমি কি বৈভব চেয়েছিলে?
অদৃশ্য বিষময়তায় ঢলে পড়ছে লক্ষ লক্ষ প্রাণ
— দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প নয়ত বিস্ফোরণের অনিয়মতায়,
কে বাঁধবে এই পৈশাচিক নৃত্যকে?
জীবনের স্পর্শে — বৈভব নয়, বৈরাগ্য নয়,
আমৃত্যু দু'টো অন্ন দু'বেলা।
শিল্পোন্নয়নে মোছে না জীবন,
মোছে না শ্যামল প্রান্তর।
ঘুরে দাঁড়ায় মুমূর্ষু জীবন,
গতিময় হয় সভ্যতা।
সবুজের সজীবতায় নেচে ওঠে প্রাণ।
শহর থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে প্রত্যন্তর গ্রামের কোণায় কোণায়,
অজানা বিশ্ব চলে আসে হাতের মুঠোয়,
উত্তর পুরুষের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে,
আমরা গেয়ে উঠি জীবনের জয়গান।

আঁধার

তীর্থ বাগ, শিক্ষাকর্মী
জিরাট কলোনী উচ্চবিদ্যালয়, *হুগলী*

মনের জোরে আঁধার সরিয়ে সরিয়ে—
আজ বড়ই ক্লান্ত, সাগরপাড়ে সবুজ দ্বীপে,
ফুরফুরে বাতাস, ঠক্‌ঠক্ কাঁপায় পাতা—
আচমকা ভয়, জাগে পাখির ডানায়।
তবুও মনের জোরে আঁধার সরায়—
প্রতিনিয়ত মোকাবিলার যুদ্ধ।
দমন নেশার ঘূর্ণিপাক বায়ুকণার—
ভাঁজে ভাঁজে উদয়ের কলরব।
ভাসে-ডোবে, ভাসে-ডোবে,—
খন্ড খন্ড টুকরো।
তবুও আশা সরাবো আঁধার—
পাথরচাপা ঢাকা বুক।

সৃজনকাহিনি

বাসুদেব মন্ডল চট্টোপাধ্যায়
রানীগঞ্জ হাইস্কুল, *বর্ধমান*

গড়েছিল হাতে-গোণা লোক
হাতে-গোনা লোকেরাই গড়ে
সেই নির্মাণ ভেঙে দিতে
বাহু নয়, বহু হাত নড়ে।

সৃজনে সময় লাগে ঢের
বুকের রক্ত হয় ঘাম—
নিমেষেই ভেঙে দেওয়া যায়
শিল্প নয় ভাঙনের নাম।

যেহেতু শিল্প নয় ভাঙা
প্রতিভারও পদশব্দ নয়—
দৃশ্যত, ধুলিসাৎ তবু
সৃজনকাহিনি অক্ষয়।

ভাঙা নয়, সৃজনকাহিনি
লিখে যায় অমরবাহিনী।।



অনুভব

সুদীপ গঙ্গোপাধ্যায়, সহ-শিক্ষক
চেতলা বয়েজ হাইস্কুল, *কলকাতা*

নাছোড়বান্দা লোকটা
সব দেখতে পায়—
আর কেউ না জানলেও
আমি সেটা জানতাম ;
কারণ, আয়নাটা সংবেদনশীল মুখের সামনে ধরে
লোকটা সেদিন বলেছিলো,
দেখতে পাও না
মানুষ গোপনে লক্ষ্য করছে
আড়ালে থেকে।

ভাল থাকার জন্য

অলোক মিত্র, *বরানগর*

কার্ণিসে পা রেখে হেঁটে যাই
আসলে শিখছি
কীভাবে বেশ ভাল থাকা যায়।

আনুগত্য বন্ধক রেখেছি
কিছুটা সময়ের কাছে
কিছুটা নিষেধের কাছে

স্বপ্নের ইচ্ছেগুলো
উন্মুখ গাভীর মতো অলস
লজ্জার মাথা খেয়ে শুষে নেয়
নিষিদ্ধ রক্তের স্বাদ।

বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে
শ্যাওলায় ভরে গেছে
পৃথিবীর জনপদ
কার্ণিসে পা রেখে
সেদিকে তাকাই

রক্তের পোড়াগন্ধ ডিঙ্গিয়ে
লজ্জাহীন পা ফেলে
মর্গে হেঁটে যাই।

ফুলের মতো ফুটবো

শেখ ইসরাইল, *পশ্চিম মেদিনীপুর*

আকাশ ভেঙে, পাতাল ভেঙে এই পৃথিবীর গৃহে
সূর্য ওঠে, সূর্য ডোবে দিবস রাত্রি বহে।
হাজার হাজার সূর্যালোকে কোটি গ্রহের খেলায়
কেমন করে হিসেব কষে অঙ্কখানি মেলায় ?
ভাঙাগড়ার অনেক খেলায় শুধুই খুঁজে মরি
মহাবিশ্বের মহাকাশে কেবল কারিগরি,
কবে যাবো, কোথায় যাবো, কোথায় যেতে মানা ?
এমনি করেই বিজলী ঈথার হচ্ছে সবই জানা।
তাই তো এখন তার বেতারে চলছে কানাকানি
দূরের মানুষ সামনে দেখি, চলছে জানাজানি।
চাঁদের দেশে ঘুরে এখন গ্রহান্তরে ছুটে
এই পৃথিবীর মানুষগুলি নিত্য জেগে উঠে।
মহাবিশ্বের মহাকাশের আমরা পিপীলিকা
শেষ খবরে গ্রহের মানুষ পরছে জয়ের টিকা।
অলৌকিক মায়া ছেড়ে খুঁজছে আসল চাবি
জন্ম-মৃত্যু স্বর্গ-নরক এখন কমই ভাবি।
মানুষ যদি মানুষ না হয় পশুত্বকে বেঁধে
এই পৃথিবী ধ্বংস হবেই স্বার্থপরের জেদে।
অসীম জ্ঞানের সন্ধানেতে ছুটবো সবাই ছুটবো
জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে ফুলের মতো ফুটবো।

ইচ্ছাকল্প

শ্রীরবীন, শিক্ষক
বুলবুলচণ্ডী গিরিজাসুন্দরী বিদ্যামন্দির, *মালদা*

বড় ইচ্ছে হয় গাছ হই
টবের উপর মাথা রেখে ডুবিয়ে দিই
পায়ের শেকড়
রক্ত ও ঘামে ভেজা বুকটাকে পেতে দিই
রৌদ্র করতলে
যেন অজড় থাকে তুচ্ছ সালোকসংশ্লেষ।

আমাদের কত কিছু

সন্তোষ মুখোপাধ্যায়
হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ, *উত্তর ২৪ পরগণা*

আমাদের ইচ্ছেগুলি অনেকটা
শালিখের
বেখেয়ালি এক্কা দোক্কা খেলা
তারপর ফুরুৎ সেই—
রোদ্দুরে ছায়ায়.....
আমাদের ইচ্ছেগুলি
পাড়াগাঁর বাঁশের সেতু
বাবুই-এর মত দোল খায়।

আমাদের কিছু গল্প
মরাই-এর মত চুপ
উঠোনের শান্ত এক কোণে
কিছু কথা — ধারদেনা জমি বন্ধকিতে যায়
কিছু বুঝি চাঁক বাঁধে
কৃষ্ণকথা — পদাবলী শোনে।

আমাদের কিছু মুখ
বাড়ন্ত নদীর জলে
যেন খন্ডরাত ......
আমাদের নুন পান্তা
খেপলার জাল, ধান বোনা বেলা

কত শখ আমাদের
মানতের ঘন সিন্নি
শুকনো চৈত্রের মাঠে
দুঃখ-দুঃখ খেলা।

ঝুল বারান্দার ইস্তাহার

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *পুরুলিয়া*

মুখের পর মুখ দেখছি অসংখ্য মানুষের বিচিত্র সব শুকনো মুখ
এক একটি মুখের ভাষা এক এক রকম পড়তে বেশ কষ্ট হয়
চোখে চোখে থমকে আছে ঝড় আর আগুন
যে কোন সময় লাফিয়ে পড়বে বাঘের মতন।
মানুষের মাঝে অসংখ্য সব মার খাওয়া মানুষ নিঃশব্দে প্রহর গুনছে
ঝরে যাচ্ছে আমের মঞ্জরী উড়ে উড়ে পড়ছে শালপাতা
পাখির ডানায় বারুদের গন্ধ কিসের সংকেত ?

পৃথিবীকে কিনে নিতে দরকষাকষি করছে কোন্ সওদাগর ?

মানুষের চোখে মুখে ভয় ভয় বিভীষিকা নীল সন্ত্রাস
বুকের ভেতরে চাবুক মারছে ফ্যাসিবাদ উগ্রপন্থী বর্বর
বাণিজ্যিক হাওয়া নৌকো দুলিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে চোখ ধাঁধানো চাঁদমালা।

এক একটা মানুষের মুখ রক্তহীন বিবর্ণ ফ্যাকাসে
পড়তে কষ্ট হয় তাদের চোখের ভাষা— ভাঙা ভাঙা হরফ
শৌরসেনি না খরোষ্ঠি লিপি ?
ছেঁড়া ঠোঁটে ঝুলছে চিরকূট — ভালবাসার চিঠি চুরি করে
নিয়ে গেছে হার্মাদ
বাদুড়ের ডানার ভেতরে বন্দি সাতপুরুষের উত্তরাধিকার
কেঁদে কেঁদে উঠছে যন্ত্রণায়।

নীল অন্ধকারে জমে থাকা বিষাদ খুবলে খাচ্ছে শরীরের মাংস
হা উন্মাদ ! হা নিষাদ !
সভ্যতার ছাল চামড়া ছিঁড়ে এ কোন্ ধূলোট উৎসব ?
নিরাপদ নিশ্চিন্ত আস্তানা ঘর বাড়ি বাগান সবকিছুই নীলাম
জোতদারের লাঠিতে বাঁধা লাশ রক্ত মাংসহীন কঙ্কাল
ভুতুড়ে জ্যোৎস্নায় শোনাচ্ছে গান "হিন্দুস্তান হামারা...... ।"
এই আমার দেশ ভারতবর্ষ.......

মাঠ ভেঙে মাটি উল্টায় যে নিরক্ষর চাষা
তার লাঙ্গলে আর ধান কাটা কাস্তের ডগে বাজছে মেঘমল্লার
নেতিয়ে পড়া সব বিবর্ণ মানুষ এবার লাফিয়ে উঠবে স্বয়ংক্রিয় তেজে।

ঝুল বারান্দায় এখন নতুন ইস্তাহার চোখের মুখের ভূগোল পাল্টায়।



মন্ত্রমুগ্ধ

তাপস সরদার, *সহ-শিক্ষক*
মিত্র সংঘ বিদ্যায়তন হাইস্কুল, *কলকাতা-১০*

গড়াতে গড়াতে কুন্ডলী পাকাতে পাকাতে
আর চলে নাকো।
আমি সাবধানী নই বরং একটু অন্যরকম বিতৃষ্ণায়
ধিক্কার আর অভিমানে
দ্বিধা দৈন্যতা বোধে নির্লিপ্ত সময়ের খাঁচায়
তোতাকাহিনির গল্পে
আমাদের স্বপ্নগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো হচ্ছে
আর আমরা
কী ভীষণ শীতলতায়
মদীর হয়ে ভবি গড়ে চলেছি

সময়ের স্বর্ণ খাঁচাটায় প্রবল শ্লাঘায় নেমে আসুক
বৃত্তের কলজে শূন্য শরীরে কোন রক্ত রস নেই
বারবার ভুলিয়ে দিয়েও আমাদের ডেকে নিয়ে যায় কি এক
মায়াবী চূড়োয়।

আমাদের ভুল ভাঙতে ভাঙতে ভুল ভাঙতে ভাঙতে
গড়িয়ে চলেছি তবু মন্ত্রমুগ্ধ।

অঙ্গীকার

সমীর চট্টোপাধ্যায়, *সহ-শিক্ষক*
বড়রা উচ্চবিদ্যালয়, *বীরভূম*

অতন্দ্র প্রহরী সমাজ
চেয়ে আছে আগামীর প্রতীক্ষায়।
অর্জিত সহজাত সমস্ত জ্ঞান
প্রবহমান শিরা উপশিরায়।
উর্বর মৃত্তিকার উপর
ছড়াবো উন্নত বীজ
ফসল ফলবে ভাবী প্রজন্ম।
আকাশের বুকে আঁকা রামধনু নয়
কঠিন মৃত্তিকার বুকে
সংগ্রামী ফসল

যাত্রা

চিন্ময় বিশ্বাস, সহ-শিক্ষক
উদয়রাজপুর হরিহরপুর হাইস্কুল,
উত্তর ২৪ পরগণা

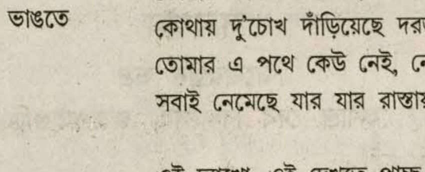
সামনে অজানা পথ বাকি পেরোবার
মধ্য গগনে ঝলসানো রবিকর
একটু পরেই নামলে অন্ধকার
খুঁজে নিতে হবে শাশ্বত কোনও ঘর।

হয়ত স্বপ্নচূড়ায় জমবে মেঘ
পলকে পলকে পথ পুরো পঙ্কিল
হয়ে এলে তবু যেতে হবে সামনেই।
থমকে দাঁড়াবে? দেখা কই সঙ্গীর?

কোথায় কাঁকন বেজেছে — বক্ষে ঢেউ—
কোথায় দু'চোখ দাঁড়িয়েছে দরজায়—
তোমার এ পথে কেউ নেই, নেই কেউ,
সবাই নেমেছে যার যার রাস্তায়।

ওই দ্যাখো, ওই দেখতে পাচ্ছ বেলা
মেঘের আড়ালে ধীরে ধীরে এল নেমে?
পথে যেতে যেতে এ যে দেরি হ'ল মেলা।
চলো, চলো, চলো — থেকে না তিলেক থেমে।

সেই কোন্ ভোরে বেরিয়েছ মনে নেই!
আঁধার নামলে যাত্রার সমাপন
চলো, চলো, চলো— এসেছ তো চলতেই
এ পথের শেষে ছিঁড়ে যাবে বন্ধন।



ভোরের সূর্য দেখবে বলে

বলরাম চক্রবর্তী, প্রাক্তন শিক্ষক
পাঁচারুল শ্রীহরি বিদ্যামন্দির, *হাওড়া*

খোকা ভোরের সূর্য দেখবে ব'লে
জেগেছিলো, জেগেছিলো সারারাত।
কথা দিয়েছিলেম তাকে
নতুন ভোরে এনে দেবো একটা ফুটন্ত গোলাপ।

দিনান্তে ভোর, ফুটন্ত গোলাপ
আর নিটোল সূর্যের মুখ খুঁজতে
দু'চোখে স্বপ্ন নিয়ে
বার বার গিয়েছি দূরে দূরান্তে
অলি গলির আঁধার মাড়িয়ে মিছিল ময়দানে ;
স্লোগানে সাগর জেগেছে, তরঙ্গ উঠেছে ক্ষেপে
ঝঞ্ঝায় দোলন লেগেছে ডালে
রাত্রি দিন শীত গ্রীষ্ম বর্ষা সাঁত্‌রে
কৈশোর যৌবন আর প্রৌঢ়ত্বের রণক্ষেত্র তীর ছুঁয়ে
বার্ধক্যের চরে দেখি
স্বপ্নের লাশটা শুয়ে আছে।

খোকা ভোরের সূর্য দেখবে বলে জেগেছিলো,
এখন দেখি সেই সূর্যটা রাত্রির জঙ্গলে
ধর্ষণে ক্ষত, খুনের আগুনে দগ্ধ চৈতন্য-শরীর ;
গোলাপের গাল বেয়ে
ঝরে পড়ছে মুঠো মুঠো
রক্ত-স্রোত ঃ কালের গরল।

সাবধান

মনোরঞ্জন ভদ্র
ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয়, *জলপাইগুড়ি*



সাবধান! আবার এসেছে ক্লাইভ জর্জ ডব্লিউ বুশ সেজে।
পলাশীর প্রান্তরে নয়, কোন এক খণ্ড অংশের জন্যও নয় ;
কামান, বারুদ, দোনালা বন্দুক, রাইফেল ছেড়ে দিয়ে
নিউক্লিয়ার উইপেন্স, পরমাণু বোমা, তাতেই জাগিয়ে ভয়,
সন্ত্রাসবাদী দমন অথবা পরমাণু অস্ত্রের খোঁজে,
একে একে দখল নেবে স্বর্ণময় তেলের সাগর এশিয়াকে।
সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত শ্রমজীবী মানুষের বিজয়রথে
কর্মহীনতা, অনাহারে দারিদ্র্য চাপিয়ে দিয়ে
ভেঙে দিতে বিরোধিতার ব্যারিকেড, যাক্ প্রাণ নিরীহ মানুষের
যৌথ মহড়া সাগর থেকে শূন্যে, মিরজাফর লজ্জা পায় কবরে শুয়ে,
আছে বসে কোফি আন্নান আমেরিকার ইউ ডি ক্লার্ক সেজে।
সাবধান! আবার এসেছে ক্লাইভ জর্জ ডব্লিউ বুশ সেজে।



মহিয়সী মহিলা

মনোরঞ্জন ভদ্র
ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয়, *জলপাইগুড়ি*

জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে
তুমি হয়েছো মহত্বে মহিয়সী মহিলা।
তোমার উত্তরণের পিছনে নিশ্চয় আছে
তোমার চেষ্টার সাথে কোন এক মহানুভবের প্রেরণা।
সমাজ, সংসার, সংস্কার, কর্দম কন্টক পথ পেরিয়ে
ভেঙেছো শৃংখল, মুক্ত করেছো প্রতিকূলতা।
বড়োদের সাবধানী শাসানি, গজরানী,
ধর্মীয় আচার, অনাচার, পুরানো প্রথা
বংশীয় বশীকরণ মিথ্যা বেষ্টনী
পড়শীর পরাভূত পরশ্রীকাতরতা
পরিবেশ, পরিস্থিতির অপরিমিত প্রতিবন্ধকতা
প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিহিংসা, কুৎসা, কলঙ্ককালিমা
মৌলবীর কলমা, পুরোহিতের বেদ মন্ত্রণা
পুরুষের অধীন, অধীনতা, সংসারের আদিমতা
সব কিছু দূরে রেখে লোকভয় যন্ত্রণা মুছে ফেলে
মানুষকে জয় করে হয়েছো মহিয়সী মহিলা।

বিশ্বের মানুষের বুকে বাধা ফ্রেমে
মহাকাশ জয় করে বিজ্ঞানী শিরোপায় শায়িতা।
সমুদ্র সাঁতারে, দুষ্কর দুর্গম পর্বত অভিযানে
এনেছো সাফল্য ফেলে দিয়ে ওদের জল্পনা কল্পনা।
অনাথ, পতিত, সমাজ, সংসার পরিত্যাজ্যা যারা
কোলে তুলে, বুকে ধরে আশ্রয়ে নিজ স্তন রক্তে
করেছো পালন, দিয়েছো মায়াভরা সান্ত্বনা
যারা ভাবে তোমাকে, শুধুই উপভোগ্যা
তুমি মাদার, তুমি সিস্টার, তাদের করেছো ক্ষমা।
সাম্রাজ্যবাদীর শানিত অস্ত্র, বারুদের উল্কা
লড়েছো সামনা-সামনি মাঠে আর ময়দানে
কখনও ঝাঁন্সি কখনও আবার বাংলা
কে বলে তুমি অর্ধাঙ্গ ? তুমি সম্পূর্ণা মহিয়সী মহিলা।

এখনও ঘন্টা বাজলে

সিরাজুল ইসলাম
নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, *নদীয়া*

পর্ব-১

এখনও ঘন্টা বাজলে মনে পড়ে
গিরীন স্যারের তোবড়ানো গাল
চোখের সামনে ভেসে ওঠে
টায়ার কাটা চপ্পল, ছেঁড়া ছাতা, মলিন ধুতি
আর শত ছিন্ন জামাটার ভেতর জীবন্ত এক কঙ্কাল।
এখনও ঘন্টা বাজলে শুনতে পাই
খিদেয় কোঁকড়ানো সামসুল মাস্টারের
একটানা কাশির শব্দ।

পর্ব-২

ওই সেই গিরীন স্যারের স্কুল
ওই সেই সামসুল মাস্টারের পাঠশালা
ঝাঁ চক্‌চক্ দালান
সপ্রতিভ এক ঝাঁক তরুণ শিক্ষক
মোবাইল রিংটোনে বাজে
'সারে জাঁহা সে আচ্ছা'—

পর্ব-৩

এখনও ঘন্টা বাজলে
সহসা অন্যমনস্ক হয়ে ফিরে যাই
নামতাপড়া কোনো এক নিঝুম দুপুরে
আমি ক্লাস ফোর
গিরীন স্যার জমা-খরচের অঙ্ক কষতে কষতে
রক্ত বমি করছে।

নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি

'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র উদ্যোগে লেখক-পাঠক সভা (অংশগ্রহণমূলক)

প্রথম পর্যায় — প্রেসিডেন্সি বিভাগ

১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৬, রবিবার

স্থান ঃ সত্যপ্রিয় ভবন

অনুষ্ঠানসূচি

নিবন্ধীকরণ সকাল ৯-৩০মিঃ—১০টা

প্রথম পর্ব

	উদ্বোধনী অনুষ্ঠান	ঃ	*সভাপতি*, **বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়**
১০-০০	উদ্বোধন	ঃ	**প্রশান্ত ধর**, *প্রাক্তন সম্পাদক, 'শিক্ষা ও সাহিত্য'*
	স্বাগত ভাষণ	ঃ	**শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়**, *সাধারণ সম্পাদক*
	ভিত্তিপত্র উপস্থাপনা	ঃ	**বিকাশ মণ্ডল**, *সম্পাদক, 'শিক্ষা ও সাহিত্য'*
	সঞ্চালক	ঃ	**অপর্ণা সান্যাল (ব্যানার্জী)**, *যুগ্ম সম্পাদক, 'শিক্ষা ও সাহিত্য'*
১০-৪৫	দলগত বিভাজন	ঃ	বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও সক্রিয়তা এবং প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখন
১-০০		ঃ	মধ্যাহ্ন ভোজন

দ্বিতীয় পর্ব

২-০০	শুভেচ্ছা জ্ঞাপন	ঃ	১। **অমিতাভ সেন**, *প্রাক্তন সম্পাদক, 'শিক্ষা ও সাহিত্য'* ২। **অজিত বাগ**, *প্রাক্তন সম্পাদক, 'শিক্ষা ও সাহিত্য'*
২-১৫		ঃ	দলগত বিষয়ভিত্তিক আলোচনার প্রেক্ষিতে সঞ্চালকদের লিখিত বক্তব্য ও সুপারিশ পাঠ
৩-০০		ঃ	সঞ্চালকদের বক্তব্য ও অংশগ্রহণকারীদের উত্তরপত্রের ভিত্তিতে লেখক-পাঠক সভার নির্যাস উপস্থাপন — **রামরমণ ভট্টাচার্য**, *সদস্য, জার্নাল কমিটি*
৩-৩০		ঃ	সভাপতি কর্তৃক ধন্যবাদ জ্ঞাপন

লেখক-পাঠক সভার ভিত্তিপত্র

'শিক্ষা ও সাহিত্য' সমিতির মুখপত্র, সংগ্রামের হাতিয়ার এক শক্তিশালী মাধ্যম। সমিতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালীকে সবার কাছে পৌঁছে দিতে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' প্রথম থেকেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। 'শিক্ষা ও সাহিত্য'র যথাযথ মেলবন্ধন হলে একদিকে যেমন পত্রিকার মানোন্নয়ন সম্ভব তেমনি সংগঠনকে মজবুত ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলা সম্ভব। মনে রাখতে হবে সংগঠনের অবস্থান মাঝখানে, একপাশে শিক্ষা, অন্যপাশে সাহিত্য। তাই লেখক-পাঠকদের সবসময় সংগঠনের কথা মাথায় রাখতে হবে। শিক্ষাসংক্রান্ত মননশীল ও তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ, শিক্ষা আন্দোলন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ লেখা, পেশা ও তার বিভিন্ন সমস্যা এবং সমাধান সম্বলিত লেখা, শিক্ষার মানোন্নয়নে রাজ্য সরকারের ভূমিকা ও পদক্ষেপ এবং তার সুফল সংক্রান্ত বিভিন্ন লেখা, সমিতির অতীত ইতিহাস সম্পর্কিত বিভিন্ন লেখা যেমন কাম্য তেমনি অন্যদিকে আমাদের সমাজদর্শন, মূল্যবোধ, আদর্শ ও দায়বদ্ধতাকে সাহিত্যের গুণ বজায় রেখে কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতির মধ্যদিয়ে পাঠকের কাছে তুলে ধরাও কাম্য। 'শিক্ষা ও সাহিত্য'র দুই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ 'শিক্ষা' ও 'সাহিত্য'। বিভিন্ন ধরনের লেখার মধ্যদিয়ে এই দুই অঙ্গের যথাযথ বিকাশ ও সমন্বয় 'শিক্ষা ও সাহিত্য'কে আরো সমৃদ্ধ করে তুলবে।

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের আগ্রাসন ও আধিপত্যমূলক ভোগবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের লেখনি চালনা করতে হবে। বর্তমান প্রতিকূল পরিস্থিতিতে 'শিক্ষা ও সাহিত্য'র লেখক-পাঠকগণ নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারেন না। প্রতিবাদ, প্রতিরোধমূলক লেখা উঠে আসুক। মৌলবাদ, ফ্যাসিবাদ ও নানাবিধ সামাজিক শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে হবে আমাদের আন্দোলন। সংস্কৃতি আজ নানাভাবে বিপন্ন। জাতীয় ক্ষেত্রে জাতপাত, কুসংস্কার, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা ধর্মান্ধতা, অন্ধ ঐতিহ্য প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃতি আক্রান্ত। এসবের বিরুদ্ধে কলম ধরতে হবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বের সমস্ত সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে একটিমাত্র ভোগবাদী সংস্কৃতি চালু করতে চায়। মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে এ এক বিরাট অশনি সংকেত। বিশ্বজোড়া বৈচিত্র্যময় সব সংস্কৃতির অবলুপ্তি ঘটতে দিলে তা হবে আত্মহননের সমতুল। শিক্ষক সমাজই এই বিপদে পথ দেখাতে পারেন। 'তাঁদের সঙ্গে সমাজের সব অংশের নাড়ীর যোগ। ভারতের আছে অফুরন্ত লোকসংস্কৃতির ভাণ্ডার, তাকে অবলম্বন করে বিশ্ব ভোগবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই জারী রাখতে হবে। লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক ও শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত নিবেদিতপ্রাণ মসি হাতে সংগ্রামী সৈনিকদল আমাদের পথ দেখাবে। যারা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে দেশ ও সমাজের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করে যথাযথ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি নানাবিধ সাহিত্যকর্মের মধ্যদিয়ে।

বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির একটা ভিন্নতর সমস্যা তৈরী হয়েছে। বঙ্গভাষী মানুষের বৃহত্তর অংশ থাকে ওপার বাংলায়। এক ভাষা এক সংস্কৃতির প্রবাহ ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি কী? কাঁটাতারের দুর্লঙ্ঘ বাধা এবং মৌলবাদী আগ্রাসন কি সেই স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করছে না? অন্যদিকে ঝাড়খণ্ডে, বিহারে ও আসামে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। সেখানে ভিন্ন ভাষা, সংস্কৃতি ও সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার দাপটে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি মুমূর্ষু। শিক্ষক সমাজের চেতনাতে কি এসব পরিস্থিতি আঘাত হানবে না?

চিরকালই পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে দেশের মানুষ জানতে চায় শিক্ষক সমাজ কী ভাবছেন? কী তাঁদের পরামর্শ, যথার্থ পথ কী? সমাজ-ন্যস্ত এই দায়িত্ব আচার্যকুল এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাই 'শিক্ষা ও সাহিত্য'কে তাঁরা হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিন, সমাজকে পথ দেখান, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুন। শিক্ষককে 'সমাজ গড়ার কারিগর' হিসাবে সার্থক করে তুলতে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' উপযুক্ত ভূমিকা পালন করুক। সমিতির মুখপত্র আজন্ম এ কাজে ব্রতী, একে আরো সমৃদ্ধ করে তোলার দায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মের লেখক সাহিত্যিকদের।

বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনকে পরিপুষ্ট করার জন্য লিখতে হবে। সকলের জন্য শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে 'শিক্ষা ও সাহিত্য'কে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। স্বাধীনতার আগে, পরে এবং বামফ্রন্টের আমলে শিক্ষাচিত্রের পরিচয় দিয়ে প্রবন্ধ ও গল্প লিখতে হবে। যার মধ্যে গ্রামীণ জীবনের যে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে তা প্রতিফলিত হবে। আমরা 'কলাকৈবল্যবাদী' নই, আমরা নিরপেক্ষ নই, আমরা জীবনের জন্য, মানুষের জন্য শিল্প সাহিত্যের পক্ষে, আমরা প্রগতিশীল লেখার পক্ষে।

লেখার একদিকে যেমন লেখক বা স্রষ্টা থাকেন তেমনি অন্যদিকে থাকেন পাঠক বা উপভোক্তা। পাঠককে যদি আকৃষ্ট না করা যায়, যদি তাদের মধ্যে 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পাঠের আগ্রহ সৃষ্টি না করা যায় তাহলে সংগঠনগত ও সাহিত্যগত উভয়বিধ উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। তাই একদিকে



লেখক-পাঠকসভায় আলোচনারত অংশগ্রহণকারীদের একটি দল।

সৃষ্টি হওয়ার পথকে সেই সঙ্গে মনস্ক পাঠকের ভাবনার স্তরকে বিপর্যস্ত করে দিতে চাইছে তার বিপদের দিকটি নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় স্বাগত ভাষণ দেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সমসাময়িক পরিস্থিতিকে সামনে রেখে সমিতির মুখপত্র যে সংগঠনের দিক্‌নির্দেশক কম্পাস সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য আমাদের স্পর্শ করে যায়।

যেমন সাহিত্যধর্মী লেখার মান ও পরিমাণ দুটোই বৃদ্ধি করতে হবে তেমনি অন্যদিকে পেশাসংক্রান্ত নানা বিষয়ে লেখা যুক্ত করতে হবে। এর সঙ্গে সাংগঠনিকভাবে প্রতিটি বিদ্যালয় ইউনিটে পত্রিকা পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। 'শিক্ষা ও সাহিত্য'র বৈশিষ্ট্য ও বিষয় বৈচিত্র্যের কথা সদস্যদের কাছে তুলে ধরতে হবে। জোন, মহকুমা ও জেলাস্তরে লেখক-পাঠক সভা সংগঠিত করতে হবে। এবংবিধ প্রচেষ্টার মধ্যদিয়ে 'শিক্ষা ও সাহিত্য'কে সদস্যদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে।

সমবেত গুণীজন ! আসুন আমরা এই লক্ষ্যে আমাদের এই লেখক-পাঠক সভাকে পরিচালিত করি। নিজেদের মধ্যে আলোচনা ও মতবিনিময়ের মধ্যদিয়ে আমাদের এই সভার উদ্দেশ্যকে সফল করে সংগঠনের হাতিয়ার হিসাবে 'শিক্ষা ও সাহিত্য'র ভূমিকাকে আরো উজ্জ্বল করে তুলি এবং সংগঠনকে আরো সময়োপযোগী ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলি।

প্রতিবেদন

গত ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত সমিতির মুখপত্র 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র উদ্যোগে একদিনের লেখক-পাঠক সভা (অংশগ্রহণমূলক) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সত্যপ্রিয় ভবনে। সভার উদ্বোধন করেন 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র প্রাক্তন সম্পাদক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রশান্ত ধর। তিনি তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে এই লেখক-পাঠক সভার প্রয়োজনীয়তার কথা যেমন বলেন তেমনই বিশ্বায়নের প্রভাব কীভাবে আমাদের সংগঠনকে সর্বোপরি দায়িত্বসচেতন লেখক

এরপর ভিত্তিপত্র উপস্থাপনা করেন 'শিক্ষা ও সাহিত্য'র সম্পাদক বিকাশ মণ্ডল। ভিত্তিপত্র উপস্থাপনের পরে তিনি অংশগ্রহণকারী লেখক-পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তারা যেমন ভিত্তিপত্রের আলোকে আলোচনায় অংশ নেবেন তেমনি আলোচনার জন্য প্রদত্ত বিষয়গুলির প্রতিফলন 'শিক্ষা ও সাহিত্যে' সঠিকভাবে ঘটছে কিনা এবং ভবিষ্যতে এই প্রতিফলন কীভাবে পত্রিকার মানোন্নয়নে সহায়ক হবে সে বিষয়ে একজন সঞ্চালকের নেতৃত্বে দলগতভাবে আলোচনা করতে হবে এবং সঞ্চালকের মাধ্যমে লিখিত বক্তব্য ও পরামর্শ সভায় উপস্থিত করতে হবে। এছাড়াও আর কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মুখপত্র হিসাবে 'শিক্ষা ও সাহিত্যে' উঠে আসা উচিৎ সে বিষয়ে দলগত পরামর্শ লিখে জানাতে তিনি অনুরোধ করেন। সভাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখেন 'শিক্ষা ও সাহিত্য'র প্রাক্তন সম্পাদক অমিতাভ সেন। লেখক-পাঠক সভার সঞ্চালক মুখপত্রের যুগ্ম সম্পাদক অপর্ণা সান্যাল (ব্যানার্জী) প্রেসিডেন্সি বিভাগের জেলাগুলি থেকে আগত প্রতিনিধিদের দলবিভাজন ও দলগত বিষয় সভায় জানিয়ে দেন। মোট ৬টি বিষয়ের উপর আলোচনার ভিত্তিতে লিখিত নির্যাস সভায় পেশ করার জন্য দলগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়। বিষয়গুলি ছিল (ক) মাতৃভাষা দল — বিষয় : বিপন্ন বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি দেশে বিদেশে। (খ) কমলা ভট্টাচার্য দল — বিষয় : 'শিক্ষা ও সাহিত্য' আজন্ম সমিতির সংগ্রামের হাতিয়ার। একে শানিত রাখুন। (গ) সালাম দল —

বিষয় ঃ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা ও 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-এর লেখকদের ভূমিকা। (ঘ) রফিক দল — বিষয় ঃ বিশ্বায়নী থাবায় আক্রান্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি। (ঙ) বরকত দল — বিষয় ঃ বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ ও তার সুফল ঃ শহর ও গ্রামে। (চ) জব্বার দল — বিষয় ঃ চাই সার্থক রচনা — চাই পাঠক, অবশ্যই সু-পাঠক। দলগুলিতে সহায়ক হিসাবে ছিলেন প্রশান্ত ধর, রামরমণ ভট্টাচার্য, দীননাথ সেন, সমীর ভট্টাচার্য, অশোক অধিকারী ও সোনালী দত্ত। সভায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত শিরোনামে ২০টি প্রশ্ন-সমন্বিত একটি উজ্জীবনী প্রশ্নমালা প্রত্যেককে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পর্বে ৬টি দলের ৬জন সঞ্চালক একে একে তাঁদের লিখিত মতামত বিষয়ের আলোকে সভায় উপস্থাপিত করেন।

দলগুলিতে সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন সীমা দত্ত, শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, সুবোধ দত্ত চৌধুরী, শিখা বিশ্বাস, তরুণ সরকার এবং জগন্নাথ ব্যানার্জী। পরে সঞ্চালকদের বক্তব্য ও অংশগ্রহণকারীদের উত্তরপত্রের ভিত্তিতে লেখক-পাঠক সভার নির্যাস সভায় উপস্থাপন করেন জার্নাল কমিটির অন্যতম সদস্য রামরমণ ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর বক্তব্যে দলগুলির অভিমতকে আগামী দিনে মুখপত্রের পথ চলার মশাল বলে মন্তব্য করেন। তবুও ভালো লেখা পাবার সমস্যা ও তার থেকে মুক্তি পাবার উপায় হিসাবে তিনি 'শিক্ষা ও সাহিত্য'র নতুন লেখক তৈরির প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার কথা বলেন। সর্বোপরি সংগঠন যেমন শিক্ষা ও সাহিত্যকে শক্ত করে ধরে রেখেছে তেমনই আজকের শিক্ষাভাবনা ও সাহিত্যের বিচিত্র পরিবর্তন 'শিক্ষা ও সাহিত্য'র লেখককুলের হাত দিয়ে বেরিয়ে আসবে সেইটেই লেখক-পাঠক সভার কাম্য। আমরা সেই পথে অগ্রণী সৈনিক। সভায় গান গেয়ে শোনান সীমা দত্ত, কবিতা পড়েন শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ, চিন্ময়ী দে প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়।

মাতৃভাষা দল

বিষয় ঃ বিপন্ন বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি দেশে বিদেশে।

অংশগ্রহণ করেছেন —

১। মনোজিৎ মণ্ডল	(হাওড়া)
২। দেবিকা বসু	(হাওড়া)
৩। প্রতাপ সিংহ	(কলকাতা)
৪। অসিত কুমার ভৌমিক	(উত্তর ২৪ পরগণা)
৫। রিক্তা দত্ত	(উত্তর ২৪ পরগণা)
৬। সমীর হাজরা	(উত্তর ২৪ পরগণা)
৭। সুদীপ কুমার ঘোষাল	(উত্তর ২৪ পরগণা)

সঞ্চালক — সুবোধ দত্ত চৌধুরী

উপস্থাপক ও সংযোজক — সোনালী দত্ত

মাতৃভাষা দলের বক্তব্য

১। বিশ্বায়ন ও আধুনিকীকরণের ফলে পশ্চিমবঙ্গ সহ অন্যান্য রাজ্যে মাতৃভাষা অবহেলিত হচ্ছে। হিন্দীভাষার প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। এর ফলে আমাদের মাতৃভাষা বিপন্ন।

২। পশ্চিমবঙ্গে তো বটেই, পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও যেখানে বাংলাভাষীরা আছেন, সেখানে বাংলাভাষা যথাযথ মর্যাদা পাচ্ছে না বলেই বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি বিপন্ন।

৩। ব্যবসায়িক তীর্থক্ষেত্র কলকাতায় বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের জড়ো হওয়ার ফলে কলকাতায় এবং আমাদের রাজ্যে বাংলাভাষা অনেক জায়গায় দ্বিতীয় ব্যবহারিক ভাষা হিসাবে চলে যাচ্ছে।

৪। অন্য ভাষায় আগ্রাসন বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির পিছিয়ে পড়ার কারণ।

৫। বাংলাভাষার বিকৃত উচ্চারণ বাংলাভাষাকেও বিকৃত করে চলেছে।

৬। বিভিন্ন টি ভি চ্যানেলে যেভাবে বাংলা অবহেলিত হচ্ছে সেটাও বাংলাভাষার বিপন্নতার কারণ।

৭। অন্য ভাষার সংস্পর্শে এসে অনেক ক্ষেত্রে বাঙালীরা তাদের নিজেদের ভাষাকেই অবহেলা করে যাচ্ছেন।

৮। নতুন বানান রীতির যথাযথ প্রচার এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কর্তব্য সাধন না করলে বাংলাভাষার জড়তা কাটবে না।

৯। বাংলাভাষীদের রাজ্যে বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র এবং কর্মক্ষেত্রে বাংলাভাষার ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

১০। ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষাদিবসকে বিদ্যালয়ে এবং বিদ্যালয়ের বাইরে যথাযথভাবে মর্যাদার সঙ্গে পালন করা প্রয়োজন।

১১। রাজ্যের সমস্ত স্টেশনে বাংলায় ঘোষণা এবং বাংলা লেখার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা উচিত।

১২। রবীন্দ্র জন্মদিবস আবশ্যিকভাবে ওই দিনটিতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পালন করা উচিত।

১৩। দপ্তরী ভাষা, কাজের ভাষারূপে বাংলাকে আবশ্যিক করা প্রয়োজন। থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে ইংরাজীতে নয়, বাংলাতেই অভিযোগ লিখিত হওয়া উচিত।



শিক্ষা ও সাহিত্যের সম্পাদক বিকাশ মণ্ডল ও আলোচনারত অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

১৪। শ্রেণিকক্ষে 'yes sir' এবং 'good morning' বর্জন করা উচিত।

১৫। নামফলকে সর্বত্রই বাংলা ব্যবহার করতে হবে।

১৬। বহির্বাংলায় (আসাম, ঝাড়খণ্ড, বিহার, আন্দামানে) বাংলাভাষার প্রচার ও প্রসার বাড়াতে হবে। পাঠ্যপুস্তক দানের যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

১৭। ত্রি-ভাষা সূত্রের প্রয়োগ করতে হবে।

১৮। অযথা ইংরেজী-প্রীতি ত্যাগ করতে হবে।

১৯। বিদ্যালয়ে নিয়মিত বিদ্যালয় পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে। প্রয়োজনে দেওয়াল পত্রিকা করতে হবে।

২০। ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে ওঠা ইংরেজী-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলো আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বহুল পরিমাণে গ্রাস করেছে।

২১। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আবার প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজী ভাষা চালু করলেও নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি যখন তা সমর্থন করছে না, আমরাও সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন বিষয়ে নিমরাজি হয়েছি। আমাদের 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকায় তার প্রতিফলন আরও বেশী করে থাকা উচিত।

২২। বিজ্ঞান ও অন্যান্য গবেষণার কাজে বাংলাভাষার চর্চাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২৩। ভাষাগত সাম্রাজ্যবাদ বাংলাভাষার বিপন্নতার অন্যতম কারণ।

২৪। 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকায় এ বিষয়ে আরও বেশী করে লেখা থাকা দরকার।

২৫। ভাষা সম্পর্কে বিষয়ভিত্তিক যে আলোচনা এখানে করা হল তা আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের কক্ষে আলোচনার জন্য তুলে ধরা হোক। এতে পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা বাড়বে।

ভাষাশহীদ কমলা ভট্টাচার্য দল

বিষয় ঃ 'শিক্ষা ও সাহিত্য' আজন্ম সমিতির সংগ্রামের হাতিয়ার। একে শানিত রাখুন।

অংশগ্রহণ করেছেন —

১। ডঃ শিরোমণি পান্ডা (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

২। অমল বন্দ্যোপাধ্যায় (নদীয়া)

৩। চিন্ময়ী দে (কলকাতা)

৪। সেবা চক্রবর্তী (হাওড়া)

৬। শিখা দত্ত (হাওড়া)

৭। জয়দেব চক্রবর্তী (উত্তর ২৪ পরগণা)

সঞ্চালক — শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ নদীয়া

উপস্থাপক ও সংযোজক — প্রশান্ত ধর

ভাষাশহীদ কমলা ভট্টাচার্য দলের বক্তব্য

১। 'শিক্ষা ও সাহিত্য' নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মুখপত্র। এটি সমিতিকে জন্ম থেকেই আন্দোলনের ভাষা যোগান দিয়ে চলেছে।

২। সংগ্রামের হাতিয়ার হওয়াই মুখপত্রের কাজ, যা 'শিক্ষা ও সাহিত্য' শুরু থেকেই করে চলেছে।

৩। সমস্ত সদস্যকে গ্রাহক করা প্রথম থেকেই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। এখনও তা পুরোপুরি সম্ভব হয়নি।

৪। সামাজিক বিবর্তনের সাথে সাথে সমিতির আন্দোলনেরও বিবর্তন ঘটছে এবং তার মুখপত্রেও লেগেছে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছোঁয়া।

৫। শিক্ষা ও সাহিত্যের দায়িত্ব সমিতির আন্দোলনমুখী কার্যক্রমের অভিমুখে নিজেকে পরিচালিত করা যার ফলশ্রুতি হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভাবনা এবং বামপন্থার আদর্শ।

৬। পরিবার, সমাজ এবং দেশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী

তথাকথিত বিশ্বায়ন ওরফে ভোগবাদ শুধু মূল্যবোধকেই ধ্বংস করছে না, শিক্ষাক্ষেত্রের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে বেসরকারীকরণের থাবা। এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে তাই পত্রিকার লেখক এবং পাঠকদের নতুন করে ভাবতে হবে এবং সমাধানের সূত্র খুঁজতে হবে।

৭। আজকের আলোচ্য বিষয় হোক (ক) সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, (খ) ধর্মনিরপেক্ষতা, (গ) গণতান্ত্রিক জীবনবোধ (ঘ) নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ধারণা, (ঙ) মানুষে মানুষে শোষণমুক্ত সম্পর্ক, (চ) সমাজের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থত্যাগ, (ছ) সমাজের তথাকথিত অনগ্রসর অংশের প্রতি কাম্য স্বীকৃতি ও সমন্বয়।

৮। বিশ্বায়নের উন্মত্ত হাওয়ায় মিডিয়া নিজেকে আটকে ফেলেছে ভ্রষ্টাচার, সেক্স ইত্যাদি মিথ্যা আকর্ষণের জালে এবং মিডিয়ার ক্ষমতা এমন অসীম। এরসঙ্গে লড়াই করতে গেলে চাই সমাজবীক্ষণের সঠিক চোখ এবং কলমের শক্তি।

৯। মূল সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে এবং সমাধান বিষয়ে এমনভাবে আলোচনা করতে হবে যাতে পাঠকশ্রেণী একটা স্পষ্ট পথনির্দেশ পান।

১০। প্রবন্ধ আরও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখতে হবে।

১১। মনে রাখতে হবে সকলেই কিন্তু বিদগ্ধ পাঠক নন, পাঠবিমুখ মানুষকেও আকৃষ্ট করতে হবে।

১২। গল্পের শুরুতে ইঙ্গিতপূর্ণ illustration থাকবে। মহামানবদের জন্মমাসে তাঁদের স্মরণ করতে হবে ও আদর্শকে তুলে ধরতে হবে।

১৩। বেসরকারীকরণের ফলে যে বিদ্যালয়গুলি অনুমোদন হারাচ্ছে, তার উৎস চিহ্নিত করার দায়িত্বও লেখককুলকে নিতে হবে।

১৪। পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে অধিক সচেষ্ট হতে হবে। মানুষ যাতে যন্ত্র থেকে 'মানুষ' হতে পারে তারজন্যে পত্রিকাকে মনের খোরাক যোগান দিতে হবে।

ভাষাশহীদ সালাম দল

বিষয় ঃ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা ও 'শিক্ষা ও সাহিত্যের লেখকদের ভূমিকা।

অংশগ্রহণ করেছেন —

১। শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

২। সিরাজুল ইসলাম (নদীয়া)

৩। শুভেন্দু চ্যাটার্জী (নদীয়া)

৪। সত্য সাউ (কলকাতা)

৫। ইন্দ্রাণী লাহিড়ী (হাওড়া)

৬। অলক মিত্র (উত্তর২৪ পরগণা)

৭। শুভজ্যোতি সেন (কলকাতা)

সঞ্চালক — জগন্নাথ ব্যানার্জী (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

উপস্থাপক ও সংযোজক-রামরমণ ভট্টাচার্য

ভাষাশহীদ সালাম দলের বক্তব্য

১। সমিতির গঠনতন্ত্রের ১৩নং ধারায় উল্লিখিত আছে যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চেতনা বিকশিত করা সদস্যদের মধ্যে এই আলোকে এককথায় নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, শিক্ষা ও সাহিত্যে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা বা সাহিত্যের বিভিন্ন রচনার অন্তরতম প্রদেশে আসল সৌরভ যেন এই থাকে যে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রই মুক্তির পথ। তবে এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি দরকার যে, রচনাগুলি প্রকৃত সাহিত্য সমন্বিত হয়, কেবল একপেশে স্লোগানধর্মী নয়।

২। সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের পতনের পর বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ মতাদর্শের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে এই ভাবনার সঞ্চার ঘটাতে চাইছে যে, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মতাদর্শগত প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে গেছে। বিপরীতে লগ্নীপুঁজির বিশ্বায়ন আমদানী করে 'TINA' স্লোগানটা হাজির করেছে কিন্তু এটা পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের শোষণের একটা কৌশল। শিক্ষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন রচনার লেখকের কলম দিয়ে যেন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। তবে সাহিত্যরস সমৃদ্ধ ও পাঠের আনন্দদানকারী রচনা হিসাবে উপস্থাপিত হয়।

৩। বিশ্বের অন্যান্য ভাষাসাহিত্যের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের উপরে ভিত্তি করে রচিত রচনাগুলির অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত।

৪। দেশপ্রেম জাগ্রত হতে এমন রচনা যার অন্তরলোকে থাকবে বৈদেশিক সমাজতন্ত্রের চেতনা প্রবন্ধই হোক বা কবিতা, গান, ছোট গল্প ইত্যাদির মধ্যদিয়ে প্রকাশিত হতে পারে।

৫। আমাদের মাতৃভূমির উপর সাম্রাজ্যবাদীদের নবতম শোষণের যে কৌশল প্রকাশিত হচ্ছে তার বিরুদ্ধে সুচিন্তিত রচনা শিক্ষা ও সাহিত্যে আরো বেশী বেশী করে লিখিত হওয়া উচিত।

৬। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পড়ে শোনানো যায় এমন রচনা প্রকাশিত হোক।

ভাষাশহীদ রফিক দল

বিষয় ঃ বিশ্বায়নী থাবায় আক্রান্ত শিক্ষা ও সংস্কৃতি।

অংশগ্রহণ করেছেন —

১। অলক ভট্টাচার্য (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

২। নুরুল ইসলাম (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

৩। কিংশুক চক্রবর্তী (নদীয়া)

৪। শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (নদীয়া)

৫। তপন মন্ডল (কলকাতা)

৬। সমর ভট্টাচার্য (উত্তর ২৪ পরগণা)

সঞ্চালক ঃ সীমা দত্ত (কলকাতা)

উপস্থাপক ও সংযোজক সমীর ভট্টাচার্য



লেখক-পাঠকসভায় মঞ্চে উপবিষ্ট সমিতির নেতৃবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞগণ।

ভাষাশহীদ রফিক দলের বক্তব্য

১। বিশ্বায়নের নাম করে যে ঝড় আজ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে তোলপাড় করছে, আমরাও তার শিকার। বিশ্বায়নের দালাল বিভিন্ন বিজ্ঞাপন সংস্থা, প্রচারমাধ্যম আমাদের জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বিষয়গুলিতে প্রবেশ করেছে। আক্রমণ করছে আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে। আমাদের এতদিনের বহন করা মূল্যবোধের ওপর আনছে চরম আঘাত। মধ্যবিত্ত মানুষ এই ঝড়ের দাপটে জীবনবোধকে উল্টেপাল্টে ফেলছে। শিক্ষাকে পণ্য মনে করে যে কোন মূল্যে নিজের সন্তানদের তথাকথিত ভালো স্কুল, ভালো শিক্ষক সরবরাহ করতে চাইছেন। আমরা অর্থাৎ বাবা-মা, শিক্ষক-শিক্ষিকারা কখনও জেনে কখনও অজান্তে এই বিশ্বায়নকে প্রশ্রয় দিয়ে ফেলছি। এই পুঁজিবাদী সভ্যতার জালে শিক্ষা বিষয়টি জড়িয়ে পড়ছে।

আমাদের শিক্ষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে এটাই প্রচার করতে হবে যে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটাতে পশ্চিমবঙ্গের সচেতন শিক্ষিত মানুষই যথেষ্ট। ঐসব অর্থকরী এবং প্রতারক প্রতিষ্ঠানগুলি যে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অমানুষ করে তুলবে তা বিভিন্ন লেখার মধ্যদিয়ে আমাদের প্রতিফলিত করতে হবে। অন্তঃসারশূন্য অর্থোপার্জনের যন্ত্র মানুষ তৈরী করতে আমরা চাই না — এটা আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

২। আমরা জানি, বিশ্বায়ন কী। তা কত নিঃশব্দে আমাদের প্রভাবিত করে। আরো চাই, আরো চাই, আরও আরও................প্রত্যাশার শেষ নেই, কিন্তু সঠিকপথে আমাদের প্রত্যাশাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সুনিয়ন্ত্রণের আত্মসংযমের মাধ্যমে, না হলেই হতাশা আসবে। শিক্ষাক্ষেত্রে হতাশা ও তার কুফল, উপার্জন ক্ষেত্রে হতাশা ও তার কুফল সম্বন্ধে পত্রিকায় যুক্তিবাদী, বস্তুনিষ্ঠ লেখা প্রকাশ করতে হবে। পত্রিকা তার ভূমিকায় হবে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা। আমাদের সদস্যদের মধ্যে যথেষ্ট দক্ষতা আছে, তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে হবে।

৩। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিভিন্নভাবে আঘাত আসছে। আজকাল একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় 'generation gap'. কোনকালেই বাবা, দাদু, ছেলে একসঙ্গে জন্মায় না। তাহলে আজ কেন 'generation gap'-এর দোহাই ? আমরা কেউই স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের কর্তব্য হয়তো বা সঠিকভাবে করছি। আমি যে সম্মান গুরুজনদের প্রদর্শন করি না তা আশা করি কেন উত্তরসূরীদের কালে। Hello, Hai, Thank you সহবতের শেষ কথা বলে না। আমেরিকায় সংস্কৃতির সংস্পর্শে নিজেদের ঐশ্বর্যপূর্ণ ঐতিহ্য হারিয়ে ফেললে চলবে না। একথা শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন নাটক-গল্পে প্রতিফলিত হলে তা অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে।

৪। সঙ্গীত-নৃত্য-আবৃত্তি এসব বিষয়গুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন আজ খুব লক্ষ্য করা যায়। প্রচারসর্বস্ব সংস্কৃতি চর্চা, 'গান শুধু গান', 'ভালবাসি তাই গাই' কিংবা 'Indian Idol'-এর জন্য ছোটাছুটি। তিনদিন সংস্কৃতি চর্চা করেই গান, আবৃত্তিকার, নৃত্যপটীয়সী বা নায়ক-নায়িকা, এই চর্চার মূলে কুঠারাঘাত করতেই হবে। শিক্ষা ও সাহিত্যে

আমাদের সংস্কৃতির মূল প্রস্রবনের ধারাগুলি মানুষকে জানাতে হবে। প্রতিবাদ এবং প্রতিরোধ ছাড়া এগুলি 'taken for granted' হিসাবে ছেড়ে দিলে আমরা শিক্ষককুলের মর্যাদা রাখতে পারব না। পাশ্চাত্য অর্থাৎ আমেরিকান সংস্কৃতির নাচ-গান-দেহভঙ্গী আমরা সমর্থন করতে পারব না। এর কুপ্রভাবগুলি শিক্ষা ও সাহিত্যে উল্লেখ করতেই হবে।

৫। আজকাল সংস্কৃতির একটি ধারা রসবোধ এবং তার প্রকাশের শেষকথা হাসি আমাদের মধ্যে থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা তৈরী করছি কৃত্রিম হাসির আখড়া—আমরা এতে অংশগ্রহণের ঘোর বিরোধী। শিক্ষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে বিভিন্ন হাস্যরসাত্মক বিষয় উপস্থাপন করতে হবে।

৬। জাতীয় সংহতির কথা বিবেচনা করে বিভিন্ন প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক সংস্কৃতি-উৎসবের কথা শিক্ষা ও সাহিত্যে উল্লেখ করতে হবে। এ সকল বিষয়ের রচনায় পত্রিকা সমৃদ্ধ হলে তা ভারতীয় সংহতির পক্ষে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

ভাষাশহীদ বরকত দল

বিষয় ঃ বামফ্রন্টের শিক্ষানীতি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ এবং তার সুফল ঃ শহর ও গ্রামে।

অংশগ্রহণ করেছেন —

১। ধ্রুবজ্যোতি সিন্‌হা (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)
২। নির্মল বসু (নদীয়া)
৩। জন্মেঞ্জয় দে (নদীয়া)
৪। রণজিত মজুমদার (কলকাতা)
৫। মণিরুল ইসলাম (হাওড়া)
৬। সায়ক দত্ত চৌধুরী (হাওড়া)

সঞ্চালক — শিখা বিশ্বাস (কলকাতা)
উপস্থাপক ও সংযোজক-দীননাথ সেন

ভাষাশহীদ বরকত দলের বক্তব্য

সাফল্য

১। উনিশশো সাতাত্তর সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে বামফ্রন্ট সরকার গঠন করে। প্রতিটি দলই সরকারে আসীন হবার পর তাদের মতাদর্শ বাস্তবে প্রয়োগ করবার চেষ্টা করে। বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সুনিশ্চিত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ছাড়া শিক্ষা সার্বজনীন হয় না। তাই প্রথমেই বামফ্রন্ট গ্রামে-গঞ্জে ভূমিসংস্কার ঘটিয়ে অর্থনীতিতে একটা সমতা আনবার চেষ্টা করে। যার ফলে আজ গ্রামে-গঞ্জে ও শহরের অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশেও শিক্ষার প্রসার ঘটেছে।

২। বামফ্রন্টের শিক্ষানীতির মূল কথা হলো 'সকলের জন্য শিক্ষা।' এই নীতি যে যথেষ্ট সার্থকতা পেয়েছে তা আমরা প্রতিবছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যাবৃদ্ধিতেই তা প্রকাশিত। বামফ্রন্টের সাফল্যগুলি সূত্রাকারে বর্ণনা করছি।

(ক) বামফ্রন্ট সরকারে আসীন হবার পর প্রথমেই প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক করবার ফলে শিক্ষা আজ প্রায় সর্বত্রগামী।

(খ) বামফ্রন্ট আসবার পরে দেশে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম অরাজকতা বিরাজ করত। তার ফলে পরীক্ষা ও পঠন-পাঠন বিপর্যস্ত হত। বামফ্রন্ট সেই অরাজকতা দূর করতে পেরেছে, শিক্ষাব্যবস্থায় একটা স্থিতিশীলতা এসেছে। সেটাও মানোন্নয়নে সাহায্য করেছে। গ্রাম-শহরে সর্বত্র শিক্ষার আলো পৌঁছতে পারছে।

(গ) বামফ্রন্ট এসে শিক্ষার পরিকাঠামো বদল করতে পেরেছেন এবং দেরিতে হলেও পাঠক্রম-পাঠ্যসূচিতে বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন ঘটাতে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়তে বাধ্য।

(ঘ) সাক্ষরতা আন্দোলনের প্রভাবও আমরা দেখতে পাচ্ছি শিক্ষাক্ষেত্রে যথেষ্ট পড়েছে।

সীমাবদ্ধতা

এত সাফল্য থাকলেও সব কাজেরই কিছু না কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে। এবারে সীমাবদ্ধতাগুলি সূত্রাকারে আলোচনা করছি।

(ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় থাকবার ফলে মানুষের মধ্যে দীর্ঘদিনের পোষিত কুসংস্কার, সাম্প্রদায়িকতা বোধ, ঔপনিবেশিক মানসিকতা আমাদের প্রভাবিত করে। তার ফল আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে পড়তে দেখেছি।

(খ) শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় এখন যা হচ্ছে তা যথেষ্ট নয়। আরও ব্যয় ও বাস্তবমুখী হলে ভাল হয়।

(গ) শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে ভাষানীতি একটি জরুরি বিষয়। সকলের জন্য শিক্ষা কার্যকর করতে হলে মাতৃভাষার ব্যবহার আরও প্রাঞ্জল করতে হবে।

ভাষাশহীদ জব্বার দল

বিষয় ঃ চাই সার্থক রচনা — চাই পাঠক, অবশ্যই সু-পাঠক।

অংশগ্রহণ করেছেন

১। গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায় (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)

২। সুশান্ত দাস (হাওড়া)

৩। নবকুমার সরকার (হাওড়া)

৪। অরুণ কুমার সেনগুপ্ত (উত্তর ২৪ পরগণা)

সঞ্চালক — তরুণ সরকার (দক্ষিণ ২৪পরগণা)

উপস্থাপক ও সংযোজক — অশোক অধিকারী

ভাষাশহীদ জব্বার দলের বক্তব্য

১) 'শিক্ষা ও সাহিত্য' পত্রিকায় যেহেতু প্রথমেই শিক্ষা কথাটা আছে, শিক্ষার বিষয়টা বিশেষ করে নতুন সিলেবাস সম্পর্কে লেখা থাকা দরকার। পর্ষদ ও কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্পর্কে জীবনশৈলিও জানানো দরকার। যদিও 'অভিমত' বেরিয়েছে কিন্তু পত্রিকায় দেওয়া দরকার।

২) আমাদের বিষয় চাই সার্থক রচনা — চাই পাঠক, অবশ্যই সু-পাঠক। নতুনরা অনেকেই লিখছেন, লেখা ছাপানো হচ্ছে না। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান রেখেই বলছি একই লেখকের লেখা প্রায় সংখ্যাতেই থাকে কিন্তু নতুন লেখকের লেখা বেরোচ্ছে না। প্রস্তাব, অন্তত প্রাপ্তিস্বীকার করে একটা ছাপানো ফর্মা করে জানানো হোক আপনার লেখা পেয়েছি কিন্তু এই কারণে ছাপানো গেল না। তবে নতুনরা উৎসাহিত হবেন।

৩) পাঠকের কলম পাল্টে পাঠকের মতামত বললে ব্যাপ্তিটা বাড়ে এবং এই কলমে কেবলমাত্র প্রশংসা করে লিখলে ছাপা হবে আর সমালোচনা করে লিখলে ছাপা হবে না এটা যেন না হয়। তবে সমালোচনা গঠনমূলক হতে হবে।

৪) 'সমিতি সংবাদ'-এ শুধুমাত্র ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, বার্ষিক সাধারণ সভা এইসব না ছাপিয়ে বিভিন্ন জেলা কী ধরনের নতুন নতুন কর্মসূচি নিচ্ছে বা পালন করছে তা থাকলে গোটা রাজ্যের খবর প্রত্যেকে জানতে পারেন।

৫) শিক্ষা ও সাহিত্য অবশ্যই শুধু শিক্ষককুলের জন্য নয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আমাদের এই হাতিয়ারের গ্রহণযোগ্যতা আছে। আছে বলে আত্মতৃপ্তিতে না ভুগে আরও কী করে প্রসারিত করা যায়, তার উদ্যোগ আমাদের নিতে হবে।

৬। নির্বাচন সম্মুখে — এই পরিস্থিতিতে শিক্ষা ও সাহিত্যে সর্বস্তরের মানুষের কথা বর্তমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় আমাদের রাজ্যের অবস্থা — তথ্যসমৃদ্ধ এই বিষয়ের লেখা দরকার আছে বলে আমরা মনে করি।

৭। রাজ্য, অঙ্গরাজ্য ও বিদেশের শিক্ষাসংক্রান্ত সংবাদ পত্রিকার মাধ্যমে প্রকাশের মধ্যদিয়ে পত্রিকাকে আকর্ষণীয় করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থান, ছুটি সংক্রান্ত বা বিভিন্ন সময়ে বিতর্কের ক্ষেত্রে অন্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের অবস্থান কী তা প্রকাশের ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

৯। সর্বোপরি নতুন নতুন শিক্ষক নিযুক্ত হচ্ছেন তাই 'শিক্ষা ও সাহিত্যে' এ বি টি এ-র সংক্ষিপ্ত জন্ম ইতিহাস বারে বারে খুব ছোট করে হলেও দেওয়া দরকার।

১০। পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব বৃদ্ধি পেলেও বানান সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন। বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসৃত হোক।

১১। আধুনিক বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তিগত যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে চলেছে আমাদের রাজ্যেও ঘটেছে তার অনিবার্য প্রতিফলন। ফলে প্রতিদিনের জীবনযাত্রা, জীবনধারা, জীবনবোধের ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়ছে, প্রভাব পড়েছে সমাজ জীবনেও, বদলে যাচ্ছে চিরন্তন মূল্যবোধও। বাড়ছে আত্মকেন্দ্রিকতা। আজকের এই সংকটের চিত্র এই সময়ের ভাবনা 'শিক্ষা ও সাহিত্যে'র পাতায় থাকা প্রয়োজন।

১২। লেখা হোক জনহিতকর, যথার্থ সততায় পূর্ণ রচনা।

১৩। শুধুই সার্কুলার নয়, সমস্ত ধরনের লেখারই পাঠক প্রয়োজন।

প্রতিবেদন

মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নূতন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিখন ও মূল্যায়ন কর্মশালা

(অংশগ্রহণমূলক)

প্রথম পর্যায় ঃ প্রেসিডেন্সি বিভাগ

১১ই ফেব্রুয়ারি-১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৬

সত্যপ্রিয় ভবন, কলকাতা



পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নূতন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিখন মূল্যায়ন কর্মশালার উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করছেন
মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মাননীয় দিব্যেন্দু বিকাশ হোতা।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের নূতন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী শিখন ও মূল্যায়ন নিয়ে ৩ দিনের (১১ই ফেব্রুয়ারি-১৩ই ফেব্রুয়ারি) একটি অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা সম্প্রতি শেষ হল সত্যপ্রিয় ভবনে। এটি প্রেসিডেন্সি বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে প্রথম পর্যায়ের কর্মশালা। কর্মশালার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি অধ্যাপক দিব্যেন্দু বিকাশ হোতা। উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং প্রশান্ত ধর, সুমন রায়, সনৎ ঘোষ প্রমুখ প্রাজ্ঞজন ; এছাড়াও ছিলেন সমিতির সহ-সভাপতি মোজাম্মেল হক।

উদ্বোধনী ভাষণে দিব্যেন্দু বাবু পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং শিক্ষার উপর আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য সমিতিকে ধন্যবাদ জানান। মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমের পরিবর্তনের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও তুলে ধরেন তিনি। সাধারণ সম্পাদক সমিতির আদর্শ এবং কর্মধারার সঙ্গে এই ধরনের কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় বলে জানান। স্বাগত ভাষণ দেন উৎপল রায়, সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদক। উপস্থিত সকল বক্তাই জোর দেন সামর্থ্যভিত্তিক, সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষার উপর।

৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণির সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন প্রশ্নপত্রের নমুনা তৈরি ও ৯ম থেকে ১০ম ও মাধ্যমিক পরীক্ষার সামর্থ্যভিত্তিক প্রশ্নপত্র রচনার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিচালিত হয় কর্মশালা। বিষয়ভিত্তিক আলোচনা ও সক্রিয়তার ভিত্তিতে ৭টি বিষয়ের উপর মতবিনিময় ও নমুনা প্রশ্নপত্র রচনা করেন দলের সদস্য/সদস্যাবৃন্দ। বাংলা বিষয়ের পরিচালক ছিলেন দীননাথ সেন। সঞ্চালক ডঃ নুরুল ইসলাম। ইংরাজী বিষয়ের পরিচালক ছিলেন সমীর ভট্টাচার্য ও সুময় রায়। সঞ্চালক রত্না রায়। অঙ্ক বিষয়ের পরিচালক ছিলেন চন্ডীদাস পাল ও জয়দেব সান্যাল। সঞ্চালক দেবাশিষ দে। ভৌত বিজ্ঞান বিষয়ের পরিচালক ছিলেন সনৎ ঘোষ ও বিনয়কুমার সরকার। সঞ্চালক ভাস্করচন্দ্র মণ্ডল। জীবন বিজ্ঞান বিষয়ের পরিচালক ছিলেন গৌতম ঘোষ ও অরূপ সেনগুপ্ত। সঞ্চালক সজল বিশ্বাস। ইতিহাস বিষয়ের পরিচালক ছিলেন শিপ্রা ভট্টাচার্য। সঞ্চালক অভ্রকেতন ভট্টাচার্য। ভূগোল বিষয়ের



শিখন ও মূল্যায়ন কর্মশালার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখছেন সহকারী সাধারণ সম্পাদক উৎপল রায়।

পরিচালক ছিলেন মাধবী বসু। সঞ্চালক কল্যাণকুমার ঘোষ। প্রথমদিনের অর্ধাংশ ও দ্বিতীয় দিন গোটাটাই সকলে মূল্যায়নপত্র রচনার কাজে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলেন। বিষয়ভিত্তিক প্রশ্নপত্র বিশেষত ৬ষ্ঠ-৮ম যে কোনো একটি শ্রেণির ১টি করে বিষয়ের প্রশ্নপত্র দলগুলি তৈরি করে। পরে প্রত্যেক বিষয়ে ৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা ও ১০ম শ্রেণির টেস্ট পরীক্ষার জন্য একাধিক সামর্থ্যভিত্তিক মূল্যায়ন পত্রও রচনা করেন তাঁরা। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য 'এই কর্মশালার অভিজ্ঞতাকে আমি কীভাবে কাজে লাগাব' শিরোনামে একটি একপাতার পরিকল্পনা লেখার পাতা সরবরাহ করা হয়।

শেষদিনে দলগত অনুশীলন শেষে সামগ্রিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে দলনেতারা তাঁদের লিখিত অভিমত সভায় পেশ করেন। দ্বিতীয়পর্বে বাংলা বানানবিধি ও ৯ম শ্রেণির নূতন পাঠক্রমের উপর আলোচনা করেন অন্যতম আলোচক ডঃ নির্মল দাশ। পরে অংশগ্রহণকারীদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেন সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও তিনদিনের কর্মশালার ওপর দলগুলির আলোচনার ভিত্তিতে সামগ্রিক মূল্যায়ন করেন সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক (শিক্ষা) উৎপল রায়। এই পর্বে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতি মোজাম্মেল হক।



বাংলা বানানবিধি ও নবম শ্রেণির পাঠক্রমের ওপর আলোচনা করছেন ডঃ নির্মল দাশ।

প্রতিবেদক ঃ **অশোক অধিকারী**
সোনালী দত্ত

প্রতিবেদন

বুশ বিরোধী বিক্ষোভ সমাবেশ



গত ১লা মার্চ, মঙ্গলবার বিকাল ৫-৩০টায় বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলি ধর্মতলা থেকে এক বিশাল বুশবিরোধী মিছিল সংগঠিত করে। বুশের ভারত আগমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, ট্যাবলো সহকারে সুসজ্জিত এই মিছিল গিয়ে শেষ হয় মার্কিন দূতাবাসের সামনে। এই মিছিলে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সদস্যরাও বুশ বিরোধী ব্যানার ও ফেস্টুন সহকারে অংশ নেন। মিছিলে সোচ্চার কণ্ঠে উচ্চারিত হয় — 'বুশ গো ব্যাক', 'কিলার বুশ গেট আউট', 'মানবতার শত্রু বুশ ভারত থেকে দূরে হঠো', 'পৃথিবী মানুষের জন্য দানবের জন্য নয়'। মিছিল শেষে মার্কিন দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সি আই টি ইউ-এর রাজ্য সভাপতি শ্যামল চক্রবর্তী বলেন, ইউ পি এ সরকার যাতে মার্কিনী প্রসাদের লোভে স্বাধীন বিদেশ নীতি বিসর্জন না দিতে পারে, তার জন্য বামপন্থীদের নেতৃত্বে শ্রমিক-কর্মচারীদের আন্দোলনের চাপ রাখতে হবে। সি আই টি ইউ-এর রাজ্য সম্পাদক কালী ঘোষ কেন্দ্রীয় সরকারের মার্কিন তোষণ নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। এছাড়াও ঐ সভায় বক্তব্য রাখেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী, ১২ই জুলাই কমিটির নেতা চুনীলাল দাশগুপ্ত, এ আই টি ইউ সি নেতা পল্টু দাশগুপ্ত, টি ইউ সি সি নেতা এস এন তেওয়ারি, ইউ টি ইউ সি নেতা অশোক ঘোষ, ইউ টি ইউ সি (এল এম) নেতা দিলীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভা শেষে বুশ বিরোধী স্লোগানে সোচ্চার হন উপস্থিত কয়েক হাজার মানুষ।



স্মৃতিচারণা

প্রিয় কমরেড শিবপ্রসাদ বাবু,

পরপর দুদিন দুজন প্রিয়জনের জীবনাবসানের সংবাদ বয়ে নিয়ে এলো 'গণশক্তি'—চিনুদি এবং অক্ষয়দা। স্বজন হারানোর ব্যথা বুকে নিয়ে স্মরণ করছি এঁদের।

'৫৪-এর আন্দোলনের' দীপশিখাগুলো নিভে যাচ্ছে একে একে। স্মৃতি ভারাক্রান্ত হচ্ছে। ফিরে যাচ্ছে অতীতে।

চিনুদির সঙ্গে প্রথম দেখা ধর্মতলার আন্দোলন শিবিরে। সবে শিক্ষকতায় যোগ দিয়েই প্রয়াত সত্যপ্রিয় রায়-অনিলা দির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য এবং আকর্ষণে, তৎকালীন অন্যতম নেতৃত্ব কমরেড সুনীল মুখার্জির প্রেরণায় জড়িয়ে পড়েছি সেই ঐতিহাসিক শিক্ষক আন্দোলনে। খিদিরপুর অঞ্চলে বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে আন্দোলনের বার্তা পৌঁছে দেওয়া আর অবস্থান শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষক নেতাদের দেখভালের দায়িত্ব ছিল আমাদের কয়েকজনের ওপর। সেই কাজে সঙ্গী ছিল ছাত্র আন্দোলনের নেতা শ্যামল রায়। পরবর্তীকালে দক্ষিণ কলকাতার মোহিনীমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করার পর দক্ষিণ কলকাতা মহকুমার শিক্ষক সংগঠন গড়ে তোলার কাজে সে আমাদের অন্যতম সাথী হয়। কর্মরত অবস্থায় সমিতির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য হিসেবেই তাকে আমরা হারাই।

এই শিবিরেই ঘনিষ্ঠতা চিনুদির সঙ্গে। সুদর্শনা মিষ্টিভাষী স্নেহময়ী চিনুদি অল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের কাছে টেনে নেন। তারপর থেকে কলকাতা ছেড়ে বীরভূম চলে আসা পর্যন্ত কতোদিন তাঁর প্রাণোচ্ছল সান্নিধ্য পেয়েছি। মনে পড়ে সর্বভারতীয় শিক্ষা আন্দোলনে ট্রেনের সংরক্ষিত আসনে কটাদিন অত্যন্ত কাছ থেকে দেখেছি, এককামরায় থেকেছি সত্যপ্রিয় রায়, অনিলাদি, গোলোকদা, রথীনদা, চিনুদি, অমিতাভ সেন, দীপক গুহ, শ্যামল রায়, অজিত সেন প্রমুখকে। এঁদের সস্নেহ আন্তরিকতায় অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। সমিতি ছিল আমাদের প্রাণস্বরূপ। প্রায় রোজই আমরা স্কুলের পর যেতাম সমিতি কার্যালয়ে। সেখানে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আসতেন চিনুদি। খাওয়া হতো মুড়ি-তেলেভাজা। কত আন্তরিক গল্প হতো চিনুদির সঙ্গে। মুক্ত মনের মানুষ ছিলেন তিনি। অসংকোচে আমরা খুলে দিতে পারতাম আমাদের মনের দরজা তাঁর কাছে। কতো সংকটের কালে তাঁকে আমরা পেয়েছি কাছের মানুষ হিসেবে। বন্ধুসুলভ পরামর্শ দিয়ে তিনি আমাদের আশ্বস্ত করতেন। চিনুদিকে হারিয়ে তাই আমরা অনুভব করছি স্বজন হারানোর ব্যথা। সমিতির সদস্যবন্ধুদের সঙ্গে, তাঁর পরিজনদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি সাথী হারানোর ব্যথা।

সেই সঙ্গে হারালুম '৫৪-র শিক্ষক আন্দোলনের আর এক সাথী অক্ষয়দাকে। তিনি তখন নেতাজীনগর হাইস্কুলের শিক্ষক। রঞ্জিতদা (গুহ), নন্দদা (গোস্বামী)-দের সঙ্গে অক্ষয়দাও আসতেন অবস্থানে যোগ দিতে। সেখানেই আলাপ। পরবর্তীকালে বিভিন্ন আন্দোলনের কর্মসূচিতে একসঙ্গে কাজ করতে করতে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে। শান্ত, সদালাপী অক্ষয়দা ছিলেন সকলেরই বন্ধু। কতো হৈ চৈ করে কাটতো সেই দিনগুলো। আজ এঁরা সকলেই প্রয়াত।

স্মৃতিভার নিয়ে স্মরণ করছি এঁদের। আপনার মাধ্যমে সমিতির বর্তমান সদস্যবন্ধুদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি আমার বেদনা, পুরোনো দিনের কিছু স্মৃতিকথা। আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা, প্রয়াত নেতৃদ্বয়ের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা এবং তাঁদের পরিবারবর্গের উদ্দেশ্যে সমবেদনা জানাচ্ছি।

অভিনন্দন সহ,

বিশ্বরূপ কাঁঠাল

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

নলহাটী হরিপ্রসাদ হাইস্কুল, বীরভূম

ছড়ায় গাঁথা দূষণ কথা

সিরাজুল ইসলাম। সরোজ পাবলিকেশনস্। ১বি, কলেজ রো। কলকাতা-৯

ছড়াদূষণ নয়। ছড়ায় গাঁথা দূষণ। সাম্প্রতিক সময়ে এধরনের সামাজিক অপকর্ম নিয়ে পদ্য-গদ্য দু'ধরনের লেখাই আমাদের নজরে আসে। গদ্য রচনায় তথ্যের একটি নিবিড় বুনন থাকে। সেখানে মনোবীক্ষণিক নিবেশ বিশেষ অর্থে জরুরী। নইলে যা বলতে চাওয়া হচ্ছে তার অনেকটাই অধরা থেকে যায়। পদ্যের ক্ষেত্রে অতটা দায় থাকেনা। বিজ্ঞানসম্মত তথ্য চালান করার ক্ষেত্রে কিছুটা অজাত উপলক্ষ্য এসে পড়ে ছন্দে। যা ভারাক্রান্ত করে না পাঠোদ্ধারকে। কিন্তু নেহাতই বিজ্ঞানের নোট বই ভেবে কাগজ কলম মন নিয়ে বসলে কিছুটা হতাশ হতেই হয়। এখানে মনস্কতার ঝুলিতে সঞ্চিত হয় আবেগ, ছন্দ আর হালকা তথ্যের রেশ। সিরাজুল ইসলামের 'ছড়ায় গাঁথা দূষণ কথা' পড়তে পড়তে আবার লিখতে লিখতে কথার পিঠে কথা বেড়ে যায়। সিরাজুল অনেকদিন ধরেই লিখছেন। তাঁর লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় অপেক্ষা সখ্যতা বলতেই আমি ভালোবাসি বেশ কিছুদিনের। বইটির নান্দীমুখ অংশে সিরাজুল লিখেছেন ' ছোট ওরা বড় হোক/ আমরাও খুশি তো/ তারপরে থাকবে না/ পরিবেশ দূষিত'। খুব সত্য কথা। ছোটদের বড়ো হওয়াটা যেমন আজ বেশি জরুরী (শুধু দেহসৌষ্ঠবে নয়) তেমনই পরিবেশ সুস্থ রাখাটা আরো বেশি প্রয়োজন। আমরা অনেকেই ছোট হয়েও পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে বেশ বড়সড়। আবার বড়ো হয়েও পরিবেশ রক্ষার ব্যাপারে বেশ ছোট। ২৪টি ছোট বড়ো ছড়ার মধ্যে সবকটিই যে দূষণ কথা নিয়ে তা বলা যাবে না। যেমন 'ছুটির সকাল' কিংবা 'মেরিট লিস্ট' দুটি ভিন্নধর্মী অতি বাস্তব ছড়া। এখানে একটি যদি 'হলুদ রোদে ভরা' ছুটির সকাল অন্যটি তেমন আদ্যন্ত মূল্যবোধের মোড়কে ছোট'র বড়ো হয়ে যাবার কথা। আবার তাঁর 'ইচ্ছেডানা' ডানায় ভর করে উড়ে বেড়ানো এক নিঝুম দুপুরের শাল পাতার বাঁশি। যা সেই শিশুর মুখ দিয়ে বলিয়ে ছাড়ে 'ভাল্লাগেনা শুধুই পড়া, খেলতে মানা/ ও পাখি তুই ধার দে আমায় দুইটি ডানা'। এবার ছন্দের কথায় আসি। কবির অন্তঃমিলের হাত ভাল। তবে ছড়ার ক্ষেত্রে শুধু একপ্রকার ছন্দের ব্যবহারে আমাদের টানা একঘেয়েমি অস্বীকার করা যায় না। কবিকে ভিন্নধর্মী ছড়ার ছন্দ নিয়েও কাজ করতে বলি। বইটি আদ্যোপান্ত রঙিন মোড়কে হাতে নিলেই নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছা করবে। শিশুপাঠ্য হিসাবে এর কদর আর একটু বেশি। প্রতি ছড়ার সংগে ছবি সংযোজন আর একটি অতিরিক্ত পাওনা। বইয়ের প্রচ্ছদ প্রাসঙ্গিক। দৃষ্টি নন্দন। ছাপা ভালো। মুদ্রণপ্রমাদ নেই। সকলের হাতে তুলে দিতে গেলে, বই-এর মূল্যমান সূচক আর একটু নিচে রাখলে ভালো হোত। বইটির বহুল প্রচার কামনা করি। এ ধরনের আরও ছড়া তিনি লিখুন।

—অশোক অধিকারী

পাঠকের কলমে

মাননীয় সম্পাদক, শিক্ষা ও সাহিত্য

ফেব্রুয়ারি, ০৬ অর্থাৎ এমাসের সংখ্যাটি ভাষাচর্চা বিষয়ক সংখ্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে জেনে ভালো লাগছে। সঠিক এবং সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত এটি। সম্পাদনা, সচেতনতা প্রশংসনীয়। আজকের বিশ্বায়নে এবং ভোগবাদের লেলিহান শিখায় আমাদের বঙ্গসংস্কৃতির ভাষা, সাহিত্য, বাঙালিয়ানা প্রভৃতি কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে তার নানাদিক তুলে ধরুন 'শিক্ষা ও সাহিত্য'-এ। এই প্রত্যাশাটুকু রাখছি। কারণ আমাদের দাবী আপনারাই মেটাতে পারেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস জিন্দাবাদ। ২১শে ফেব্রুয়ারি জিন্দাবাদ।

ভাষা-শুভেচ্ছাসহ

জীবনকুমার সরকার

শিক্ষক, বিরামপুর এ এস বিদ্যামন্দির, মুর্শিদাবাদ

●

মাননীয় সম্পাদক, শিক্ষা ও সাহিত্য

আমি বরাবর শিক্ষা ও সাহিত্য পত্রিকাটি পড়ি। গত জানুয়ারী, ২০০৬ সংখ্যাটি হাতে পেয়েছি। ক্রমাগত এ পত্রিকাটি পর পর নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারছে নানাদিক থেকে। পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির করাল থাবা থেকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি প্রতি বৎসর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। সত্যিই এটা খুবই প্রশংসার দাবী রাখে। এবারও ১৩-১১-২০০৫ তারিখ কলকাতার সেন্ট পলস স্কুলে রাজ্যস্তরের এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় চারশত ছাত্র-ছাত্রী ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। অনেক শিক্ষক ও বিশিষ্ট লোকজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির এই সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় কেবলমাত্র বাংলা, হিন্দি ও উর্দু ভাষাতেই নির্বাচিত আবৃত্তি, সঙ্গীত, গল্প-বলা, প্রবন্ধ ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতার নিয়ম বা রীতি বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, গত ২২-১২-২০০৩ সালে "সাঁওতালী ভাষা" সংবিধানের অষ্টম তপশিলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পরেও আজ পর্যন্ত সাঁওতালী ভাষায় এর কোনোটাই করতে দেওয়া হয় না। অথচ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দেখলে দেখা যাবে, রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলে প্রচুর সাঁওতালী ভাষা-ভাষীর ছাত্র-ছাত্রী আছে। এমনকি অনেক সাঁওতাল শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী এই এ বি টি এ সংগঠনের ছত্রছায়ায় আছেন। এইভাবে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ঐ সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভাকেই শুধু অবজ্ঞা করা হয়নি ; পৃথিবীর আদিম জাতির আদিম ভাষার সংস্কৃতিকে গুরুত্বহীন ভেবে, তাকে দূরে ঠেলে ফেলা হয়নি কি ?

নমস্কারান্তে,

সোম কিস্কু

শিক্ষক, রাজারামপুর উচ্চবিদ্যালয় (উচ্চমাধ্যমিক), মুর্শিদাবাদ

●

মাননীয় সম্পাদক
'শিক্ষা ও সাহিত্য'
নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি
মহাশয়,

আমাদের প্রিয় মুখপত্র শিক্ষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রকাশিত বাংলা বিষয়ে নমুনা প্রশ্ন পত্রের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অংশে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের যে নমুনা দেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে সংসদ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নমুনা প্রশ্নপত্রের দশ পৃষ্ঠায় ১২ (গ) প্রশ্নে বলা হয়েছে ঃ

"চৈতন্যদেবের জন্মসাল ও মৃত্যুসাল লেখো, তাঁকে নিয়ে জীবনী লিখেছেন এমন একজন কবি ও তাঁর কাব্যের নাম উল্লেখ করো।"

লক্ষ্যণীয় এই প্রশ্নের জন্য পরীক্ষার্থীদের চারটি উত্তর লিখতে হবে। অর্থাৎ চৈতন্যদেবের জন্মসাল, মৃত্যুসাল, একজন জীবনীকারের নাম এবং তাঁর কাব্যের নাম। এই চারটি উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে '১' নম্বর। আমাদের প্রশ্ন হল, কেউ যদি চারটি উত্তরের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর লেখে, তাহলে সে কত নম্বর পাবে ? আবার কেউ যদি তিনটি সঠিক উত্তর লেখে, তাহলে সে কত নম্বর পাবে ? যা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তাতে এক-একটি উত্তরের জন্য ১/৪ নম্বর নির্দিষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে কি তাই হবে ? বিষয়টি ভাবনার বলেই আমরা মনে করি। এরকম প্রশ্ন আরো আছে ১২ (খ), ১২ (ঙ), ১২ (চ) ইত্যাদি।

আমি মনে করি, '১' নম্বরের জন্য চারটি উত্তরের প্রত্যাশা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করবে। তাই কোনো অবস্থাতেই '১' নম্বরের জন্য একটি বা দুটির বেশি উত্তর চাওয়া সঠিক নয়। আশা করি, সংসদ কর্তৃপক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন।

ধন্যবাদান্তে,

অসিতকুমার ভৌমিক

সহ-প্রধান শিক্ষক

উঘুমপুর আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়, উত্তর ২৪ পরগণা

সমিতি সংবাদ

নদীয়া

চাকদহ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির চাকদহ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে এবং পরিচালনায় ৪র্থ বার্ষিক শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ৭ই জানুয়ারি আলাইপুর মনোরমা শিক্ষা নিকেতনের মাঠে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। অঞ্চলের অন্তর্গত ২৭টি বিদ্যালয়ের মোট ১১০ জন প্রতিযোগী এবং প্রতিযোগিনী নির্দিষ্ট বয়সভিত্তিক বিভাগ ও ইভেন্টে অংশগ্রহণ করেন। সমিতির উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতা দেখার জন্য ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষক-শিক্ষিকা ছাড়াও স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠান উৎসবের রূপ নেয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সমিতির নদীয়া জেলা কমিটির সম্পাদক বীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে কনক মৈত্র, পৌরপতি, চাকদহ পৌরসভা এবং সুলেখা বালা, সভাপতি, চাকদহ পঞ্চায়েত সমিতি। অনুষ্ঠানের শেষে বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করেন উপস্থিত নেতৃবর্গ ও অতিথিবৃন্দ।

মুর্শিদাবাদ

জঙ্গীপুর মহকুমা শাখার উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ১৮ই ডিসেম্বর, ২০০৫ সকাল ১১টায় রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী মাঠে বিপুল উৎসাহে অনুষ্ঠিত হয় জঙ্গীপুর মহকুমা শাখার বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। শুরুতে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন রঘুনাথগঞ্জ ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রাণবন্ধু মাল। ১৩১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। মার্চপাস্ট করে প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। মোট ৩০টি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা করা হয়। বেলা ৩টায় পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি শহরের খ্যাতনামা চিকিৎসক ডাঃ সৌমেশ ব্যানার্জি এবং মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের এম ও ডাঃ আসামুদ্দিন বিশ্বাস বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। ডাঃ ব্যানার্জি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই প্রতিযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন। মহকুমা সম্পাদক সামিয়ত আলি বলেন, সমিতি বিগত চার বছর ধরে এই ধরনের ক্রীড়ানুষ্ঠান করছে। পরিশেষে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ডাঃ ব্যানার্জি পতাকা অর্ধনমিত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

পুরুলিয়া

রঘুনাথপুর-২ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে ডেপুটেশন

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির রঘুনাথপুর-২ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে বিদ্যালয় সহ-পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রঘুনাথপুরস্থ কার্যালয়ে সহ-পরিদর্শক মহাশয়ের নিকট গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। আট দফা দাবিসনদ পেশ করেন অঞ্চল শাখার সম্পাদক সচ্চিদানন্দ মুখার্জি। দাবিগুলি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়। আলোচনান্তে যে সমাধান সূত্রগুলো বেরিয়ে আসে—আগামী মার্চ'০৬ থেকে সহ-পরিদর্শক স্থায়ীভাবে রঘুনাথপুর অফিসে বসবেন। শূন্যপদ পূরণ, আসবাবপত্রের অভাব এবং সহ-জেলা পরিদর্শকের নিয়োগ সংক্রান্ত, অফিসের কর্মপরিধি বৃদ্ধির বিষয়গুলি নিয়ে জেলা পরিদর্শক (মাধ্যমিক), পুরুলিয়ার সঙ্গে আলোচনাক্রমে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগী হবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২২শে জুলাই '০৩ তারিখে মাননীয় বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস মহাশয় রঘুনাথপুর মহকুমা শাখারূপে এই কার্যালয়টির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে অফিসটি ক্রমান্বয়ে পূর্ণাঙ্গ সহ-জেলা পরিদর্শকের কার্যালয়ে পরিণত করা হবে। মহকুমা শাখার ৯২টি বিদ্যালয়ের বেতনসহ সমস্ত কাজ এখান থেকেই পরিচালিত হবে। বাস্তবে দেখা গেল, একজন সহ-

পরিদর্শক, হিসাবরক্ষক ও একজন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী অস্থায়ীরূপে নিযুক্ত হন। বিগত তিন বছরে এর কোনো সুরাহা না হওয়ায় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চারিত হয়। কারণে-অকারণে সহ-বিদ্যালয় পরিদর্শক মহাশয়কেও জেলা কার্যালয়ে তুলে নেওয়ায় অফিসটি প্রায় কার্যশূন্য ও আধিকারিকহীন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় অঞ্চল শাখার সম্পাদকমণ্ডলী, মহকুমা সম্পাদককে নিয়ে সহ-পরিদর্শকের নিকট ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

কলকাতা

শ্যামপুকুর আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত আলোচনাসভা

গত ১১ই মার্চ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কলকাতা জেলা শাখার অন্তর্গত শ্যামপুকুর আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে 'শিক্ষায় বিশ্বায়ন ও বামফ্রন্ট সরকার' শীর্ষক একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই আলোচনাসভায় মূল আলোচক ছিলেন অধ্যাপক অংশুতোষ খাঁন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহীত নীতির ফলে শিক্ষার সংকোচন ঘটছে, শিক্ষায় কেন্দ্রীয় সাহায্য ব্যাপকভাবে হ্রাস পাচ্ছে, শিক্ষায় বেসরকারীকরণের ঝোঁক বৃদ্ধি পাচ্ছে, সাধারণের শিক্ষার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করতে চাইছেন না। ফলে সাধারণের জন্য শিক্ষা সঙ্কুচিত হতে বাধ্য।

সভার শুরুতে আঞ্চলিক সম্পাদক সুধাংশু দাস সভার বিষয় ব্যাখ্যা করেন। সভাপতিত্ব করেন জোনের সভাপতি তোয়দবরণ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মৃন্ময় রায়, স্মরজিৎ গায়েন, বিকাশ মণ্ডল, লুৎফুল আলম এবং জেলা ও মহকুমার অন্যান্য নেতৃত্ব। প্রায় শতাধিক শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীর অংশগ্রহণে সভাটি প্রাণবন্ত হয়।

মুচিপাড়া-তালতলা আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির মুচিপাড়া-তালতলা আঞ্চলিক শাখার পক্ষে গত ২১শে ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সকাল ১২টায় একুশে ফেব্রুয়ারি দিবসটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে অঞ্চলের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকাবন্ধুদের নিয়ে কলিন্স ইনস্টিটিউটে একটি আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন অঞ্চলের সহ-



সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ রায়। ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মাল্যদান করেন শ্রীমতী ক্ষমা ভট্টাচার্য, রামরমণ ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি শক্তিপদ ভট্টাচার্য, সম্পাদক ডঃ রণজিৎকুমার মজুমদার, সহ-সম্পাদক দেবাশিস দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শক্তিপদ ভট্টাচার্য এবং উজ্জ্বল মণ্ডল।

উদ্বোধনী ভাষণে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ রামরমণ ভট্টাচার্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার গুরুত্ব ও সর্বস্তরে বাংলাভাষার প্রচলন ও শিক্ষার্থীদের কর্তব্য বিষয় জ্ঞাত করান এবং উপলব্ধির তাৎপর্য সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন বাংলা বিভাগীয় প্রধান প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক বলেন, বাংলাভাষার মর্যাদার দাবিতে ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে গুলিতে শহীদ হয়েছিল বরকত, সালাম, রফিক, জব্বার সহ অনেকেই।

আঞ্চলিক সম্পাদক ডঃ রণজিৎকুমার মজুমদার দেশভাগের পটভূমিতে 'বাহান্নোর ভাষা আন্দোলন : পশ্চিমবঙ্গে এর প্রাসঙ্গিকতা' এই নামকরণে একটি স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে বিশেষ করে উল্লেখ করেন ১৯০৫ সালের ১৯শে জুলাই অকস্মাৎ বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়। ওখান থেকেই দেশভাগের সূচনা। বঙ্গভঙ্গের ঘটনার মধ্যেই ৫২-এর ভাষা আন্দোলনের বীজ অঙ্কুরিত।

ভাষা আন্দোলনের উপর বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি শ্রীমতী ক্ষমা ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, ভাষাশহীদদের স্মরণ করার দিন একুশে ফেব্রুয়ারি। দেশভাগ হওয়ার পর পাকিস্তানের স্বৈরতন্ত্রী শাসক ও ওখানকার বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণির রাষ্ট্রের নেতারা পূর্ব পাকিস্তানকে তাদের উপনিবেশে রূপায়িত করতে চেয়েছিল। এ নিয়েই বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের ক্ষোভ পরিণত হলো রাজনৈতিক বৈরিতায়।

অনুষ্ঠানে রবিঠাকুরের আফ্রিকা কবিতা আবৃত্তি করেন

শক্তিপদ ভট্টাচার্য। গিরীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী বৈশাখী ধর নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি আবৃত্তি করে। এছাড়া শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রদের নিয়ে নাটক 'বিপ্লব' (মুনীর চৌধুরীর 'কবর' নাটক অবলম্বনে) মঞ্চস্থ হয়।

'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' (সঙ্গীত) সুন্দরভাবে পরিবেশন করেন শ্রীমতী কাকলি রায় ও শ্রীমতী শম্পা দেবনাথ। অনুষ্ঠানে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৫১১ জন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধু। সকাল ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলেছিল।

কোচবিহার

জেলা শাখা পরিচালিত ৪র্থ বর্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ৮ই জানুয়ারি, ২০০৬ স্থানীয় এম জে এন স্টেডিয়ামে কোচবিহার জেলা শাখা পরিচালিত চতুর্থ বর্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) দীপঙ্কর পাল। এই প্রতিযোগিতা প্রথম



শুরু হয় মশাল প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে। জেলার বিভিন্ন মহকুমা সম্পাদক ও আঞ্চলিক শাখার সম্পাদকগণ জ্বলন্ত মশাল বহন করে কিছুটা রাস্তা অতিক্রম করে জেলা শাখার সম্পাদকের হাতে অর্পণ করেন। জেলা শাখার সম্পাদক বকুল দত্ত স্টেডিয়ামের মধ্যেকার প্রধান মশাল প্রজ্জ্বলিত করেন। এরপর শুরু হয় খেলার মাধ্যমে শান্তি, সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিতে বেলুন ওড়ানো। স্টেডিয়ামের চারপ্রান্তে ও মধ্যস্থান থেকে মোট ২০০টি বেলুন ওড়ানো হয়। এরপর শুরু হয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মার্চপাস্ট ও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথ বাক্য পাঠ করান দিলীপ রায়। বর্ষীয়ান শিক্ষকনেতা কুমুদরঞ্জন পোদ্দার, অন্যান্য নেতৃত্ব ও অতিথিবৃন্দ অভিবাদন গ্রহণ করেন। খেলার শেষে সকল প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। জেলা শাখার সম্পাদক বকুল দত্ত রাজ্য প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন এবং ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কোচবিহার সদর মহকুমার চতুর্থ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ১৮ই ডিসেম্বর, ২০০৫ কোচবিহার সদর মহকুমার ৪র্থ বর্ষ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা স্থানীয় এম জে এন স্টেডিয়ামে



সম্পন্ন হয়। এই প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন জেলা সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সদর মহকুমা শাসক, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শক। সদর মহকুমার ৮০টি ইউনিটের ৯৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী এই খেলায় অংশগ্রহণ করেন। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কোচবিহার সদর মহকুমার সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র দে সংক্ষেপে চতুর্থ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। উপস্থিত ছিলেন সমিতির জেলা শাখার সহ-সভাপতি রঞ্জন ভট্টাচার্য, জেলা শাখার সহ-সম্পাদক সুজিত দাস।

সদর মহকুমার সহ-সম্পাদক সুজিত দাস, শ্যামলেন্দু দাস, ত্রিদিবেশ রায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনটি আঞ্চলিক শাখার মধ্যে ১১৫ পয়েন্ট পেয়ে সদর দক্ষিণ আঞ্চলিক শাখা চ্যাম্পিয়ন এবং ৬৪ পয়েন্ট পেয়ে সদর মধ্য আঞ্চলিক শাখা রানার্স হয়।

প্রতিযোগিতার বিভিন্ন পর্যায়ের খেলায় ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আঞ্চলিক শাখার সম্পাদকের হাতেও পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

সবশেষে জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের সাফল্য কামনা করে জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থার সদর মহকুমা সম্পাদক বিনয় বোস সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিচ্ছিন্নতাবাদী ও বিভেদকামী ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করুন

বেশ কিছুদিন যাবত 'দি গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন দায়িত্বহীন, বিভেদকামী কার্যকলাপের মাধ্যমে কোচবিহার সহ জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশে জনজীবনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে মরিয়া হয়ে বিভিন্ন অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।



বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিভেদকামী এই সংগঠনটির মূল বক্তব্য হলো—কোচবিহার ও তৎসংলগ্ন কিছু জেলা ও আসামের গোয়ালপাড়া নিয়ে একটি আলাদা রাজ্য গঠন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোচবিহারের সংযুক্তি চলবে না। কোচবিহার হবে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। এই কারণে এখানে ভোট করা যাবে না। এই সংগঠনটি সাধারণ মানুষের মধ্যে অপপ্রচার চালাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের রাজকোষে রাজার অর্থ এত আছে যে সেই অর্থ থেকে প্রত্যেককে লক্ষ লক্ষ টাকা দেওয়া সম্ভব। এছাড়াও প্রত্যেককে চার-পাঁচ বিঘা জমি দেওয়াও সম্ভব। এইসব কথা বলে এই সংগঠনটি সাধারণ মানুষকে প্রলোভিত করছে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে লোক খেপিয়ে বেড়াচ্ছে।

এই লোকখেপানোর একটি মর্মান্তিক ঘটনা হলো ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০০৫। এই সংগঠনের ক্ষমতালোভী আবেগ সর্বস্ব উন্মাদনার ফলশ্রুতিতে পাঁচটি প্রাণ অকালে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ল। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের অন্তরালে এদের ধারালো নখ-দন্ত প্রকাশিত হলো।

সকল সচেতন মানুষই জানেন এদের দাবি কতটা ভিত্তিহীন। সকলেই জানেন মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ কোচবিহারের ভারতভুক্তি মেনে নিয়েছেন স্বেচ্ছায় চুক্তির মাধ্যমে, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ সালে। আর এই জেলা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয় ১লা জানুয়ারি ১৯৫০ সালে। এরও পূর্বে কোচবিহার ইংরেজদের করদমিত্র রাজ্যে পরিণত হয় এবং বঙ্গের সঙ্গে সংযোজিত হয় চুক্তির মাধ্যমে ১৭৭৩ সালে। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ভুক্তির আগে সামান্য কিছুদিনের জন্য সাময়িক ব্যবস্থা হিসেবে কোচবিহার একজন চিফ কমিশনারের অধীনে ছিল। পশ্চিমবঙ্গ ভুক্তির পর মহারাজা দীর্ঘদিন বেঁচেছিলেন এবং এই বিষয়ে রাজ পরিবার ছিলেন সন্তুষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গে জমির আন্দোলনের ব্যাপক সাফল্য আসে। জোতদার ও কায়েমী স্বার্থবাদীরা শঙ্কিত হয়। শুরু হয় উত্তরখণ্ড, উতজায়াস, কামতাপুরী, কে এল ও প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতাবাদী ও কায়েমীস্বার্থের উপদ্রব। 'গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন' এদেরই নবতম সংস্করণ। আজকের জনগণের চেতনা, জমি-মজুরি-বর্গা আন্দোলনের সুফল দেখে এরা হতবাক। কোচরিহারের শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ বামপন্থীদের সাথে উন্নয়নের প্রশ্নে ও আন্দোলনে শামিল হন। কিন্তু বিভেদকামী শক্তি, কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এদের হয়ে মায়াকান্না কাঁদছেন।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা শাখা এই ধরনের বিভেদকামী ষড়যন্ত্রকে সবসময়ই আন্দোলন ও জনগণকে সঠিক তথ্য পরিবেশনের মাধ্যমে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সমাজে সম্প্রীতি রক্ষা করে শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে, উন্নয়নের এবং শান্তির স্বার্থে সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ ও বিভেদকামী ষড়যন্ত্রকে জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং সকলের কাছে 'গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের' অপব্যাখ্যা ও দূরভিসন্ধির মুখোশ খুলে দিতে ১২ই নভেম্বর, '০৫ তারিখে বেলা ১টায় শহীদবাগে শিক্ষার সাথে যুক্ত সমস্ত স্তরের প্রায় ৬ হাজার মানুষের এক ঐতিহাসিক সভা এবং সভার শেষে বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা শাখার সভাপতি সমরেন্দ্রনাথ সাহা। বক্তব্য রাখেন কলেজ শিক্ষকদের পক্ষে দিগ্বিজয় দে সরকার, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির পক্ষে রঞ্জিত রায় এবং নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক নিখিল দাস।

হাওড়া

বালি গ্রামীণ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে কনভেনশন

গত ২১শে জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখে বেলা ২-৩০ মিনিটে ঘোষপাড়া নিশ্চিন্দা বালিকা বিদ্যালয়ে বালি গ্রামীণ আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে 'বর্ণপরিচয়'-এর দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কনভেনশনের বিষয়বস্তু ছিল 'বিদ্যাসাগরের শিক্ষাভাবনা ও বর্তমান সময়ে তার প্রাসঙ্গিকতা'। আলোচক ছিলেন বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষক-শিক্ষণ মন্দিরের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সুবোধ মণ্ডল। ৪২ জন সমিতি সদস্যের উপস্থিতিতে মনোগ্রাহী আলোচনা হয়েছিল। আলোচনান্তে অঞ্চলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করেন অঞ্চল সম্পাদক রতন কোলে। সমগ্র অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অঞ্চল সভাপতি ডঃ সুশোভন দাস।

উলুবেড়িয়া মহকুমা শাখার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির উলুবেড়িয়া মহকুমা শাখার উদ্যোগে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে আমতা স্পোর্টিং ক্লাব মাঠে। প্রতিযোগীদের মাঠ পরিক্রমার পর সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন মহকুমা শাখার সভাপতি সেখ শাহ আলম। প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন হাওড়া জেলা কমিটির প্রাক্তন সভাপতি অনিল দাস। প্রতিযোগীদের শপথ বাক্য পাঠ করান বর্ষীয়ান প্রতিযোগী রঞ্জিতকুমার দাস। বিভিন্ন বিষয়ে বিভাগগত ভাবে ৯৭ জন শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির হাওড়া জেলা কমিটির সহ-সভাপতি মোহনচন্দ্র সাঁতরা, উলুবেড়িয়া মহকুমা সভাপতি সেখ শাহ আলম ও সম্পাদক মানস দাস ও অন্যান্য জোনাল সম্পাদকগণ। প্রতিযোগিতার গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন মোহনচন্দ্র সাঁতরা। বিভিন্ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিতে প্রথম স্থানাধিকারীগণ জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেন। মহকুমার সভাপতি মহাশয় প্রতিযোগী, উপস্থিত জনসাধারণ ও ক্লাব কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জগাছা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে শিক্ষা কনভেনশন

গত ৪ঠা মার্চ, ২০০৬ বেলা ২টায় সুরেন্দ্রনাথ গার্লস স্কুলে সমিতির জগাছা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে এক শিক্ষা কনভেনশনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই কনভেনশনে ১৯৭৭ সালে বর্তমান সময়ের মধ্যে অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলির শিক্ষার প্রগতি আলোচিত হয়। কনভেনশনের শুরুতে অঞ্চল সম্পাদক ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় প্রস্তাব উত্থাপন করে জানান, ১৯৭৭ বর্ষে অঞ্চলের ১৮টি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী সংখ্যা ছিল ৮৫৮৫। ২০০৬ বর্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৩৫৮৬। ১৯৭৭ বর্ষে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ৫৯৭ এবং ২০০৬ বর্ষে ১৩০৬। ১৯৭৮ বর্ষে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিল ৫৬ জন এবং ২০০৬ বর্ষে হয়েছে ৮৯৩ জন। ১৯৭৭ বর্ষে শিক্ষক পদের সংখ্যা ছিল ২৭৪ এবং ২০০৬ বর্ষে অনুমোদিত শিক্ষক পদ সংখ্যা হয়েছে ৩৬৩ জন। ১৯৭৭-এর পর অঞ্চলে নবগঠিত বিদ্যালয় অনুমোদন পেয়েছে ৩টি। ১৯৭৭-এর পর মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়েছে ৫টি বিদ্যালয় এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়েছে ৬টি বিদ্যালয়। তিনি অঞ্চলের বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার এই প্রগতি ধরে রাখতে সপ্তমবারের জন্য বামফ্রন্ট সরকার গঠনের আহ্বান জানান।

অঞ্চল সম্পাদকের প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কনভেনশনের প্রধান বক্তা, সমিতির হাওড়া জেলা শাখার সভাপতি দিলীপ চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বিশ্ব ব্যাঙ্কের নির্দেশে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষা পরিষেবা থেকে সরে যেতে চাইছে। বর্তমান বর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার শ্রম আইন বদলাতে চাইছে। তারা ভি আর এস, চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগকে উৎসাহিত করছে। তিনি প্যারাটিচার ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করে বলেন, সামরিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্যারামিলিটারীরা যদি পূর্ণ বেতন পায় তবে শিক্ষাক্ষেত্রে কেন কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্ব নিয়ে প্যারাটিচারের বদলে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক নিয়োগ করবে না। পি এফ-এর সুদ ১২% থেকে ৮%-এ নামিয়ে আনায় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা প্রতি মাসে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তা তিনি বিশ্লেষণ করেন। পাশাপাশি বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির জন্য বিগত ২৯ বছরে একের পর এক সদর্থক পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী নিয়োগ হয়েছে, হচ্ছে এবং চলবে, বেতন কাঠামো সম্মানজনক হয়েছে, অবসর জীবন পেনশন-গ্র্যাচুইটির মাধ্যমে নিরাপদ হয়েছে, শিক্ষার্থী সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

বাড়ছে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা। সংবাদমাধ্যমগুলি শিক্ষার ওপর আক্রমণ করলেও শিক্ষা কনভেনশনের রিপোর্ট এই প্রগতির সাক্ষ্য বহন করছে। তিনি সপ্তম বামফ্রন্ট সরকার গঠনে আমাদের দায়িত্ব জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। অঞ্চল সভাপতি অশোক অধিকারীর সভাপতিত্বে কনভেনশনটি বিকেল ৪-৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে। কনভেনশনে অঞ্চলের ৬৮ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

মালিপাঁচঘড়া আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও সংবর্ধনা

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি মালিপাঁচঘড়া আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সালকিয়া কেদারনাথ বাবুলাল রাজগড়িয়া বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হলো সমিতির এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান।



উক্ত অনুষ্ঠানে সদস্যদের বিপুল উপস্থিতির মধ্যে দিয়ে সংবর্ধিত হলেন বিগত পাঁচ বছরে অঞ্চল থেকে অবসরপ্রাপ্ত সমিতির সদস্য ছিলেন এমন শিক্ষিকা/শিক্ষক/শিক্ষাকর্মীবৃন্দ। গোপাল মুখোপাধ্যায়, মহানাগরিক, হাওড়া পৌরসভা, প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে সমিতির নিরলস প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করেন। সমিতির জেলা কমিটির পক্ষে জাতীয় শিক্ষক মোহনচন্দ্র সাঁতরা বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সুচিন্তিত মতামত সদস্যদের মধ্যে বিশেষ অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করে। সমিতির সদর মহকুমা সম্পাদক সমর সিংহ নাগ 'আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি' হিসাবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সমিতির কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ব্যাখ্যা করেন। অনুষ্ঠানটিতে পৌরোহিত্য করেন অঞ্চলের সভাপতি এস পি উপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সংযোজনা করেন শম্ভু মিত্র, প্রদ্যুৎ ঘোষ, শ্রীমতী চন্দনা বেজ এবং গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য কমিটির কোষাধ্যক্ষা, নেত্রী শ্রীমতী সাবিত্রী মজুমদার।

জগাছা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সত্যপ্রিয় স্মৃতি পুরস্কার ও নবীকরণ

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জগাছা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সত্যপ্রিয় স্মৃতি পুরস্কার এবং বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ (এস এস সি) থেকে আগত নবীন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হলো জগাছা হাইস্কুলে। হাইস্কুলের ছাত্রীদের গাওয়া 'ঐ উজ্জ্বল দিন......' সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। হাওড়া জেলা সমিতির অন্যতম সহ-সভানেত্রী সেবা চক্রবর্তী সত্যপ্রিয় স্মৃতি পুরস্কারের প্রাসঙ্গিকতার উপর আলোকপাত করেন। তিনি ছাত্রছাত্রীদের বর্তমান ক্রম-অবক্ষয়িত সমাজে মূল্যবোধের শিক্ষা ও ত্যাগের আদর্শে চরিত্র গঠনের পরামর্শ দেন। সভায় পুরস্কার প্রাপক ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য।

সত্যপ্রিয় স্মৃতি স্মারক বক্তৃতার বক্তা ছিলেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির বর্ষীয়ান নেতা ও হাওড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান উমাশঙ্কর গাঙ্গুলি। স্মারক বক্তার আলোচনার নির্ধারিত বিষয় ছিল '৫৪-র ঐতিহাসিক আন্দোলন ঃ বর্তমান প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয়'। তিনি ছাত্রছাত্রী ও নবীন-প্রবীণ শিক্ষকদের ঐতিহাসিক '৫৪-র আন্দোলনের প্রেক্ষাপট স্মরণ করিয়ে দেন। তৎকালীন সময়ের সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দেন। বর্তমান বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্যের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেন। পরে অঞ্চলের ২০০৫ সালে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের এবং উচ্চমাধ্যমিকে বাংলা ও ইংরাজীতে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপকদের পুরস্কৃত করেন সভায় উপস্থিত সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ। বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ থেকে ২০০১ সালের ১লা মার্চ-এর পরে আগত ৯৯ জন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের স্মারক প্রদানের মাধ্যমে বরণ করা হয়। আগত নবীন শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো। এছাড়াও সমিতির দীর্ঘদিনের সদস্য যাঁরা সম্প্রতি অবসরগ্রহণ করেছেন তাঁদের এবং যাঁরা নিরবচ্ছিন্নভাবে শিক্ষকতা জীবনের ত্রিশ বছর অতিক্রম করেছেন তাঁদেরও সভায় সম্মান জানানো হয়। এরপর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় সফল ছাত্রছাত্রীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কেদারনাথ ইনস্টিটিউশনের মাঠে অনুষ্ঠিত সমিতির আঞ্চলিক

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সফল শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীদেরও পুরস্কৃত করা হয়। সভায় আবৃত্তি পরিবেশন করেন সুব্রত নেগেল ও সদর মহকুমার কার্যকরী সমিতির সদস্যা সুরঞ্জনা ঘোষ। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অনিরুদ্ধ বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় জেলা সমিতির অন্যতম সহ-সম্পাদক চিন্ময় কুমার, সদর মহকুমা শাখার সহ-সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দিবজিৎ মুখোপাধ্যায়, হাওড়া পৌরসভার কাউন্সিলর আভা মুখার্জি, মহকুমা শাখার কোষাধ্যক্ষা শান্তি চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অঞ্চল সম্পাদক ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় সহ সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের ঐকান্তিক প্রয়াসে অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হয়। অঞ্চল সভাপতি অশোক অধিকারীর সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

উলুবেড়িয়া আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

গত ১১ই ফেব্রুয়ারি উলুবেড়িয়া বীণাপাণি গার্লস হাইস্কুলে সমিতির উলুবেড়িয়া আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে নবাগত ও অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের সংবর্ধনা জানানো হলো। একই সাথে এই অঞ্চলের ২০০৫ সালের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের 'সত্যপ্রিয় রায় স্মৃতি পুরস্কার' প্রদান করা হয়। এই সংবর্ধনাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির হাওড়া জেলা শাখার সহ-সভানেত্রী সেবা চক্রবর্তী, জেলা সম্পাদক শিশির দীর্ঘাঙ্গী, সহ-সম্পাদিকা প্রতিমা চক্রবর্তী এবং সমিতির মহকুমা শাখার পক্ষে সম্পাদক মানস দাস।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সমিতির আঞ্চলিক শাখার সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে জেলা ও মহকুমা নেতৃত্ব আঞ্চলিক শাখার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন। আঞ্চলিক শাখার সম্পাদক মহঃ ফারুক সংবর্ধিত ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, শুধুমাত্র নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়ার চিন্তায় বিভোর থেকে সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচা নয়, সমাজ সচেতন মন নিয়ে সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে বাঁচাই হলো আসল বাঁচা। নবীনদের সক্রিয় সহযোগিতা ও প্রবীণদের সুপরামর্শ সঙ্গে নিয়ে শক্তিশালী সংগঠন গড়ার অঙ্গীকার করে সম্পাদক তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এই সংবর্ধনা সভায় ২০০৪ সালের ১লা আগস্ট থেকে ২০০৬ সালের ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত এই অঞ্চলে নিযুক্ত ৪৭ জন নবাগত এবং ২৩ জন অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের সংবর্ধনা জানানো হয়। সমিতি তার পেশাগত দাবিদাওয়া ও অন্যান্য কর্মসূচি রূপায়ণের স্যাথে সাথে সমাজের প্রতিও দায়বদ্ধ একথা স্মরণ রেখে এই অঞ্চলে বড়ডাঙ্গা নামক গ্রামে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে সর্বস্বান্ত শেখ আয়নালের হাতে এককালীন এক হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য প্রদান করেন আঞ্চলিক শাখার পক্ষে সম্পাদক মহঃ ফারুক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শেখ আয়নালের পুত্র ও কন্যা বাহিরা হাইস্কুলের যথাক্রমে ষষ্ঠ ও অষ্টম শ্রেণির ছাত্র ও ছাত্রী। উক্ত বিদ্যালয় ইউনিটের সদস্যগণও এই বিপর্যয়ে সর্বস্বান্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে নবীন ও প্রবীণসহ মোট ১২৯ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানের সফল রূপায়ণে বীণাপাণি গার্লস হাইস্কুলের বিদ্যালয় ইউনিট, পরিচালন সমিতির সম্পাদক বিদ্যুৎ কর, প্রধান শিক্ষিকা ডঃ সর্বাণী দাস সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন। সবশেষে সকলকে ধন্যবাদজ্ঞাপন করে সভাপতি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

হাওড়া আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি হাওড়া যোগেশচন্দ্র গার্লস স্কুলে হাওড়া আঞ্চলিক শাখা আয়োজিত 'সত্যপ্রিয় রায় স্মৃতি পুরস্কার', সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার এবং সাম্প্রতিককালে অবসরপ্রাপ্ত সমিতির সদস্য/সদস্যাদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলা শাখার সভাপতি দিলীপ চট্টোপাধ্যায়। তিনিই 'সত্যপ্রিয় রায় স্মারক বক্তৃতা' প্রদান করেন। বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের মানসিকতা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শিক্ষক-অভিভাবক-ছাত্র সকলকেই সমানভাবে এগিয়ে যেতে হবে। কিন্তু মানবিকতা ও অন্যান্য উৎকর্ষমুখী গুণগুলি ত্যাগ করে যেন তা শুধুই স্বার্থপরতায় পর্যবসিত না হয়, এই কথা তিনি তাঁর বক্তব্যের মধ্যে প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরাও তাঁর বক্তব্য থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছে বলে জানায়।

এরপর এই অঞ্চলের প্রতিটি বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক, ২০০৫-এর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ সর্বোচ্চ নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। সমিতি আয়োজিত ২০০৫-এর সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিষয় ও বিভাগে যারা স্থান অর্জন করেছে তাদেরও পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সবশেষে সদ্য অবসরপ্রাপ্ত সদস্যবন্ধুদের সংবর্ধনা জানানো হয়।

বিভিন্ন নবীন ও প্রবীণ সদস্য ও বিদ্যালয়গুলির ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে সভা অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তাঁদের কেউ কেউ এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে গভীর উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেন। বিকাল ৪-৩০ মিনিটে অনুষ্ঠানটি শেষ হয়।

জগৎবল্লভপুর-উত্তর আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে পেনশন সেল

জগৎবল্লভপুর এলাকার মাধ্যমিক শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের দীর্ঘদিনের দাবী মেনে জগৎবল্লভপুর-উত্তর আঞ্চলিক শাখা গত ১১ই ফেব্রুয়ারি জগৎবল্লভপুর হাইস্কুলে অবসর নিতে চলেছেন এমন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের পেনশন সংক্রান্ত ব্যাপারে সুপরামর্শ দেওয়ার জন্যে একটি পেনশন সেল চালু করেছে। এখানে প্রত্যেক মাসের দ্বিতীয় এবং চতুর্থ শনিবার অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ পেনশন সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখে দেবেন। জেলা শাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য তুষারকান্তি ভট্টাচার্য পেনশন সেলটির উদ্বোধন করেন। হাওড়া সদর মহকুমা শাখার সম্পাদক সমর সিংহ নাগ, প্রবীণ শিক্ষক নেতৃত্ব রঞ্জন ঘোষ এবং অঞ্চল সম্পাদক বরুণ চক্রবর্তীর আন্তরিক উদ্যোগে গঠিত পেনশন সেলটির সাফল্য কামনা করেন। অঞ্চল সভাপতি কাশীনাথ কর্মকার, মহকুমা সদস্য মোজাম্মেল হক, শিক্ষকনেত্রী বাসন্তী গলুই, জগৎবল্লভপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক অরূপ মিত্র ও অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মী বন্ধুদের সক্রিয় সহযোগিতায় পেনশন সেলটি আগামীদিনে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলবে বলে সকলে মনে করছেন।

হাওড়া সদর মহকুমা শাখার ৪র্থ বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

গত ২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৫ হাওড়া দাশনগরস্থিত আরতি কটন মিলের মাঠে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির হাওড়া সদর মহকুমা শাখার উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা করেন সমিতির সদর মহকুমা শাখার সভাপতি রতন কোলে। সমিতির হাওড়া সদর মহকুমা শাখার অন্তর্গত বিভিন্ন আঞ্চলিকস্তরের নির্বাচিত প্রতিযোগীরা বয়ঃক্রম অনুযায়ী পুরুষ ও মহিলা বিভাগের নির্ধারিত প্রতিযোগিতায় সুষ্ঠুভাবে

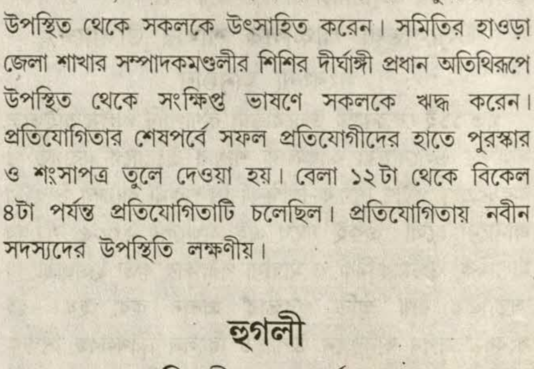


অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন। সমিতির হাওড়া জেলা শাখার কোষাধ্যক্ষা শ্রীমতী স্বাগতা দাস, অন্যতম সহ-সম্পাদক চিন্ময় কুমার মাঠে উপস্থিত থেকে সকলকে উৎসাহিত করেন। সমিতির হাওড়া জেলা শাখার সম্পাদকমণ্ডলীর শিশির দীর্ঘাঙ্গী প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থেকে সংক্ষিপ্ত ভাষণে সকলকে ঋদ্ধ করেন। প্রতিযোগিতার শেষপর্বে সফল প্রতিযোগীদের হাতে পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। বেলা ১২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত প্রতিযোগিতাটি চলেছিল। প্রতিযোগিতায় নবীন সদস্যদের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

হুগলী

অভিমুখীকরণ কর্মশালা

জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক), হুগলী আয়োজিত এক জীবনশৈলী শিক্ষাবিষয়ক অভিমুখীকরণ কর্মশালা ঘোষপুর ইউনিয়ন নেতাজী বিদ্যাপীঠে গত ২৬-২৮শে নভেম্বর হয়।



এই কর্মশালায় ১৮টি বিদ্যালয়ের ৮৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার উদ্বোধন করেন হুগলী জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দীপক দত্ত। বহু বিশিষ্টজনেরা এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

জলপাইগুড়ি

জেলা শাখার উদ্যোগে স্মরণসভা



গত ২২শে ফেব্রুয়ারী সমিতির জেলা দপ্তরে তারাদির স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। তারা ব্যানার্জীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন বর্ষীয়ান নেতৃত্ব সুবোধ ধর, অপূর্ব গোস্বামী, সুভাষ চৌধুরী, সরোজিৎ ঘোষ দস্তিদার, অমর জ্যোতি পাল, অজিত ভট্টাচার্য, রীতা মিত্র প্রমুখ ছাড়াও এ বি পি টি এ'র জেলা সহ-সম্পাদক সীতেশ চক্রবর্তী সহ সমিতির বর্তমান নেতৃত্ব। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন জেলা সম্পাদক মনোরঞ্জন ভদ্র। স্মরণ সভায় নেতৃত্বের আলোচনায় একটা বিষয় বারবার উচ্চারিত হয়েছে তা হলো তারাদি কোনদিনই সমিতির নেতৃত্বের পদ অলংকৃত করেননি তা সত্ত্বেও তারাদি ছিলেন নেত্রী। তারা ব্যানার্জী অমর রহে।

তারা ব্যানার্জীর জীবনাবসান



গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ শুক্রবার সকাল ৮টা ১০ মিনিটে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সংগ্রামী নেত্রী কমরেড তারা ব্যানার্জী। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

কমরেড তারা ব্যানার্জী ১৯২০ সালে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই তিনি জলপাইগুড়ি শহরে চলে আসেন। ১৯৩৬ সালে জলপাইগুড়ি সদর বালিকা বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। তারপর কলকাতায় বেথুন কলেজে পড়াশুনা করেন। জীবনের প্রথমদিকে মালদা ও পরে হাওড়ায় শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯৫০ সালের ২৮শে মে জলপাইগুড়ি সদর বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার পদে যোগ দেন। দীর্ঘ ৩৫ বছর এই বিদ্যালয়ে কাজ করে ১৯৮৫ সালে শিক্ষকতার পদ থেকে অবসর নেন।

কমরেড তারা ব্যানার্জী স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষকতা জীবনের প্রথমদিন থেকেই তারা ব্যানার্জী ছিলেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির একনিষ্ঠ কর্মী। ১৯৫২ সালের সমিতির আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সমিতির সদস্যদের কাছে 'তারাদি' বলে পরিচিত হন। তখন থেকেই তারাদি সদস্যদের কাছে একটি সংগ্রামী নাম।

১৯৫৪'র ঐতিহাসিক আন্দোলনে তারাদি রীতিমত নেত্রী। কি অবস্থান, কি ধর্ণা, কি আইন অমান্য — তারাদি সবার পুরোভাগে। জলপাইগুড়ি শহর বা কলকাতা কিংবা দিল্লী সমিতির কর্মসূচি যখন যেখানে তারাদি তখন সেখানেই সামিল। তারাদির বকুনী না খেয়ে জলপাইগুড়িতে কেউ নেতৃত্বে আসেননি। কর্মসূচি রূপায়ণে তিনি এতটাই দায়িত্বশীল ছিলেন যে কর্তব্যে অবহেলা সহ্য করতে পারতেন না। তিনি যেমন শাসন করেছেন সকলকে, তেমনি দিদির মতন, মায়ের মতন স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে কাছে টেনেছেন সকলকেই। ১৯৫৮ সালের অনশন ধর্মঘটে তারাদির অংশগ্রহণ জলপাইগুড়ির শহরের মানুষকে হতবাক করে দিয়েছিল। একজন দিদিমণি খোলা মাঠে দিনের পর দিন শিক্ষা ও শিক্ষকদের দাবীতে অনশনে বসে আছেন। প্রয়াত কমরেড সুবোধ মিত্র সর্বকনিষ্ঠ অনশনকারী সদস্যা তারাদির পাশে ছিলেন। নির্ভীক প্রত্যয়ী তারাদি পুলিশের ব্যারিকেড বহুবার ভেঙেছেন।

শিক্ষকতা জীবনে তারাদি কোনদিন বিদ্যালয়ে দেরিতে গেছেন বা ছুটির আগে বিদ্যালয় ত্যাগ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত কেউ খুঁজে পাননি। তারাদির ক্লাসে কোনদিন কোন ছাত্রী পড়া না করে যেত পারতো না। পড়া না হলে ছুটির পরে পড়া করে দিয়ে তবেই তারাদির কাছ থেকে ছুটি পেত ছাত্রীরা। বিদ্যালয়ে তারাদি সকল শিক্ষিকার অভিভাবিকা ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করছে।

বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির আহ্বান

আমি বসন্তের কোকিল নই

আমাদের মতামত ঠিক করে ফেলতে হবে। আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আমাদের অবস্থান নিয়ে নিতে হবে। আগামী পাঁচ বছর আমাদের রাজ্যের শাসন ক্ষমতা কাদের হাতে থাকবে তা ঠিক করার দায়িত্ব আমাদের, আমাদের বলতে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব মানুষের।

বসন্তকালের কোকিলের মতন বেশকিছু মানুষ নির্বাচনের সময় জেগে ওঠে। তাদের মূল কথা, পশ্চিমবাংলায় গত উনত্রিশ বছর ধরে যে শাসন চলছে তার পরিবর্তন। আমাদের বিবেচনা করতে হবে এই দাবির সাথে আমরা কি একমত? জড় পৃথিবীসহ সামাজিক জীবনেও পরিবর্তন এমনি এমনি আসে না, কারণ লাগে। এমন কোন কারণ কি আমরা দেখেছি যাতে এই পরিবর্তনের পক্ষে দাঁড়ান যায়? গত উনত্রিশ বছরের কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, গত পাঁচ বছরে এই পরিবর্তনের প্রবক্তাদের দেখা কি আমরা পেয়েছি? আমাদের জীবনের দুঃখ-কষ্টের পাশে এদের দেখেছি? আমাদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলনে এরা কি পথ হেঁটেছেন? আমাদের অভিজ্ঞতা হল—না, এরা ছিলেন না।

আমাদের মিত্র তারাই যারা আমাদের জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য লড়াই করেছেন। আমাদের দাবি-দাওয়ার আন্দোলনের সময় আমাদের পাশে পাশে ছিলেন। আসলে আমাদের মিত্রদের আমাদের থেকে আলাদা করা যায় না, কারণ আমরাই আমাদের উন্নয়নের পরিকল্পক এবং রূপায়ণকারী। আন্দোলনে আমরাই আমাদের হাত ধরে থাকি, আমাদের প্রতিনিধিরাই উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নীতিগত প্রশ্নে সিদ্ধান্তকারী। সুতরাং আলাদা করা বৃথা, বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।

অথচ সেই চেষ্টা চলছে। অবাধ নিরপেক্ষ মতপ্রকাশের ব্যবস্থা থাকলে এই উনত্রিশ বছরের ব্যবস্থা পাল্টানো যাবে না এটা আমাদের শত্রুরা বুঝেছে, তাই এবারের পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে নতুন একটি প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে, নির্বাচনে নিজেদের নীতি-আদর্শ, দাবি, কর্মসূচি প্রচারের অন্যতম উপায় পোস্টার-দেওয়াল লেখা-ফেস্টুন ইত্যাদি নিরপেক্ষ (?) নির্বাচনী আধিকারিকদের নির্দেশে বন্ধ। যাতে আমাদের বন্ধুদের অর্থাৎ আমাদের কথা আমাদের কাছে পৌঁছাতে না পারে। যারা বড়লোক তাদের জন্য টেলিভিশন আছে। আমাদের জন্য? আমরাই আছি। ওদের এই প্রচেষ্টা আসলে মানুষের মতপ্রকাশের ও প্রচারের যে অধিকার তাতে আঘাত করা। সাতের দশকের মাঝামাঝি এই রকম প্রচেষ্টার এক ঘৃণ্য প্রয়াস আমরা দেখেছি। এবার একটু সাজানো গোছানো মাত্র। এই অপচেষ্টার জবাব আমাদের দিতেই হবে।

গত উনত্রিশ বছর ধরে তো বটেই, গত পাঁচ বছরেও কৃষিতে, শিল্পে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে সর্বক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যে উন্নয়ন হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আত্মমর্যাদা ও আত্মনির্ভরতার বিকাশ ঘটেছে। এ কি আমরা ছেড়ে দিতে পারি!

আমরা যে আন্দোলনের কর্মী— সাক্ষরতা আন্দোলন। সেই ক্ষেত্রের তথ্য হল, ১৯৯১ সাল থেকে ২০০০ এই দশ বছরে সাক্ষরতার হার বেড়েছে ১০.৬৮ শতাংশ, বিদ্যালয়-ছুট ছাত্রের শতকরা হার ১৯৭৬ সালের ৭০ শতাংশ থেকে কমে ২০02 সালে দাঁড়িয়েছে ৩৬.৪১ শতাংশ। আমাদের শিশুদের বিদ্যালয় যাওয়া সুনিশ্চিত করতে শিশু শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হয়েছে ১৬৪০৩টি, মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্র ৮৬৩টি। নিরক্ষরতার উৎসমুখ বন্ধ করতে এই প্রয়াস আমাদের আন্দোলনকে সাহায্য করেছে। গ্রামবাংলার কৃষিজীবী মানুষদের উন্নয়নের ফলে তাদের হাতে এসেছে খরচ করার মতন সামান্য হলেও কিছু অর্থ। ৭৭ সাল থেকে ভূমিসংস্কারের ফলে কৃষিতে যে উন্নয়ন হয়েছে তার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই বর্তমান পশ্চিমবাংলায় আধুনিক শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। যা ভবিষ্যতে আমাদের রাজ্যে শিল্পের জোয়ার আনবে, কর্মসংস্থানের আরও বাড়তি সুযোগ তৈরী করবে।

আমাদের রাজ্য পশ্চিমবাংলাকে নিয়ে আমরা গর্বিত। সাম্প্রদায়িক বিষ বাতাস আমাদের কলুষিত করতে পারেনি। প্রচেষ্টা ছিল, প্রচেষ্টা আছে। আমরাই আটকেছি, আমরাই আটকাব। যারা এই বিষ আমাদের রাজ্যে আনতে সাহায্য করেছে তাদের প্রত্যাখ্যান করা আমাদের নৈতিক কর্তব্য। যারা আমাদের দেশকে লুঠ করবার জন্য বিদেশীদের নির্দেশে দরজা খুলে দিয়েছে তাদের প্রত্যাখ্যান করাটাও আমাদের নৈতিক কর্তব্য।

আমরা শত্রুকে চিনি, আমরা আমাদেরকেও চিনি। ভবিষ্যত নির্মাণের দায়িত্ব আমাদেরই হাতে। আমরা ভুল করব না—এই বিশ্বাসে আমরা প্রত্যয়ী।

Teachers' Journal

ORGAN OF THE ALL BENGAL TEACHERS' ASSOCIATION

Editor : Sri Bikash Mandal ★ Joint Editor : Smt. Aparna Sanyal (Banerjee)

VOL. LXXXV NO. 3 MARCH, 2006

Editorial

DEFEAT ALL THE NEFARIOUS DESIGNS

Thesre is no basic difference between imperialist colonialism and economic imperialism. Both are parasites and suck the blood of common people. With the passage of time the modus operandi changes but the ulterior motive remains unchanged. On the plinth of coercion and exploitation the impearialists function and carry forward their ignoble designs to plunder the economic resources of the targeted countries one after another. The Latin American countries were subjected to endless plunder till their economic resources were pumped out by the American imperialism.

Imperialism endeavours to erect walls of separations between man and man in the name of religion, language, caste etc. It fears unity of the people. Hence, imperialism appoints its agents to disturb social tranquillity resorting to divisive devices. After the dismemberment of erstwhile USSR, the USA imperialism is enjoying the 'felicity' of unipolar world for its economic misdemeanours.

India is rich in natural resources and manpower. And the country offers a very good market, as the purchasing power of a sizable section of people is increasing gradually. A consumerist attitude is increasing each day as a direct sequel of imperialist globalisation. The economic imperialists under the leadership of Bush administration are establishing hegemony over this vast market.

The UPA govt is supposed to run the affairs of governance following the guidelines of the Common Minimum Programmes (CMP) – the CMP visions are realistic and to a great extent, pro-people. The Left Force is offering outside support to the Congress-led UPA govt with the hope that CMP directions will be duly honoured. But the Central govt is more interested to appease the imperialist masters than to implement the CMP and pursuing pro-liberalisation policies sacrificing the national interests. The Central finance ministry just ahead of the budget proposals for 2006-07 had published the reports of the fiscal year 2005-06 in which a claim has been made that the yearly GDP growth will rise to 8.1%; it's a good sign. But this growth is meaningless if the fruits of this growth do not trickle down to the benefit of the populace. Deficiency in this respect can easily be detected. The purchasing power of the common people has to be increased and attention is to be fixed to this issue. The growth in GDP is not the only yardstick of development.

Human development index is the real indicator of development. It's matter of great abashment that India as per human development index finds 127 position out of 177 countries. There must be political will of the Central govt, and it is evident that there is a wide gap between the pledges and actions.

There is no fundamental difference between the Congress and the BJP plus its allies so far as the economic policies are concerned. These forces work in favour of the economic imperialism. The BJP wants to inject religious venom in the mind of the people for political mileage in a plural country like ours. The ugly face of communalism endeavours to shift the attention to the issue of Hindutva from the main issues of the country and invites internal strifes which destroy social tranquillity and thereby retards development. The Trinamul Congress has no concerete political vision but is hisghly power-hungry. This party is opportunist and entertains Machiavellian motives. Political morality is an alien concept to this political outfit. It indulges secessionist forces even for political advantages.

Against this backdrop the 14th Assembly elections are to be held in West Bengal alongwith some other states of the country, and that too in five phases, while in Tamil Nadu such elections are slated to be completed in a single day. This long schedule will adversely affect lakhs of students across the state. The decision of the Election Commission is just inexplicable – the law and order situation of the state is much better than other states.

It is crystal clear that the Left forces are the main target of the pro-imperialist forces and their sychophants and agents. The Left combination is running a govt with clear economic policies. Its education policy is just realistic, pro-people and transparent. The fruith of these policies are shared by the people in general. Despite several constraints the Left Front govt is moving ahead following the 'alternative path' much to the dislike of the reactionary forces. People's support forms the plinth of the success and hence, all-out efforts are on to distabilise the popular govt. But falsehood and caprice can never win over the reality.

The days of one-party-rule is over at the Centre; the present UPA govt is obliged to secure the support of the Left parties for its survival; the Left forces are a stumbling block in the matter of safeguarding imperialist interest. Moreover, the rule of the Left forces for such a long span of the time is a headache of the reactionary forces. So, different types of conspiracies are engineered and these will continue till the Assembly Elections are over. But we must arouse collective consciousness against the conspiracies to foil all these sinister designs. For installation of the 7th Left Front Government we all have to employ all our strength. Concerted and planned activities are to be sustained for achieving the success.

12 March 2006

Call Of The Association

SIBAPRASAD MUKHOPADHYAY
General Secretary

George W Bush on 1 March landed on Indian soil – the peace-loving democratic people of the country registered their protests against the protege of imperialism. The organisations of the students-youths-females alongwith the political parties which have anti-imperialism stance denounced the visit of the master imperialist. Mammoth processions were organised in Kolkata, the citadel of leftist movements. In all the anti-imperialist processions slogans such as 'Bush, the enemy of humanity, quit India', 'The world is for the humans, not for the demons' etc. were aired. The members of the Association assembled in the assemblage organised by leftist trade unions and federations on 1 March in front of the office of the American publicity center with the festoons which read 'Bush go back'. Since inception our Association has spearheaded educational movements fighting the imperialist forces. We hate imperialism and naturally, condemn any attempt of opening Indian market to the imperialist Bush administration. The members are aware of the imperialist menace and fight against imperialist endeavours tooth and nail. Capitalism isn't the last word, socialism is the only future.

The secondary exams are over smoothly. The annual exams are on, and the question papers of Class XI annual exams, for the first time, are fashioned by the H.S. Council which is an added responsibility. The Council shoulders the task of distribution of the question papers across the state. The H.S. exams are slated to start on 17 March. The teachers are directly involved in the conduct of the exams and distribution of the question papers to the venues. The examination of the answer-scripts including the 'home exams' is a colossal task. This year nearly 8 lakh students have appeared at the Secondary exams. And it is evident that the teachers are encumbered with multifaceted duties; yet, all the results are to be published within the stipulated time frame and without flaws. But the teaching community performs the tasks with deep devotion which is a praiseworthy character of the state – the personnel working in the arena of education know well that their very existence and honour depend on well-being of the learners, and so, they all gladly withstand the pressure. The fourteenth Assembly Elections of West Bengal will start from 17 April and continue upto 8 May – in five phases the elections will be completed. Lakhs of students will be hindranced as a result of this long drawn election schedule. Moreover, the public exams determine future career of the students. Added to this, aspirant students who will migrate to other states for higher studies will also be directly hit. The Association has conveyed this message to the media. But the teachers would extend hands of co-operation for smooth conduct of the Joint Extrance Exams slated during summer vacation

in the month of May. More than 97 thousand students will sit for this exam.

Impending Assembly Elections are of great importance – election is a political battle. Our Association in 1966 made a clarion call for the ouster of the then anti-people, anti-education govt through the elections. Till 1977 we had to fight with conviction for installation of pro-people and pro-education govt in our state, and during that long length of time the Association had to sacrifice many workers and leaders for achieving the target. Thousands of members had to face humiliation of different types and ignominy apart from physical assualts. For last consecutive six assembly elections the people of the state have reposed their faith on the LF govt, which is unique in the history of the parliamentary democracy of the globe. More than four thousand five hundred leftist workers, sympathisers, and leaders were butchered by the goons of the reactionary and imperialist forces.

Without elaboration it can safely be asserted that the achievement of the LF govt in the field of education in just laudable. WB is the only state which spends 3.7% of the GDP on education, while the national average is 2.8%. On school education 86% of the education budget is spent. The number of primary schools including SSK is 68,138, while the number of secondary schools including MSK reads 12,386. The literacy percentage in 1991 was 57.9, now it is 72%, and the drop-out rate in 1976 was 66.6%, it had dwindled to 36.41% in 2002 – the total no. of drop-outs was 35.2 lakhs, now it is 8.9 lakhs. The SSA movement and introduction of mid-day-meal have immensely helped to make the picture bright.

Maintaining pace with the demand of the time, the LF govt has introduced new subjects, and the syllabi have been re-structured, and the educational standard has been elevated to a height of reckoning. If the results of MP and HS exams are scanned, it is evident that the districts are successfully competing with the cities. Meritorious students through the SSC are being appointed to the teaching posts. This year, nearly 22 thousand teachers are going to be appointed. This is just unique in the country. The LF govt despite financial constraints, has awarded full pensionary benefits to 2 lakh school teachers. This govt has raised the pecuniary status and ensured service security, and honour of the educational personnel.

The picture of the achievements of the govt is to be pen-pictured through words in the zonal electoral conventions. The guardians, patrons of education are to be invited in all such conventions. The members with proper planning should make door to door campaign to apprise the real educational scenario. The device of 'mouth and ear' has to be made a reality as far as practicable. But electoral activities are to be performed with a determination of established 7th LF govt without causing any inconvenience to the examinees. The conventions of the zones and districts are to be completed within 10 April. The electoral central convention of eight leftist Teachers' Organisations was held on 16 March at Satyapriya Bhaban. The conventions of the leftist Teachers' Organs are to be completed within this month. For expansion of education and further elevation of its standard, continuation of the overall developmental activities and to thwart the menace of commersialisation, communalisation and privatisation, push back the imperialist challenges. We all have to work unitedly for making seventh Left Front govt a reality.

Membership renewal and collection drive is

to be initiated sincerely during the fortnight, 5-19 May. The zonal committees are to form teams securing co-operation of the sub-divisional, district and central committee members, and such teams should visit the schools and speak to each and all. The leaders need to be frank and modest while they answer the queries of the teachers and educational employees. Patience has to be deployed all the time. Special drive is to initiated for collection of the membership of the SSC-appointed new entrants. These new educational personnel are to be apprised of the tradition and activities of the Association, the benefits of having the membership and other related issues. But only full-time and approved post-holders are eligible for securing the membership. Sincere efforts are to be made for having the membership of the retired teachers and educational employees. At the same time, attempts for collection of individual subscriber of the Siksha-O-Sahitya : Teachers' Journal is to be made. But it is to be seen that 80% members can be enlisted during the specified fornight.

The Call of the Association ends with the expectation that the given works will be successfully completed within the allotted time frame.

10 March 2006

West Bengal Board of Secondary Education
77/2. Park Street, Kolkata-700 016

Prof. Ujjwalkumar Basu
President

No : 28/Pres/06(40-51)

Date : 09/03/06

To
The President
ABTA
Satyapriya Bhawan

Dear Sir,

The West Bengal Board of Secondary Education expresses gratefulness to you all for extension of laudable support to the Board for successful conduct of Madhyamik Pariksha (Secondary Examination), 2006 to the satisfaction of all concerned.

With regards,

Ujjwalkumar Basu
President

School Teachers' Federation of India

4, Dr. Radhakrishnan Nagar, Abdullah Street, Choolaimedu, Chennai-600 094

Date : 20.02.2006

Dear Comrades,

The Secretariate meeting of STFI was held on 15th February, 2006 at Thirur, Kerala Com. Sibaprasad Mukhopadhyay, Vice-President STFI, presided the meeting. General Secretary Com. K. Rajendran presented the work report. Treasurer Com. Ch. Subash Chandra Bose, Joint General Secretary Com. A.K. Chandran, Vice-Presidents Com. S. T. Antonysamy, Com. John Philip, Secretary Com. M.K. Sreedaran attended the meeting. The following resolutions were passed :-

Expansion of Organisation

It was resolved to entrust Com, Kartik Mandal, President and Com. Sibaprasad Mukhopadhyay, Vice-President to contact the office bearers of Assam High School Teachers' Association and Com. Amul Chatterjee, Secretary to contact the Primary Teachers' Organisation of Manipur to discuss about their affiliation. Expansion of STFI in the non-affilliated States would be discussed in detail in the next Central Executive Committee meeting. General Secretary would prepare a note for it.

State Level Workshop on Education

As per the call given by the All India Convention of STFI, Hyderabad All state units are requested to conduct state level workshop on Right to Education Bill-2005 and National Curriculum Framework-2005 before 31st March, 2006 and send reports to General Secretary.

Memorandum to HRD Ministry

It was resolved that General Secretary should prepare memorandum on Education cess, allocation of funds, detoxcification of curriculum, flexibility of SSA programmes according to the needs of the states, Right to Education Bill, Contract Appointments etc. to the HRD ministry.

STFI-Bulletin

It was resolved to publish 1st Bulletin by March, 2006 to cover STFI Conference, All India Convention on Education, KSTA Conference and other state level important movements (ABTA-1000, KSTA-1000, ABPTA-1000, APUTF-1000, TNPTF-500, KRPSSSS (R)-200, GTU (PUNJAB)-200, HRAS-100, TNPGTA-100, TNHHSSGTA-100, RSS-100, TIAS-50).

Indefinite Strike-KSTA

It was resolved to give support and solidarity to the Indefinite Strike of the Teachers and Govt. Employees of Kerala from 23rd February, 2006 and requested the Government to settle the strike by approving all the demands.

Attack on A.K. Chandran, Joint General Secretary, STFI

The Secretariat condemned the brutal attack of police on Com. A.K. Chandran, General Secretary of KSTA and Joint General Secretary of STFI and other leaders including women teachers on 24th January 2006. The Secretariate requested the Chief Minister of Kerala to take action against the police officials and withdraw the false cases registered on them.

Next N.S. and CEC Meetings

This Secretariate meeting resolved to hold the next Secretariate meeting and the CEC meeting on 11.3.06 and 12.3.06 at Chennai respectively.

Request

All State unit are requested to send their action report and work report in time to time.

K.Rajendran
General Secretary, STFI

Registered No. WB/Sc-247 **No. WB. (Part-III)/2005/SAR-11**

The Kolkata Gazette

Extraordinary
Published by Authority

SRAVANA 28] **FRIDAY, AUGUST 19, 2005** **[SAKA 1927**

PART III – Acts of the West Bengal Legislature
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
LAW DEPARTMENT
Legislative
NOTIFICATION

No. 2053-L. – 19th August, 2005 – The Following Act of the West Bengal Legislature, having been assented to by the Governor, is hereby published for general information :–

WEST BENGAL ACT XIV OF 2005

THE WEST BENGAL SCHOOLS (CONTROL OF EXPENDITURE) ACT, 2005

[Passed by the West Bengal Legislature]

[Assent of the Governor was first published in the Kolkata Gazette, Extraordinary of the 19th August, 2005]

An act to provide for the control of expenditure in the schools in West Bengal.

WHEREAS it is expedient to provide for the control of expenditure in the schools in West Bengal and the matter connected therewith or incidental thereto :

It is hereby enacted in the Fifty-sixth year of the Republic of India, by the Legislature of West Bengal, as follows :–

Short title, extent and commen-cement

1. (1) This Act may be called the West Bengal Schools (Control of Expenditure) Act, 2005.

(2) It extends to the whole of West Bengal.

(3) This section shall come into force at once and the remaining sections shall come into force on such date or dates and in such area or areas as the State Government may, by notification, appoint and different dates may be appointed for different sections or for different areas.

The West Bengal Schools (Control of Expenditure) Act, 2005
(Section 2)

Definitioins

2. In this Act, unless the context otherwise requires, –

(a) "approved" means approved by the Director or his authorised officer;

(b) "Board" means the West Bengal Board of Secondary Education established under the West Bengal Board of Secondary Education Act, 1963; West Ben. Act V of 1963

(c) "Board of Madrasah" means the West Bengal Board of Madrasah Education established under the West Bengal Board of Madrasah Education Act, 1994; West Ben. Act XXXIX of 1994

(d) "Council" means the West Bengal Council of Higher Secondary Education established under the West Bengal Council of Higher Secondary Education Act, 1975; West Ben. Act VIII of 1975

(e) "Director" means the Director of School Education. West Bengal;

(f) "District Level Inspection Team" means the District Level Inspection Team constituted under sub-section (1) of section 8;

(g) "Madrash" shall have the same meaning as defined in clause (h) of section 2 of the West Bengal School Service Commission Act, 1997; West Ben. Act IV of 1997

(h) "non-teaching staff" means a member of the staff other than a teacher of a school;

(i) "notification" means notification published in the *official Gazette*;

(j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(k) "recognised" with its grammatical variations, used with reference to a school, shall mean recognised or deemed to have been recognised under – West Ben. Act XLIII of 1973

(i) the West Bengal Board of Secondary Education Act, 1963, or

(ii) the West Bengal Primary Education, Act 1973 or

(iii) the West Bengal Council of Higher Secondary Education Act, 1975, or

(iv) the West Bengal Board of Madrasah Education Act, 1994;

(l) "region" means a region as specified under sub-section (2) of section 3 of the West Bengal School Service Commission Act, 1997;

(m) "school" means –

(i) a recognised non-Government aided –

(A) secondary school, or educational institution, or part or department of such school or institution, imparting instruction in secondary education, or

(B) higher secondary school, or educational institution (other than a college), or part or department of such school or institution, imparting instruction in higher secondary education, or

(C) Madrasah, or

(D) Primary Teachers' Training Institution; or

(ii) a recognised non-Government institution which has been imparting instruction in secondary education or higher secondary education or madrasah education and receiving grant from the State Government in the form of dearness allowance for its teachers and non-teaching staff.

Explanation I. – "Aided" with its grammatical variations, used with reference

to a school, shall mean aided by the State Government in the shape of financial assistance towards the basic pay of the teachers and non-teaching staff of that school.

The West Bengal Schools (Control of Expenditure) Act, 2005 (Section 3,4)

Explanation II. – "Basic pay" shall mean the monthly pay of a teacher or non-teaching staff of a school, which corresponds to a stage in the time – scale of pay of the post held by the teacher or non-teaching staff in that school.

Explanation III. – "Secondary Education" shall have the same meaning as in clause (1) of section 2 of the West Bengal Board of Secondary Education Act, 1963. West Ben. Act V of 1963

Explanation IV. – "Higher Secondary Education" shall have the same meanings as in clause (d) of section 2 of the West Bengal Council of Higher Secondary Education Act, 1975; West Ben. Act VIII of 1975

(n) "school authority", in relation to a school, means the governing body, managing committee, *ad hoc* committee, administrator or any other body, by whatever name it is called, which is charged with the management of the affairs of the school;

(o) "State Government" means the Government of West Bengal in the School Education Department;

(p) "teacher" menas an Assistant Teacher or any other person, holding a teaching post in a school on a regular and whole-time basis and is paid from the fund under the control of the State Government and includes a Headmaster or a Headmistress;

(q) "unaided school" means a recognised unaided school to which no financial assistance has been sanctioned by the State Government;

(r) "West Bengal Board of Primary Education" means the West Bengal Board of Primary Education established under the West Bengal Primary Education Act, 1973. West Ben. Act XLIII of 1973

Application

3. This Act shall apply to schools other than –

(a) a school not in receipt of any financial assistance from the State Government,

or

(b) a Government school;

Provided that the State Government may, if it considers necessary in the exigencies of public service, exempt any school from the operation of this Act for such period at it may think necessary.

Explanation – "Government School" means a school maintained had managed by the State Government, the Government of India, or the Railway Board under

the Ministry of Railway, Government of India.

Previous sanction of State Govt. for appointment etc.

4. (1) Save as otherwise provided in sub-section (2), no school authority shall, –

(i) create any teaching or non-teaching post involving any financial liability on the State exchequer, or

(ii) appoint or engage any teacher or non-teaching staff; or

(iii) regularise the service of any person, who has rendered service on any casual or part-time vacancy on contract or any other basis, against any permanent teaching or non-teaching post of a school; or

(iv) revise the pay or allowances of any teacher or non-teaching staff; or

The West Bengal Schools (Control of Expenditure) Act, 2005 (Section 5-8)

(v) grant any special pay or allowance or other remuneration under any description whatsoever including *exgratia* payment or any other benefit, having financial implication, to any person holding a teaching or non-teaching post; or

(vi) incur, except as prescribed, expenses for any development scheme, without previous sanction of the State Government.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the school authority may fill up, in the manner as may be prescribed, a vacancy of a teacher caused by leave or deputation for a period not exceeding one year without previous sanction of the State Government.

Provided that no such person who has been appointed on such vacancy in a school, shall be appointed in any sanctioned post or by creating any new post in that school, only for rendering such service.

Void appointments

5. (1) No school authority shall appoint any teacher in a school in contravention of the provisions of this Act, or the provisions of the West Bengal School Service Commission Act, 1997, or any rules, orders, procedures or directions issued thereunder. West Ben. Act IV of 1997

(2) No School authority shall appoint any non-teaching staff in a school excepting in the manner as may be prescribed.

(3) Any appointment made by a school authority in contravention of sub-section (1) or sub-section (2) shall be void.

Unaided school not to get financial assistance

6. No unaided school shall be entitled to get any financial assistance from the State Government.

Appoin-tment on part time or contract basis

7. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any rules or orders issued thereunder or any contract, customs or usages to the contrary, no person, who has been appointed as teacher or non-teaching staff on any casual or part-time vacancy or on contract basis in

a school, shall have any right to be appointed on permanent basis in any sanctioned post or by creating any new post only for rendering such service.

Consti-tution of District Level Inspection Team

8. (1) The State Government may, by order, constitute a District Level Inspection Team for each district.

2) The District Level Inspection Team shall consist of the following members :–

(a) a nominee of the Board;

(b) a nominee of the Council;

(c) a nominee of the Board of Madrasah;

(d) the District Inspector of Schools (Secondary Education).

(3) The District Inspector of Schools (Secondary Education) shall be the Member-convenor of the said District Level Inspection Team.

(4) The District Level Inspection Team shall inpect and enquire into facts and records of the schools, which are under consideration of the State Government for recognition or upgradation, and shall discharge such other duties and perform such other functions as the State Government may, by order, direct for carrying out the purposes of this Act.

The West Bengal Schools (Control of Expenditure) Act, 2005 (Sections 9-12)

Selection of site for setting up new school, etc.

9 (1) The State Government may,_

(a) select the site for setting up a new school;

(b) set up a new school;

(c) upgrade an existing school;

(d) determine the strength of teacher and non-teaching staff in a school, in such manner as may be prescribed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government shall not set up a new school or upgrade an existing school unless,–

(a) the District Level Inspection Team recommends so to do, and

(b) due appropriation is made in the Budget of the State by the State Legislature in this behalf.

Explanation 1. – For the purposes of this section, the expression "up grade" means upgradation of a Junior High School to a Secondary School, or as the case may be, from a Secondary School to a Higher Secondary School.

Explanation II. – The expression "Junior High School" means a school imparting instruction in Secondary Education from class V to Class VIII.

Power of State Government to sanction additional post

10. The State Government may, if it considers necessary so to do, sanction additional post of teacher or non-teaching staff in a school in such manner as may be prescribed.

Provided that no such additional post of teacher or non-teaching staff shall be sanctioned, unless due apropriation is made in the Budget of the State by the State Legislature in this behalf.

Power to inspect and hold enquiry

11.(1) The State Government may, if it considers necessary so to do, by general or special order, authorise the Director or any other officer not below the rank of a Sub-Inspector of Schools in this behalf to–

(a) inspect any school, is buildings, laboratories, libraries, records and equipmens;

(b) make an enquiry into any financial irregularities by any school;

(c) make an enquiry into the income, expenditure, properties, assets and liabilities of any school.

(2) The State Government may after considering the report of such inspection or inquiry, direct the school authority to take such action in the matter concerned, as may, in the opinion of the State Government, be necessary.

(3) If the school authority omits or fails to comply with the direction of the State Government, as stated in sub-section (2), the State Government may take action against such school authority in accordance with the provisions of section 12.

Power to derecognise school or abolish post

12. If the State Government has reason to believe that the number of students studying in a particular school has fallen below the prescribed number, or the school authority has failed to take action as directed by State Government under section 11, it may, after giving the concerned.

The West Bengal Schools (Control of Expenditure) Act, 2005 (Sections 13-15)

School authority an opportunity of being heard and for the reasons to be recorded in writing, –

(a) direct the Board, West Bengal Board of Primary Education, Council, Board of Madrasah, or such other authority to derecognise the school; or

(b) abolish any teaching or non-teaching post of such school; or

(c) order shifting of teaching and non-teaching staff from such school to any other school within the region; or

(d) take such action as may appear to the State Government to be necessary and proper.

Power to determine fixation of pay and age of superannuation

13. The State Government may, –

(a) determine and approve the case of fixation of pay of the teacher or non-teaching staff of a school in the manner, as may be prescribed;

(b) determine the age of superannuation and the benefits payable after superannuation to the teachers and non-teaching staff of a school in the manner as may be prescribed.

Scale of pay etc. of teacher

14. (1) Every teacher of a school shall, if appointed in the post of under graduate teacher category, be entitled to draw pay in the scale of pay in which he is appointed and shall not be entitled to claim any additional increment or higher scale of pay for acquiring any qualification other than the qualifications specified for such post.

(2) Every teacher of a school shall, If appointed in the post of Graduate teacher category, be entitled to draw pay in the scale of pay in which he is appointed and shall not be entitled to claim any additional increment or higher scale of pay for acquiring any qualification other than the qualifications specified for such post.

(3) Every teacher of a school shall, if appointed in the Honours Graduate of Post-graduate teacher category, be entitled to draw pay of Post-graduate teacher category, upon acquiring Post-graduate degree, in the manner as may be specified by order.

Option of Contributory Provident Fund

15. Notwithstanding anything contained in the West Bengal non-Government Eductional Institutions and Local Authorities (Control of Provident Fund of Employees) Act, 1983, or in any rules made fund of General thereunder, or in any other law for the time being in force,–

(a) if a teacher or a non-teaching staff, who had been a subscriber to the Contributory Provident Fund Scheme and opted for remaining subscriber to the said scheme instead of being a subscriber to the General Provident Fund Scheme, such option shall be treated as final and no change in such option shall be allowed thereafter;

(b) if a teacher or a non-teaching staff, who had been a subscriber to the Contributory Provident Fund Scheme and opted for shifting from Contributory Provident Fund Scheme to General Provident Fund Scheme, such teacher or non-teaching staff not be entitled to get the employers' contribution to his credit in the Contributory Provident Fund scheme.

The West Bengal Schools (Control of Expenditure) Act, 2005 (Section 16-22.)

Protection of teacher and non-teaching staff

16. Notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, the terms and conditions of service of a teacher or a non-teaching staff in the employment of a school, immediately before the commencement of this Act, shall not be varied to his disadvantage in so far as such terms and conditions relate to the appointment of such teachers and non-teaching staff to the posts held by them immediately before the commencement of this Act.

Penalty

17. Whoever contravenes the provisions of sections 4 or section 5, shall be punishable with imprisonment for a term not exceeding two years, or with fine, or with both.

Cognizance of offences

18. No prosecution shall be instituted under this Act with the previous sanction of the State Government.

Protection of action taken in good faith

19. No suit, prosecution or other legel proceeding shall lie against any officer of the State Government for anything which is in good faith done or intended to be done in the discharge of his duties under this Act or the rules or orders made thereunder.

Act to have overriding effect

20. The provisions of this Act or any rules or orders made thereunder shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force or in any contract, custom or usages to the contrary.

Power to remove difficulties

21. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may take such steps or issue such orders not inconsistent with the provisions of this Act, as the State Government may consider necessary for removing such difficulty :

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act.

Power to make rules

22. (1) The State Government may, by notification, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for any matter, which may be or is required to be prescribed.

(3) Every rule make under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

By order of the Governor,
MD. HESAMUDDIN
Secretary,in-charge
to the Govt. of West Bengal,
Law Department.

পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ
প্রাথমিক শাখা
বিকাশ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৯১

তারিখ ঃ ১১.১১.২০০৫

সংখ্যা ঃ ১১৭৩-বিদ্যালয় শিক্ষা (প্রাঃ)

প্রেরক ঃ রণজিৎ রায়
যুগ্ম-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রাপক ঃ অধিকর্তা, বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিষয় ঃ অনুকম্পাজনিত চাকরি প্রার্থীদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সংগ্রহ সংক্রান্ত ছক (প্রোফর্‌মা)

মাননীয়,

অনুকম্পাজনিত চাকরি প্রার্থীদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থার পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন সংগ্রহের সুবিধার জন্য নিম্নলিখিত ছক (প্রোফর্‌মা) অনুসারে তথ্যাদি জেলান্তর থেকে সংগ্রহ ও প্রয়োজন বিভাগের নিকট পাঠাবার জন্য আদিষ্টক্রমে আপনাকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

১। মৃত ব্যক্তির পরিবারে প্রকৃতঅর্থে নির্ভরশীল সদস্যসংখ্যা কত ?
২। (ক) ভবিষ্যনিধি অর্থ (পি এফ)-এর পরিমাণ কত ?
(খ) আনুতোষিক অর্থ (গ্র্যাচুইটি)-এসর পরিমাণ কত ?
(গ) জীবনবিমা. অর্থের পরিমাণ কত ?
৩। পারিবারিক পেনসন অর্থের পরিমাণ কত ?
৪। নিজস্ব গৃহ আছে কি না, না থাকলে বর্তমান ঠিকানায় কীভাবে বাস করেন ?
৫। জমি-জমা (ভূসম্পত্তি) আছে কি না, এবং সেই সূত্রে বাৎসরিক আয় কত ?
৬। অন্যান্য সকল সূত্রে আয়ের পরিমাণ কত ?

স্বাঃ—রণজিৎ রায়
সহ-সচিব

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

School Education Department

Secondary Branch

Bikash Bhavan, Salt Lake, Kolkata-91

NO. 1330-SE(S)/8B-11/05 the 28th October, 2005

Sub : Minimum age for admission to Class-IX in schools under the affiliated to and recognised by West Bengal Board of Secondary Education.

ORDER

In partial modification to Circular No. 880-Edn (P) dated 31.07.1991 and in consideration of the changed curcumstances, changes in the curriculum and syllabus and class room transactions as well as evaluation and also changes made in the minimum age for admission to Class-I, it is hereby laid down that the minimum age for admission to class-IX, will generally be 13 years within 180 days from the date of commencement of the academic session. The West Bengal Board of Secondary Education is hereby authorised to grant necessary relaxation within this limit in appropriate cases.This order will come in force from the current academic session (2005-2006) of Class-IX.

By order of the Governor
Sd/- **S. Ganai**
O.S.D. & Ex-Officio Dy. Secy.
to the Govt. of West Bengal.

Govt. Circular

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Directorate of School Education

Secondary Branch (Law Cell)

Bikash Bhavan, 7th Floor, Salt Lake, Kolkata-91

No. 906-L.S./1C-896-Ls/03 Dated, Kolkata, the 29th June, 2004

OFFICE MEMORANDUM

It has been unanimously accepted in modern pedagogy that corporal punishment to the students is not only useless, but it is harmful to the mental growth of the students apart from the fact that it may cause physical injury to the students. Instead, a joyful atmosphere has been suggested as

an effective means for teaching-learning process in the school. Also, the teachers, in general, have rejected corporal punishment in conducting the class room activities.

But inspite of all unfortunate instances, though very rare, sometimes accure where the teachers are found to resort to corporal punishment in the class room. Such action on the part of the teachers is verily undesirable. It is brought to the notice of all the teachers in Primary and Secondary schools in the state of West Bengal that canning or other type of corporal punishment to the students is strictly prohibited; and if any teacher resorts to such type of punishment that will be dealt with strictly.

This Office Memorandum is being issued in terms of the solemn order of the Hon'ble High Court, Calcutta, passed by the Hon'ble Chief Justice Ashok Kumar Mathur and Hon'ble Justice Asim Kumar Banerjee on 06.02.2004 in the Public Interest Litigation being W.P. No. 1424 of 2003 and in the matter of Sri Tapas Kumar Bhanja – Vs. – State of West Bengal & ors.

Sd/ A.S. Biswas
Director of School Education
West Bengal

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Higher Education Department
C.S. Branch
Bikash Bhavan, Bidhannagar, Kolkata-91

No. 596-Edn(CS)/5C-1/2004 Dated, Kolkata, the 30th June, 2004

MEMORANDUM

Sub : The constitution of Pension Monitoring Committee

This Department has been receiving intimation from a number of sources that in some individual cases matters pertaining to settlement of pensionery benefits are being delayed for want of requisite papers and/or divergence in perception on existing administrative provisions there on among all concerned.

In order to facilitate interaction among all concerned on such individual cases and resolve the points of differences, if any, expeditiously, a Pension Monitoring Committee is constituted with the following members :

1.	Director of Public Instruction, West Bengal	Chairman
2.	Joint Director of Public Instruction, West Bengal (Nominated by the DPI, West Bengal)	Member
3.	Jt. Secretary/Dy. Secretary In charge of CS Branch, HE Department	Member
4.	Two joint Secretaries of the WBCUTA	Member
5.	President of the All Bengal Principals Council	Member
6.	Dy. Director of Accounts, Education Directorate, W.B.	Member-Convenor

The Deputy Director of Accounts, Education Directorate. West Bengal, will convene the meetings of the Committee at regular intervals, under direction of the Chairman.

This order comes into force with immediate effect.

Deputy Secretary

The Committee is expected to submit its findings and recommendations within three months from the 1st meeting.

By order of the Governor
Sd/-D. Chakrabarti
Principal Secretary

No. : 654/1(12)-SE(S) Dated, Kolkata, the 24th May, 2005

আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার

বিকাশ ভবন, ৮ম তল, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১

পত্রাংক : ৮৩২-এস সি/এ পি টি দিনাংক : ১৬.৮.২০০৪

প্রেরক : বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রতি : (১) সভাপতি, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ
(২) জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক/মাধ্যমিক)
....জেলা

বিষয় : বিদ্যালয়ের শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সংক্রান্ত

উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত শিক্ষালয়ের সমস্ত প্রধান/সহ-শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পরিচালনমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করা হচ্ছে। কারণ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম ও পত্র-পত্রিকায় এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময়ে নানা মতামত প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে। সম্প্রতি মহিলা কমিশনের মতামত/বক্তব্য দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানানো যায় যে, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি শিক্ষার্থী সমাজ থাকে অতীব শ্রদ্ধাশীল। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচার-আচরণ ও ব্যবহারের দ্বারা শিক্ষার্থী সমাজ সব থেকে বেশি প্রভাবিত হয়। সেজন্য অন্যান্য বিষয়ের সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আচার-ব্যবহার, পোশাক-পরিচ্ছদ সব কিছুতে মার্জিত রুচিশীলতা ও শালীনতার দিকে যত্নবান হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশি। শিক্ষিকাদের পোশাক শাড়ি হবে কী সালোয়ার হবে, শিক্ষকদের পোশাক ধুতি-পাঞ্জাবি বা অন্য কিছু হবে....সেটা বড় প্রশ্ন নয়, বড় প্রশ্ন হল সার্বিক বিচারে শালীনতা। শিক্ষার্থীদের জন্য বিদ্যালয় প্রশাসন নির্দিষ্ট ধরনের পোশাকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। সেক্ষেত্রেও সব কিছু বিচার-বিবেচনা করা উচিত।

উভয় ক্ষেত্রে রুচি, শালীনতা এবং ব্যবহারের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানানোর ব্যাপারে আপনাকে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করা হল।

ধন্যবাদান্তে,
অর্ধেন্দু বিশ্বাস
বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তা

Board Circular

WEST BENGAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
77/2, Park Street, Kolkata-700 016

Circular No. S/OSD/50 Date : 06.03.2006

NOTIFICATION

From : Secretary,
West Bengal Board of Secondary Education,
77/2, Park Street, Kolkata- 700 016

To : The Heads of all recognised Non-Govt. (Aided & Unaided) Secondary Schools.

Sub : Extension of the team of the Managing Committee/Administrator/Ad-hoc Committee.

In exericse of the power conferred by Sub-Section 2 of section 28 of the West Bengal Board of Secondary Education Act, 1963 (W.B. Act,V of 1963), the President, in view of the declaration of dates for ensuing State Assembly Election is pleased to consider the matter of general extension of the term/life of the Managing Committee/the Administrator/Ad-hoc Committee upto 31.10.2006 or till the completion of the consitution/reconstitution of the Managing Committee with the election of Office Bearers or until further orders, whichever is earlier.

In case of schools where election of different categories have already been held prior to the date of issue of this notification excepting the election of office bearers shall stand deferred upto 15th August, 2006 and the said election of office bearers shall be completed by the month of August after 15th August, 2006.

In cases of schools where programmes of election for constitution/reconstitution of the Managing Committee have already been adopted but no election in any category has been held prior to the date of issue of this notification/circular such process shall be treated as cancelled and this process shall start after 15th July, 2006 afresh after adopting fresh programme as per normal rules and procedures fixing the date of election in the Guardian Category after 15.08.2006 but before 15.09.2006. In view of huge expense already incurred by such schools, they may send letters of intimation to Guardians on proper receipt in relaxation of procedure 6A of the Management Rules under prevailing exceptional circumstances this year.

In cases of schools where all stages of election programme have already been

completed excepting election in the Guardian Category only the election in the Guardian Category shall be deferred upto 15th August, 2006. The postponed election in the Guardian Category shall be held on any Sunday after 15th August, 2006 but before 31st August, 2006 on the basis of existing voters list. All concerned shall be well intimated before hand.

In cases of newly upgraded schools (Jr. High Schools) where Managing Committees have not yet been constituted prior to the date of notification of this circular, the tenure of the Managing Committee of such schools is also extended upto 31.10.2006.

This circular is not applicable to the schools which have been directed otherwise by any Hon'ble Court of Law.

The Board, however, reserves the right to appoint Administrator in any of the schools covered under the above-mentioned specifications, if situation so warrants.

Sd/- Illegible
SECRETARY

প্রকাশনার তারিখ ঃ ২৮ মার্চ, ২০০৬ Registered – SSRM/KOL/RMS/WB/RNP-225/2004-06

Printed by Sibaprasad Mukherjee at the Ganashakti Printers (P) Ltd. 33, Alimuddin Street, Kolkata-700 016 and also Published by him at the A.B.T.A. Office, P-14, Ganesh Chandra Avenue, Kolkata-700 013.